বনফুল-এর গল্প-সংগ্রহ

প্রথম শতক



বনফুলের

গল্প-সংগ্রহ

॥ প্রথম শতক ॥

বিষয়ের বৈচিত্র্যে আপনি আমাদের কথাকারদের মধ্যে অদ্বিতীয়। বাস্তব, কাল্পনিক, অসম্ভব, রূপক, প্রতীকময়, সব রকম রচনাই আপনার আয়ত্ত। আপনি যা লেখেন তা ছোট গল্প কি বড় গল্প কি উপন্যাস তার বিচার নিরর্থক। গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য 'মৃগয়া', অলৌকিক রূপক 'বৈতরণী তীরে', বিচিত্র চরিত্রচিত্র যেমন 'নাথুনির মা, ছোট লোক, বিজ্ঞান, দেশী ও বিলাতী', সবই আপনার সার্থক সৃষ্টি। অতিকায় প্রাণীর মতন কালবশে মহাকাব্য লোপ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, মহোপন্যাসও ক্রমশ লোপ পাবে, ছোট রচনাতেই সুধীজনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হবে। ভূরিভোজী পাঠক-পাঠিকার জন্য আপনি 'জঙ্গম' লিখে প্রচুর ক্যালরি সরবরাহ করুন। কিন্তু মিতাহারীও অনেক আছে, তাদের জন্য নানাবিধ জীবনীয় রসও লঘুমাত্রায় পরিবেশন করতে থাকুন।

আপনার

৪-৬-৫৫ রাজশেখর বসু











বাড়তি মাশুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আপিসে কলম পিষে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেনের একখানি থার্ড ক্লাসে ব'সে হাঁপাচ্ছি—এমন সময় দেখি সামনের প্ল্যাটফর্ম থেকে বোম্বে মেল ছাড়ছে আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে প'ড়ে গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে উঠল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যায়—আর ফেরে নি। অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয় নি। ভগবানের ইচ্ছা ব'লে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি—হ্যাঁ, ঠিক সেই মুখটিই বোম্বে মেলের একটা কামরায় দেখতে পেলাম।

আর কি থাকতে পারি?

তাড়াতাড়ি গিয়ে বোম্বে মেলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেলও ছেড়ে দিলে। ট্রেনে উঠে আবার ভাল ক'রে দেখলাম—হ্যাঁ, ঠিক সেই। পাশে একটি বৃদ্ধও ব'সে আছেন।

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম—"এতদিন কোথায় ছিলি? আমাকে চিনতে পারিস?"

হা ঈশ্বর—সে উত্তর দিলে হিন্দীতে। "হামারা নাম পুঁছতে হেঁ? কেঁও? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।" সমস্ত মনটা ভেঙে গেল—মনে হ'ল যেন দ্বিতীয়বার আমি পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বললেন—"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙ্‌তে হেঁ?"

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম—"কিছু না।"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত ক'রে দু-ফোঁটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

বর্দ্ধমানে নামলাম।

আবার Excess fare—বাড়তি মাশুল দিতে হ'ল।

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়তো সে সুশ্রী ছিল না।

আমিও তাহাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুইটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও দেখি নাই। দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা মিনি আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল। তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম—"ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে রাখি।"

"কেন?"

"ওই দুটোই তো আমাকে পাগল করেছে। আমি সব চেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।"

এত ভালবাসিতাম, কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাতপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়তো মুছিয়া যাইত, যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

মিনি যখন বাপের বাড়ি আসিল, দেখি, তাহার দুইটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ শোনা গেল যে, চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আড়ালে একদিন দেখা হইয়াছিল।

বলিলাম—"অসাবধানতার জন্যে অমন দুটি চোখ গেল!"

সে উত্তর দিল—"কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক, তা হ'লে না জানাই ভাল।"

অমলা

অমলাকে আজ দেখতে আসবে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁকলে! সুন্দর, সুশ্রী, যুবা, বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবি—সুন্দর সুপুরুষ।

অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এল। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাবলে—'আমার ঠাকুরপো।'

মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এ কথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সে রাত্রে স্বপ্নই দেখলে।

বিয়ে কিন্তু হ'ল না—দরে বনল না।

দুই

আবার কিছুদিন পরে অমলাকে দেখতে এল। এবার পাত্র স্বয়ং। নাম হেমচন্দ্র। এবার অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলে, বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা—ধপ্‌ধপে রঙ—কোঁকড়া চুল—সোনার চশমা—দিব্যি দেখতে।

আবার অমলার মন ধীরে ধীরে এই নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

ভাবলে—কত কি ভাবলে!

এবার দরে বনল; কিন্তু মেয়ে পছন্দ হ'ল না।

তিন

অবশেষে মেয়েও পছন্দ হ'ল—দরেও বনল—বিয়েও হ'ল। পাত্র বিশ্বেশ্বরবাবু। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—বি. এ. পাস, সদাগরী আপিসে চাকরি করেন।

অমলার সঙ্গে যখন তাঁর শুভদৃষ্টি হ'ল, তখন কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার সারা বুক ভ'রে গেল। এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হ'ল।

অমলা সুখেই আছে।

খেঁদি

তখন সবে সন্ধ্যা। মালতী ঘরে এসে প্রদীপটা জ্বালতেই তার স্বামী ব'লে উঠল—"লতি, আমি একটা নাম ঠিক করেছি।"

"কি ?"

"ওই যে তুমি বললে—'কি' !"

"তার মানে ?"

"ইংরিজী Key মানে চাবি আর বাংলা 'কি'—একটা প্রশ্ন। মেয়েমানুষের পক্ষে বেশ মানানসই নাম হবে।"

"এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই, এখন থেকেই নামকরণ! আর আমার মেয়েই হবে তুমি জানলে কি ক'রে ? ও জ্যোতিষীর কথায় আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"না না, ঠিক মেয়ে হবে—দেখো তুমি। আমাদের শ্যামবাবু জাগ্রত জ্যোতিষী।"

"ধর যদি মেয়েই হয়, তা ব'লে ওই নাম রাখতে হবে ? কত সব ভাল নাম আছে—"

"যথা, শরৎশশী, নিভাননী, ইন্দুবালা, প্রতিভা, সুধা, আশালতা—এই সব তো ? সব বাজে—পুরনো, সেকেলে, একঘেয়ে। আমার মেয়ের নাম হবে একেবারে নতুন।"

মালতীর প্রসব হবার দু' মাস পূর্বে তার স্বামী কলেরায় মারা গেল। প্রসব হতে গিয়ে মালতীও মারা গেল। জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল—মালতীর মেয়েই হয়েছিল। সে এখন তার মামার বাড়ি সোনারপুরে মানুষ হচ্ছে। তাঁরা তার নাম রেখেছেন, "খেঁদি।"

পারুল-প্রসঙ্গ

"ও কি তোমাদের মত উপায় ক'রে খাবে নাকি ?"

"উপায় ক'রে না খাক—তা ব'লে মাছ দুধ চুরি ক'রে খাওয়াটা—"

"আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব।"

"সে তো খাওয়াচ্ছই—তা ছাড়াও যে চুরি করে। এ রকম রোজ রোজ—"

"বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায় ?"

"যাই হোক, আমি বেড়ালকে মাছ দুধ গেলাতে পারব না। পয়সা আমার এত সস্তা নয়।"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্তিনী মেনি মার্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর থাকা যায় ? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে, পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুলবালা ভূমি-শয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল—"কি করছ ছেলেমানুষি! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেড়াল তাড়িয়ে দিচ্ছি ?"

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—"চল চল, তোমার বেড়ালকে মাছ-দুধই খাওয়ানো যাক।"

পারুল বলিলেন—"হ্যাঁ, সে তোমার মাছ দুধ খাওয়ার জন্যে ব'সে আছে কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?"

"আচ্ছা, আমি খুঁজে আনছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?"

বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল। এদিক ওদিক রাস্তাঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিক খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছেন।

"কই, দেখতে পেলাম না তো বাইরে! সে আসবে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।"

"চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।"

"হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে না কি?"

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—কড়ায় একটুও দুধ নাই, ভাজা-মাছগুলি অন্তর্হিত, ডালের বাটিটা উল্টানো।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল তো অপ্রস্তুত।

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন।

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে, মেনি কুণ্ডলী পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায় ঘুমাইতেছে।

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুরবেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে, অমনি মুখের উপর থপ্ ক'রে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি, একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা। লোম নেই, ডানা নেই, কিম্ভূতকিমাকার! রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল—টপ্ ক'রে মুখে ক'রে নিয়ে গেল। শালিক পাখিদের আর্তরব শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ-ওপাশ ক'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর চার-পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমাদের বাড়িতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার কবরেজ ওঝা বদ্যি—কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না। শচীন জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চ'লে গেল।

বাড়িতে কান্নার তুমুল হাহাকার!

ভিতরে আমার স্ত্রী মূর্ছিত অজ্ঞান। তাঁকে নিয়ে বাড়ির কয়েকজন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি, দড়ির খাটিয়ার ওপর শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

তখন বহুদিন পরে—কেন জানি না সেই পাখির ছানাটার কথা মনে প'ড়ে গেল।

সেই চার-পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখির ছানাটি আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত হাহাকার।

হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।

এক কৌটা গল্প

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালী লোক তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা ভাবি নি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম, শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হ'ল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না! আমি হলাম এদিককার একমাত্র ডাক্তার।

যাই হোক, নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম। গিয়ে দেখি, শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বললেন—"আসুন ডাক্তারবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

দু-চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার মায়ের হয়েছিল কি?"

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"ও, আপনি শোনেন নি বুঝি? আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তাঁকে আমার মনেও নেই। ইনি আমার আর এক মা—সত্যিকারের মা ছিলেন।"

ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম—"কি রকম? কে তিনি?"

তিনি বললেন—"আমার মঙ্গলা গাই। আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই, সেই থেকে ওই গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড় করেছে। ওরই দুধে আমার দেহ-মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।"

এই ব'লে তিনি হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সার্থকতা

আমার অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, আর আমার দুঃখ হয়। সে যেন একটা সুখ-স্বপ্ন ছিল। সেই আমার অতীত জীবনের স্মৃতি—আজ সত্য সত্যই স্মৃতি-মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার সে জীবন গেল কোথায়? সেই শোভন, সুন্দর, মোহন জীবন?

একদিন আমার রূপ ছিল, সৌরভ ছিল, মধু ছিল। আমার সেই সুষমার দিনে কত মধুলুব্ধ ভ্রমরই না আমার কানে কানে বন্দনার স্তুতিগান তুলিয়াছে!—তাহারা আজ কোথায়?

এই আকাশ বাতাস আলো একদিন কতই না ভাল লাগিয়াছে! একদিন ইহাদের লইয়া সত্যই আমি পাগল হইয়া থাকিতাম—আজ কোথায় গেল আমার সেই পাগলামি—সেই সহজ উন্মাদনা—ছন্দময়ী ভাল-লাগার নেশা! আজ কই তারা সব?

আজ আমি পরিপক্ক, অভিজ্ঞ। আমার সেই অতীতের তরল অনুভূতি জমিয়া যেন কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আমার আজ কেবলই মনে হইতেছে, আমার অতীত আর ফিরিবে না জানি—কিন্তু ভবিষ্যৎ? সে কেমন, কি জানি! আমার আনন্দময় অতীতকে হারাইয়া আজ এই যে পরিপক্ক অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি—ইহার পরিণতি কি? ইহার সার্থকতা কোথায়?

গাছের একটি পাকা ফল এই সব ভাবিতেছিল। হঠাৎ বাতাসের দোলায় মাটিতে পড়িয়া গেল।—একটি পাখি আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ফলটি লইয়া একটি ডালে বসিল এবং পরম আনন্দে ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিল।

অজান্তে

সেদিন আপিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ি ফেরবার পথে ভাবলাম, 'ওর' জন্যে একটা বডিস্ কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়েছি, বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল। কি করি—দাঁড়াতে হ'ল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে, জামাটি বগলে ক'রে ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম। তার পরই গলি, তাও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—অনেক দিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও প'ড়ে গেল, আমিও প'ড়ে গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি, লোকটা তখনও ওঠে নি—ওঠবার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল, মারলাম এক লাথি।

"রাস্তা দেখে চলতে পার না শূয়ার ?"

মারের চোটে সে আবার প'ড়ে গেল, কিন্তু কোনও জবাব করলে না। তাতে আমার আরও রাগ হ'ল, আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি মশাই ?"

"দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি ক'রে দিলে! কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না, ঘাড়ে এসে পড়ল—"

"কে—ও ? ওঃ, থাক্ মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে—"

তার দিকে চেয়ে দেখি, মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে—গাময় কাদা, আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় ক'রে আছে।

বেচারামবাবু

হরিশ মুদী সন্ধ্যাবেলা হিসাব বুঝাইয়া গেল যে, গত মাসের পাওনা ২৭৷৴৫ হইয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে মিটাইয়া দেওয়া দরকার। সদ্য-আপিস-প্রত্যাগত বেচারামবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, মাইনেটা পেলেই—।" অতঃপর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বেচারাম বাহিরের রোয়াকটিতে বসিয়া হাঁক দিলেন—"ওরে, চা আন্।" চা আসিল। চা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার হরিবাবু, নবীন রায়, বিধু ক্লার্ক প্রভৃতি চার-পাঁচজন ভদ্রলোকও সমাগত হইলেন এবং সমবেতভাবে গল্প-গুজব সহযোগে চা পান চলিতে লাগিল।

গল্প চলিতেছে। এমন সময় বেচারামবাবুর ছোট মেয়ে পুঁটি আসিয়া উপস্থিত —"বাবা, দুখানা চিঠি এসেছে আজ ডাকে। আনব?"

পুঁটির ছোট বোন টুনিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কহিল—"আমি আনব বাবা?" বেচারামবাবু মীমাংসা করিয়া দিলেন—"আচ্ছা, দুজনে দুটো আনো।"

শ্রীযুক্ত বেচারাম বক্সির পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র।

পুঁটি ও টুনি দুইজনে দুইখানি পত্র বহন করিয়া আনিল। প্রথম পত্রখানি বেচারামবাবুর প্রবাসী পুত্র বহরমপুর হইতে লিখিতেছে—তাহার কলেজ ফী, হস্টেল চার্জ প্রভৃতি লইয়া এ মাসে ৫৫৲ চাই। দ্বিতীয় পত্রটি তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাড়ি হইতে লিখিয়াছে যে, গত বৎসর ভাল করিয়া পূজার তত্ত্ব করা হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনেক খোঁটা সহ্য করিতে হইয়াছিল; এবার যেন পূজার তত্ত্বে কার্পণ্য করা না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্বশুরবাড়িতে তিষ্ঠানো দায় হইবে।

বেচারামবাবু চিন্তিত মুখে পত্র দুইটি পকেটস্থ করিলেন।

আবার গল্প চলিল। নবীন রায় একটা পান মুখে পুরিয়া কহিলেন, "তোমার মেজ মেয়ের বিয়ের কচ্ছ কি? বিয়ে না দিলে আর ভাল দেখাচ্ছে না।"

বেচারাম কহিলেন—"পাত্র একটি দেখ না!"

নবীন তদুত্তরে বলিলেন—"পাত্র একটি আছে। খাঁইও খুব বেশী নয়। ৫০১৲ নগদ, তেত্রিশ ভরি সোনা আর বরাভরণ। এমন কিছু বেশী নয় আজকালকার দিনে।"

ঘামিয়া বেচারাম উত্তর দিলেন—"তা বটে।"

ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। বেচারামবাবু অন্দরে গেলেন। ভিতরে গিয়া আহারে বসিতেই গৃহিণী হরিমতি কাছে আসিয়া বসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন—

"বিনোদের মুখে মাসীমা খবর পাঠিয়েছেন যে, কাল তিনি আসবেন। কিছু আলোচাল আর এক সের দুধের কথা ব'লে দিও তা হ'লে কাল থেকে। তিনি আফিং খান জান তো?"

শুইতে গিয়া দেখিলেন, ছেলেমেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে। বলিলেন—"কি হ'ল এদের?"

স্ত্রী বলিলেন—"হবে না? শীত প'ড়ে গেছে—কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করানো হয়েছিল, ছিঁড়বে না আর! তোমাকে তো ব'লে ব'লে হার মেনেছি। কি আর করব বল?"

বেচারাম এবার আর কিছুই বলিলেন না। শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকুড়াগ্রামবাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত, এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি। নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল—"এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে, তার নাম পুষ্পমঞ্জরী দিবি নাকি? তোর যত সব অনাছিষ্টি—"

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তা ছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরনের—মুখে সর্বদাই লালা ঝরে! পুষ্পমঞ্জরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, কাহারও কাজকর্ম নাই—চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল—"এই দেখ না নীহারের অদেষ্ট। হ'ল বা যদি একটা মেয়ে, তাও আবার এমন কদাকার—"

শ্যাম বোস বলিলেন—"তা আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।"

হারু খুড়ো তামাকটাতে দুইটা টান দিয়া কহিলেন—"আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না, লোকে টাকাও চায়—রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরও মুশকিল কিনা, কি যে হবে—"

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল—"কার চিঠি হে?"

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম—"বউ লিখেছে—বুঁচি মারা গেছে কাল।"

ভৈরবী ও পূরবী

কাননে একটি ফুল ফুটিল—যেন বনলক্ষ্মীর রচিত একটি কবিতা। গন্ধে বর্ণে ছন্দে অপরূপ। ফুল চাহিয়া দেখিল, তাহার চারিদিকে আনন্দের উৎসব লাগিয়াছে। আকাশে বাতাসে আলোতে যেন কিসের আকুলতা! বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে পলক পড়ে না।

আকাশের নীলে ভরিল নয়ন
আলোর সোহাগে আকুল তনু,
রূপসী উষার সোনার পরশে
হরষে ভরিল প্রতিটি অণু।

কে যেন কহিছে "বনলক্ষ্মীর
স্বপ্ন যে তুমি ধরেছ কায়া
তাই বন-ভরি বাজে আশাবরী
আলোতে লেগেছে রঙিন মায়া।"

গুঞ্জন তুলিয়া কে যেন তাহার কানে-কানে কহিল—

অঙ্গ ভরিয়া এনেছ বর্ণ
এঁকেছ নয়নে মোহন ছবি—
আঁখি তুলে চাও আজি এ প্রভাতে
এসেছি যে আমি তোমারি কবি।

চকিত হইয়া ফুল কহিল—"কে তুমি?"

"আমি ভ্রমর।"

"কি চাও?"

ভ্রমর কহিল—

কি যে চাই সখি জানি না তো তাই
তবে মনে হয় আজিকে প্রাতে

এতটুকু মধু দিতে যদি তুমি
তোমার রঙিন সোহাগ সাথে!

মুখ তুলে সখি আঁখি মেলে চাও
বিফল ক'রো না এমন আলো,
গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

এই শুনিয়া ফুলের হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল, সে মাথা নত করিল। বৃন্তের উপর সে তার সরমশঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়। অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল—

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ ক'রো না এমন আলো।
গুণ্ঠন খোলো গুণ্ঠন খোলো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

ফুল কিন্তু কিছুতেই গুণ্ঠন খুলিতে পারিল না অপরিসীম লজ্জায় যেন তাহার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট অবশ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের দ্বারে কে যেন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—"না, না, না—না—না—"

অবশেষে ভ্রমর কহিল—"তবে যাই।"

এমন আলো এমন বাতাস হয়তো আবার উঠবে না,
যদিই ওঠে হয়তো তখন বন্ধু এমন জুটবে না।
এই যে প্রাতে ওই রবিতে
গান ধরেছে ভৈরবীতে
হয়তো তাতে আর কোনদিন এই মাধুরী ফুটবে না।

ভ্রমরের গুঞ্জন দূর হইতে সুদূরে মিলাইয়া গেল।

ভ্রমর যখন চলিয়া গেল তখন, কি আশ্চর্য, ফুলটির যেন ঘুম ভাঙিল। তাহার মর্মের মাঝখানে যেন গুঞ্জন গানে বাজিতে লাগিল—

গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

তাহার রঙিন পাপড়ি ভরিয়া গন্ধ জাগিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রার্থনা জানাইতে চায়—"আহা, সে যদি আর একবার আসে!" কিন্তু সে আসিল না। কুসুমের প্রাণের কামনায় প্রভাত-সমীরণ মদির হইয়া গেল। প্রভাত বহিয়া গেল, দ্বিপ্রহরও উত্তীর্ণ হইল, সন্ধ্যা হয়-হয়; কিন্তু কোথা সে, যার ধ্যানে

অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি'
ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধভার
যার গানে মুখরিত গগন-পবন
মুখরিত আলো-অন্ধকার!

কই সে? সে তো আর আসিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল।

ছোট ফুলটির আঁধারে আলো জালাইয়া জোনাকি আসিল।

ম্লান কণ্ঠে ফুল তাহাকে শুধায়—"কে ভাই তুমি?"

"আমি জোনাকি।"

আগ্রহভরে ফুল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তাকে চেন কি?"

"কাকে?"

"যে আমায় আজ সকালে গানে গানে বলেছিল—'গুণ্ঠন খোলো', তার আশায় আজ সারাদিন ব'সে আছি। সে তো আর এল না। তুমি তাকে চেন কি?"

জোনাকি বলে—"মনে তো হয় না।"

মিনতি করিয়া ফুল তাহাকে কহিল—"তার সঙ্গে যদি দেখা হয় ব'লো, সে যেন আর একবার আসে।"

"দেখা পাই তো বলব।"—এই বলিয়া জোনাকি উড়িয়া গেল। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলটির সর্বাঙ্গ যেন গান গাহিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া গেল।

তার পরদিন সন্ধ্যায় জোনাকি আসিয়া কহিল—"খুঁজে পেলাম না তাকে।"

ফুল কহিল—"কাকে?"

"তুমি কাল যার কথা বলেছিলে?"

"আমি তো কাল ছিলাম না—আজ ফুটেছি।"

"কালকের ফুল কোথা?"

"সে ঝ'রে গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ।"

জোনাকি চুপ করিয়া রহিল।

তখন নূতন ফুলটি বলিল—"আচ্ছা, তুমি একজনকে চেন কি?"

"কাকে?"

"যে আজ সকালে কেবল গুঞ্জনগানে আমাকে ব'লে গেল—

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ ক'রো না এমন আলো,

তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি আমি। যদি তার দেখা পাও আসতে ব'লো আর একবার। বলবে?"

"দেখা পাই তো বলব।"—মৃদু হাসিয়া জোনাকি উড়িয়া গেল—আঁধারের বুকে ছোট্ট একটি আলেয়া।

অদ্বিতীয়া

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধি সত্ত্বেও কোনও অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিডনি' খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।"

পাইলাম তো। তিনি লিখিতেছেন—"কি করিবে বল ভাই? সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি তো বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোনও ভাবনা করিও না। ইতি..."

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ছুটি মঞ্জুর হইল না।

দুই

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা ব'লে সংসারটা ছারখার করা তো ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোন। আবার বিয়ে কর তুমি।...এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বল, সম্বন্ধ করি। আমার তো মেয়েটিকে বেশ পছন্দ! তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।" ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া—আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম, তাহা অংশত এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর ক'রে তো সংসার ব'সে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হ'লেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা 'মা ফলেষু কদাচন' দেশের লোক! আর তোমরাও যখন বলছ, তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ-অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে তো?..."

ক্রমশ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর

কাঁচাপাকা এক ঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে কোথায় চলিয়া গেল! আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিডনি' কেমন, কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বার বার মনে পড়ে। ছেলেগুলা না জানি এখন কি করিতেছে?...মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যই থাকে? এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি; কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া। আচ্ছা, প্রভার আত্মার যদি...গৃহ্লামি...গৃহ্লামি...

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসর-ঘরেও শুনিলাম—ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তা ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, কে আর আমোদ করিতে চায়? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। সেজদির বাড়িতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে।

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি, আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া। স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?

প্রভা কহিল—"ছি ছি, সেজদিরই জিত হ'ল!"

"মানে?"

"মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে, আমি ম'লে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে—'হাতী হবে। তিন মাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে।' আমি বললাম—কক্ষনো নয়। তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই

ষড়্যন্ত্র। আমি শান্তিপুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিত। পাড়ার মানকে ছোঁড়াকে কনে সাজিয়ে সেজদি বাজি জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন। ছি, ছি, কি তোমরা! অমন গোঁফটা কি ব'লে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি!

খেঁকি

যদিও বাঙালী নহি, কিন্তু তবুও আমার জীবনকাহিনী করুণ। যদিও আমি সামান্য কুকুর মাত্র, তথাপি হে বাঙালী ভাই, খোঁজ করিলে তোমারই মত আমার শোণিতেও আভিজাত্যের আমেজ পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি আমার অতি বৃদ্ধ পিতামহীর কোনো প্রণয়ী বুলডগ-বংশাবতংশ ছিলেন এবং সেই বুলডগ-শোণিতধারার কিয়দংশও আমার ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি। লোকে কিন্তু আমাকে বলে, খেঁকি কুকুর। সত্য বটে আমার গায়ে লোম নাই—সর্বাঙ্গে ঘা, চোখে ভাল দেখিতে পাই না, স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙা লইয়া অন্যান্য কুকুরদের সহিত মারামারি করিয়া আমার দিনপাত হয়—সবই সত্য ; কিন্তু তথাপি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না আমার পূর্বপুরুষ বুলডগ ছিলেন। ইহাই আমার সান্ত্বনা, ইহারই প্রভাবে আমার মনে হয় আমার এ দুর্দিন থাকিবে না। ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

দুই

সেদিন সকালে স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। আমি ঠোঙা চাটিবার প্রত্যাশায়, গাড়ির প্রতি বাতায়ন-পথে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছি। এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে কে আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগাইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। চাহিয়া দেখি, স্টেশনের পরিচিত কুলী—মিঠ্ঠু। মিঠ্ঠুর হাতে অনেকবার মারও খাইয়াছি, ভাতও খাইয়াছি। স্টেশনের ধারে তাহার বাড়ি—সে আমাকে মারধোর করিলেও ডাকিয়া প্রায়ই ভাত-রুটি দিত। হঠাৎ সেই মিঠ্ঠু আমাকে একেবারে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল কেন—কিছুই বুঝিলাম না। এতদিনে কি তাহার হুঁশ হইয়াছে যে, আমার মতন এমন একটা বুলডগ-বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়ানোটা অশোভন? তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিজাতবংশীয় কুকুরদের মত বাঁধিয়া খাওয়াইবে? জানি না, কি তাহার মনোভাব। টানিতে টানিতে সে কিন্তু সোজা আমাকে স্টেশন-মাস্টারের কামরায় লইয়া গেল।

তিন

স্টেশন-মাস্টার বৃদ্ধ। আমার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন—"আরে, এ কোত্থেকে একটা খেঁকি কুত্তো নিয়ে এলি?"

"ওইতেই হবে—A Dog তো বটে, ওর বেশি তো আর কিছু লেখা নেই।"

তাঁহার সহকারী ছোকরাটি ফোড়ন দিল।

মালবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি মশাই? এ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন?"

স্টেশন-মাস্টার তখন বিবৃত করিয়া বলিলেন—"আর বলেন কেন মশাই! চাকরি বুঝি আর থাকে না। কোন্ এক সাহেব মহাপ্রভু—এই গাড়িতে যাচ্ছেন, তাঁর নাকি এক কুকুর Dog Box-এ ছিল। আমরা তো দেখছি খালি। আমাদের আগের স্টেশন বলছে যে, তারা Dog Box-এ কুকুর দেখেছে। অথচ এখানে দেখছি—Dog Box খোলা। ব্যাটা কুকুর হয়তো কোথাও প'ড়ে-ফ'ড়ে গেছে। আমাদের রামসুন্দরবাবু বলছেন, 'দিন যে-কোন একটা কুকুর পুরে—তারপর দেখা যাবে। রেল কোম্পানি তো A Dog বলে বুক্ করেছে—A Dog হ'লেই হ'ল। তারপর ব্যাটার কুকুর যদি পছন্দ না হয় তো কোর্টে গিয়ে বোঝাপড়া করুক গে, যত সব আপদ জোটে আমারই ঘাড়ে। কি বলেন? দোব এ কুকুরটাকে ঢুকিয়ে? একেবারে মোটে রোঁয়া নেই!"

মিঠ্‌ঠু বলিল—"এত তাড়াতাড়ি অন্য কুকুর পাওয়া সম্ভব নহে।"

মালবাবু বলিলেন—"দিন তো দুর্গা ব'লে চড়িয়ে। তারপর দেখা যাবে।"

মিঠ্‌ঠু আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া Dog Box-এ তুলিয়া দিল। ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

চলিয়াছি। নববধূ যেমন তার আজন্মপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া অজানা-অচেনার উদ্দেশে আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেল-হৃদয়ে যাত্রা করে, আমিও তেমনি চলিয়াছি। জানি না আমার এই অজানা সাহেব মনিব কেমন লোক! যেমনই লোক হোক, সাহেবেরা শুনিয়াছি ভাল কুকুরের আদর জানে। তা ছাড়া সত্যই ভাল কুকুরকে চেনে, যত্নও করে। তাই আমার আশা আছে যে, বুলডগ-পূর্বপুরুষের আভিজাত্য সে আমার জীর্ণ অঙ্গেও খুঁজিয়া পাইবে। শুনিয়াছি, সাহেবরা কুকুরকে মাংস খাইতে দেয়।

মাংস কেমন কখনও খাই নাই। মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরা শুষ্ক অস্থি চিবাইয়াছি; কিন্তু ভাল মাংস শুনিয়াছি অতি অপরূপ জিনিস—সাহেবরা শুনিয়াছি রোজ মাংস খাইতে দেয়। শুনিয়াছি—

চার

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি, একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিম গগনে সূর্য অস্তোন্মুখ!

একটু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কুলী আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিল। বুঝিলাম, এইবার আমার সাহেব মনিবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে, মিলন-লগ্ন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সহসা বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল—আশায় আনন্দে না ভয়ে—বলিতে পারি না। কেমন যেন মনে হইল, আর চলিতে পারিতেছি না। সেই কঙ্করময় প্ল্যাটফর্মের উপর বসিয়া পড়িলাম; কুলীটা কিন্তু আমার অন্তরের আকুলতা বুঝিল না, কাঁকরের উপর দিয়াই হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুলী গিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, কুত্তা লে আয়া।"

সাহেব বলিলেন—"What? What's the joke?"

ক্ষীণ ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া প্রভুর দিকে চাহিতে যাইব, এমন সময় আমার মুখের উপরেই সজোরে সবুট পদাঘাত করিয়া সাহেব গর্জিয়া উঠিলেন—"লে যাও হিঁয়াসে —Station master-কো বোলাও।"

তারপর কি ঘটিল জানি না। দড়ি ছিঁড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া এক ভদ্রলোকের আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। আঙিনার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই দেখিলাম, এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। করিয়াই ডাকিলেন—"ওগো, শুনছ?"

"কি হ'ল ?"—বলিয়া এক উদ্‌গ্রীব তরুণী বাহির হইয়া আসিলেন।

"চাকরি হ'ল না। সাহেব বললে—ও post-এ বাঙালী নেওয়া হবে না—সাহেবদের জন্য ওটা reserved। অমন চাকরি কি আর ভেতো বাঙালীর অদৃষ্টে জোটে।"

হঠাৎ তাহাদের নজর পড়িল আমার উপর। তরুণীটি বলিলেন—"কোত্থেকে একটা লোম-ওঠা পাগলা কুকুর এসেছে দেখ। নাকে মুখে রক্ত লেগে আছে। নিশ্চয়ই কামড়েছে কাউকে। ভয় করছে আমার। মেরে দূর কর এখনি।"

ভদ্রলোকটি বেগে লাঠি তুলিতেই খিড়কি দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

অনির্বচনীয়

ক্ষণিকা খাস্তগীরের মস্তকে বজ্রপাত হইয়াছে। এখনও কিন্তু সে মরে নাই, বরং এ অবস্থায় মরা উচিত কি না, এবং উচিত হইলেও সহজ অথচ মর্মান্তিক মৃত্যুর উপায় কি—তাহাই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে ছাদে পায়চারি করিতেছে। কেরোসিন তেল, গলায় দড়ি, পুকুরে ডোবা, এমন কি cyanide পর্যন্ত নিতান্ত মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মার জীবাণু শুঁকিলে হয় না?

হঠাৎ পিছনে রমেশবাবুর চটির শব্দ।

"খস্তু, এখানে আছিস? এই যে! আচ্ছা, কি ছেলেমানুষ বল্ তো তুই!"

ক্ষণিকা কোন কথা কহিল না।

রমেশবাবু বলিলেন—"কথা বলছিস না যে? আমি কি এক্ষুনি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব? কথাটা ভেবে দেখতে দোষ কি?"

ক্ষণিকা বলিল—"তুমি যে বাবা শেষকালে আমাকে একটা দোজবরের হাতে দেবে, একথা ভাবতেও পারি না।"

রমেশবাবু বলিলেন—"বেশ তো, তাকে না-ই করলি বিয়ে। আমার ছেলেটিকে ভাল লাগল, তাই বলছিলাম। বিদ্বান, বড় চাকরি করে, চমৎকার স্বাস্থ্য, ছেলেপিলে কিছু নেই। হ'লই বা দ্বিতীয় পক্ষ। বেশ তো বাপু, তোর পছন্দ না হয় করিস না বিয়ে। এখন শুবি চল্। তোরা লেখাপড়া শিখে শুধু টন্সিল দুটোই বড় করেছিস্—বুদ্ধি কিছু বাড়ে নি।"

মাতৃভাবাপন্ন রমেশবাবু তাঁহার মাতৃহীন কন্যাকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি—প্রথমেই বলা উচিত ছিল—ক্ষণিকা খাস্তগীর ইংরেজীতে 'অনার্স' লইয়া বি-এ পাস করিয়াছেন। প্রধান মাসিক-পত্রগুলিতে তাঁহার ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকা পরদিন বান্ধবী সুজাতাকে বলিল—"যাক, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেল। লোকটার আক্কেলকে বলিহারি যাই। বউ মরতে না মরতে অমনি বিয়ের তাড়া পড়েছে! পুরুষগুলো আমাদের দেখছি সিগারেটের সামিল ক'রে তুলেছে। একটা ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা ধরানো চাই। এ ভদ্রলোক যেন আরো

ব্যস্তবাগীশ! যেন আগের স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই দ্বিতীয় বিয়ের হোমের কাঠগুলো ধরিয়ে নিতে চান।"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি? ভদ্রলোক কে?"

ক্ষণিকা উত্তর দিল—"ভদ্রলোকের নাম অজয়কুমার বোস। সরকারী চাকরি করেন—কবিতাও লেখেন। কাব্যরস একটু বেশী মাত্রায়—"

সুজাতা কেবল কহিল—"তাই নাকি?"

ক্ষণিকার উত্তেজনা তখনও কমে নাই। সে বলিয়া চলিল—"আমার তো মনে হয় আইন ক'রে এসব বিয়ে বন্ধ করা উচিত!"

সুজাতা কিছু বলিল না।

সুজাতা তখন কিছু বলিল না বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার আইন-জ্ঞান সে হাতে-কলমে দেখাইয়া দিল। মাসখানেক পরে সুজাতা দেবীর সহিত অজয় বোসের শুভবিবাহে নিমন্ত্রণ-লিপি পরিচিত মহলে বিতরিত হইতে লাগিল।

বন্ধুর স্বামী। আলাপ হইলই। একদিন কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে ক্ষণিকা অজয়বাবুকে কহিল—"ছেলেবেলায় আপনি 'ট্রাই ট্রাই এগেন' কবিতাটি ভাল ক'রেই পড়েছিলেন দেখছি।"

অজয়বাবু বলিলেন—"সে তো পড়েইছি। তা ছাড়া কি জানেন, প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বড় বড় লোক এসে দিনরাত অনুরোধ করতে শুরু করলেন—কি করি বলুন! নিজের তাগিদ তো ছিলই—"

ক্ষণিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"বড় বড় লোক মানে?"

"এই ধরুন না কেন, যুগ্মপত্নীর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য থেকে শুরু ক'রে, শেলি, বায়রন, মোপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ সবারই সনির্বন্ধ অনুরোধ; এমন কি আমাদের সত্যেন দত্ত পর্যন্ত বললেন—

কে গেছে কে যায় আর
অত শত ভাবনার
ফুরসুৎ নেই আজ—নেই বন্ধু!

ওই যে ওমর খৈয়াম—আপনি বিয়েতে উপহার দিয়েছেন—সে ভদ্রলোক তো

নাছোড়। এখন ভেবে দেখুন, ভদ্রভাবে ওঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হ'লে আমাদের মত গরীব লোকের বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি!"

আরক্তিম-কর্ণমূল লইয়া ক্ষণিকা বলিল—"থামুন থামুন, আপনাদের বোঝা গেছে।"

কিন্তু অজয়ের সপ্রতিভ সরস উত্তরটা সে মনে মনে উপভোগ না করিয়া পারিল না। লোকটি রসিক—সুজাতা সুখী হইবে।

কিছুদিন পরে শোনা গেল, সুজাতা আত্মহত্যা করিয়াছে; এবং তাহারও কিছুদিন পরে শোনা গেল, অজয়বাবু নাকি আবার বিবাহ করিতেছেন এবং এবার নাকি ক্ষণিকা খাস্তগীরকে—'লভ্ ম্যারেজ'!

রামায়ণের এক অধ্যায়

অভিনয় কাণ্ড

সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায়। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছে, ঘোরতর অবিচার করিয়াছি।

কুলগুরু বশিষ্ঠকে বলিতেছেন,—"গুরুদেব, অবিচার—এ ঘোর অবিচার। সীতার কোন অপরাধ নাই—তিনি নিরপরাধিনী, দেবী। আমার কোন অধিকার নাই তাঁহাকে শাস্তি দিবার। আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি—"

তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন,—"বৎস, সত্যরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি সত্যাশ্রয়ী। সত্যধর্ম পালন করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কার্য করিয়াছ।"

রাম বলিলেন—"এ তো সত্য নয়, এ যে মিথ্যা। এ যে অবিচার গুরুদেব, এ যে মিথ্যাচার গুরুদেব—"

গুরুদেব বলিলেন,—"অধীর হইও না বৎস, রাজধর্ম বড়ই কঠিন।"

রামচন্দ্র শুনিলেন না। অধীর হইয়া উঠিলেন।

"রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রজাপুঞ্জের মতামত গ্রাহ্য করি না—সীতাকে চাই। আমার দেবীকে চাই। রাজ্য যাক, মান যাক—"

রামচন্দ্র পাগল হইয়া গেলেন।

দুই

অভিনেতা নকুড় মাইতি রামের অভিনয় শেষ করিয়া যখন শেষরাত্রে বাড়ি ফিরিলেন, তখন তাঁহার পা টলিতেছে—মদের নেশায় চুরচুর।

ঠেলাঠেলির পর স্ত্রী হরিমতি দ্বার খুলিয়া দিলে নকুড়বাবু বলিলেন—"হারামজাদী, আধ ঘণ্টা ধ'রে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই?"

হরিমতি বলিলেন—"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

নকুড় মাইতি কহিলেন—"ফের কথার ওপর কথা!"

বলিয়াই এক লাথি এবং রামলাথি।

স্কুলের স্মৃতি

গত বর্ষায় বেশ একটু কাবু করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে বাস করি, সুতরাং বর্ষার আগমন আমার পক্ষে মনোরম না হইবার কথা। কিন্তু একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লাভ নাই। সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়া রাখুন, সেদিন শ্রাবণ-সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত ব্যাপারটির আনুপূর্বিক আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, কাব্যরসে কুলাইবে না—কিছু চোলাই রসের প্রয়োজন। দোকান আমার বসতবাটি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া কাদায় ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

গঙ্গার তীর। দুকূলপ্লাবিনী বর্ষার গঙ্গা। শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। মেঘে আর জ্যোৎস্নায় নির্জন নদীতীরে…। যাক, বর্ণনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না। সে আর আমি মুখোমুখি বসিয়া ছিলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জন সাক্ষাৎ। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নাই—একটু দূরেই স্থানীয় শ্মশান। আকাশে মেঘ ও জ্যোৎস্না। সম্মুখে বেগবতী বর্ষার নদী। ট্যাঁকে কিঞ্চিৎ ধন ও উদরে প্রচুর 'ধেনো'। বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"আর একটু কাছে এসে বসো না।"

রমণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না।"

আমি আবেগভরে কহিলাম—"কেন? বল, কেন?"

রমণী এবার কিছু না বলিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমিও আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম—

"কেন? বল, কেন? ভয় করছে? কিসের ভয় তোমার? স'রে এসো লক্ষীটি।"

"না।"—বলিয়া সে আর একটু সরিয়া বসিল। আমি আবার একটু কাছে গিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—

"তুমি বিয়াত্রিচের গল্প শুনেছ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন? শোন নি? জোহান বোয়ারের লাইফ পড়েছ? যাতে সেই স্কুলমাস্টার? তাও শোন

নি? বেশ, কেষ্ট-রাধার কথা তো জান? এবার ভেবে দেখ দিকি সেই যমুনার কূলে—"

এবার রমণী বলিল—"আমরা হলাম কৈবর্তের মেয়ে—"

উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম—"হোক, তাতে ক্ষতি নেই। দোহাই তোমার, একটু কাছে স'রে এসো।" বলিয়া তাহার হতে চাপিয়া ধরিলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।

বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। গ্রাহের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম—"দেখ, জীবন খুব ছোট—এই ক্ষুদ্র জীবনে আজ যে শুভ মুহূর্তটি এসেছে—নষ্ট ক'রো না তাকে। শুনছ? যত টাকা লাগে—। শুনছ?"

রমণী কিছু বলিল না। হাত ধরিতেই কিন্তু আবার সরিয়া বসিল। আমিও সরিয়া গেলাম।

শ্রাবণের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমণী কিন্তু ভিজিল না। তখন মনে হইল, গান গাহিয়া দেখি যদি কিছু হয়। গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া গান ধরিলাম—

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্ নে আজি দোল বা—গিচায়!"

হঠাৎ দেখি সে কাত হইতেছে।

"ও কি, অমন করছ কেন?"

ঝপাং করিয়া ধস ভাঙিল।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছি; কিন্তু স্থূলের স্মৃতিটি আজিও মর্মে হুলের মত বিঁধিয়া আছে।

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু বাছুর, শেষে মানুষ পর্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল; কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

"ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

কিছু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল—"আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ করিলেন—"বাবা, আমার নেড়ার যেন একটি টুকটুকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

হরিহর ভট্টাচার্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আজীবন তোমার পূজো ক'রে এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সহায় হও।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে,—"ঠাকুর, পাস করিয়ে দাও।" আজ সে বলিল, "ঠাকুর যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাচ টাকা খরচ ক'রে হরির লুট দেব।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

হরেন পুরকায়স্থ ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল—এগারোটা ভোট আমার চাই। কালী

পুরোহিত মোটা রকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল—"ভোটং দেহি—ভোটং দেহি—"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা।"

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল—"দেবতা, জল দাও।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল—"আমার একটি মাত্র সন্তান, ঠাকুর, কেড়ে নিও না।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তি পিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন—"বিধাতা, মাগীর বড় দেমাক। নিত্যি নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধ'রে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও তো।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

দার্শনিক কহিল—"হে বিধাতা, তোমাকে বুঝিতে চাই।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল—"জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

বাংলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল—"কোনো সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাসায় খাঁটি সরষের তেল আছে?"

ব্রহ্মা কহিলেন—"আছে। কেন বলুন তো?"

বিধাতা। "আমার একটু দরকার। দেবেন কি?"

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) "অবশ্য, অবশ্য।"

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন—"মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ ক'রে নিলে সুস্বাদু হয়।"

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন—"মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হ'লে পরে ঝোলটা মেরে ভাজা ভাজা ক'রে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না।"

"আমি জানি না! মাংস তো ভাজা উচিতই, মসলাও ভাজা উচিত।"

"পাক-প্রণালীতে ও-কথা লেখে না।"

"পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড় বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি, মাংসটা আগে সিদ্ধ—"

"পাক-প্রণালীর কথা তুমি মানতে চাও না?"

"না।"

"কেন শুনতে পাই কি?"

"কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা—অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে—তাদের কথাই প্রামাণ্য।"

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

"সব বাবুর্চিও তো সব সময়ে একমত নয়।"

"যে-সব বাবুর্চি মাংস আগে ভাজতে চায়, তারা বাবুর্চি নয়—বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে?"

প্রথম তার্কিক ধৈর্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"জাপান-টাপান বুঝি না। তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে? অভদ্র কোথাকার!"

"কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! নিজে দুনিয়ার কোন খবর রাখবে না, আবার ফদর ফদর ক'রে তর্ক করতে আসে! বেকুব!"

"ফের 'বেকুব' বলছ?"

"ক্রমাগত বলব।"

"তবে রে—"

"তবে রে—"

তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রগতি উপভোগ করিতেছিল; উভয়কে সমরোন্মুখ দেখিয়া হাস্যভরে কহিল—"পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা তো উভয়েই নিরামিষ-ভোজী। আমিষ বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমাল দাঙ্গা করিতেছ কেন? তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুশকিলে পড়িবে।" শৃগালের কথা তাহারা শুনিল না, পরস্পর শিঙে শিঙ লাগাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আচমকা ঘুম ভাঙিয়া গাড়োয়ান দেখিল, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলীবর্দযুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় তাহার অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুইটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল—"খা শালারা খা—বেশী ডেঁপোমি করিস না।"

খাইতে দিল বিচালি।

চট করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্মানী সংবাদ, হিটলার-মুসোলিনি প্রকৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন, ট্রেন থামিয়াছে নাথনগরে।

চলচ্ছবি

সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

একটি তরুণী বসিয়া সেলাই করিতেছে। কোণে দুগ্ধফেননিভ একটি মার্জার। সেলাই ভাল লাগিল না। পিয়ানো বাজাইয়া গান ধরিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অবশেষে টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করিয়া গান। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনের কথা কখনও কি তাহার কাছে পৌঁছিবে?

জানিতে পারিলাম, তাহার অগণিত প্রণয়ীর মধ্যে দুইজনকে লইয়া সে সম্প্রতি বিব্রত। একজন ধনীর দুলাল, নাদুসনুদুস ভদ্রলোক। রোজ নানাবিধ উপহার লইয়া বিকশিতদশনে আসিয়া ধর্না দেয়। মোটরে বেড়াইতে লইয়া যায়। তরুণীর পিতা ইহাতে আপত্তির কিছু দেখেন না। কারণ তিনি চান এই নাদুসনুদুস লোকটি তাঁহার জামাই হোক। তাঁহার স্বর্গীয় পত্নীরও এই ইচ্ছাই ছিল এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অনুরোধেই এই তন্বী রূপসী ওই নাদুসনুদুসকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জননীর শেষ ইচ্ছা পালন করিতে কে না চায়!

নাদুসনুদুস লোক ভাল, টাকাকড়ি আছে, কুরূপও নয়, স্বাস্থ্য ভালই। কিন্তু—! তরুণীটি নানাদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখে। 'কিন্তু'কে ঠেকানো যায় না। সেদিন দুরন্ত ছুটন্ত পাগলা ঘোড়ার সম্মুখীন হইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে সুশ্রী যুবকটি তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, নাদুসনুদুস মোটেই তাহার মত নয়।

সেই নামগোত্রহীন দুঃসাহসী যুবাকে সমস্ত নারীহৃদয় দিয়া সে চায়।

নাদুসনুদুস কিন্তু না-ছোড়।

তরুণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতেও পারে না। জননীর শেষ-ইচ্ছা। জননীর মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন শীর্ণ মুখখানি মনে পড়ে। নাদুসনুদুসকে কিছু বলিতে পারে না।

অথচ সেই যুবক! যুবকটির পরিচয় সে পাইয়াছে। সে এক জমিদার-বাড়ির সহিস। হোক সহিস, সে সুশিক্ষিত। শেকস্‌পিয়র হইতে গল্‌স্‌ওআর্দি, এমন কি

আরলেনের পর্যন্ত খবর রাখে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দেশের মুকুটমণি হইতে পারিত ; শুধু কপালের দোষে সে আজ সহিস মাত্র।

সর্বোপরি সুন্দর এবং সুপুরুষ। বলিষ্ঠ সতেজ বিদ্রোহী। যদিও সামান্য সহিস ; কিন্তু মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে, চোখে অহীন-দীপ্তি।

আমি দমিয়া গেলাম।

সত্যই তো, একদিকে নাহুসনুহুস আর একদিকে ওই সর্বগুণান্বিত সহিস ছোকরা —ইহার মধ্যে আমার মত নগণ্য লোকের স্থান কোথায়? একমাত্র সম্বল ছাঁটা গোঁফ-জোড়াটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইতিপূর্বে দুই-একবার তরুণীটি ও সহিস-যুবকটি শহরের বাহিরে যে পুলটা আছে তাহারই উপর গোপনে সন্ধ্যায় দেখাশোনা করিয়াছে। একদিন চুম্বন বিনিময়ও হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন যাহা ঘটিল তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর।

গভীর রাত্রি। সহিস ছোকরাটি এক প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির। ব্রাউন রঙের বিশাল ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া ছুটিয়া আসিল।

তরুণীটির বাড়ির সম্মুখে আসিয়া হুইস্‌ল্ দিতেই তরুণী পথে নামিয়া আসিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মায়ের শেষ-মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবলীলাক্রমে সহিস তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। তাহার পর—

টগবগ টগবগ টগবগ—

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্তও যেন ফুটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে নাহুসনুহুসও টের পাইল। যখন সে সত্যই বুঝিল যে, প্রেয়সী প্রণয়-শৃঙ্খল কাটিয়া পলাইয়াছে তখন তাহার মুখভাব একটা দেখিবার মত জিনিস। প্রতারিত নাহুসনুহুস, বিরহী নাহুসনুহুস, উন্মাদ নাহুসনুহুস! সে কি চেহারা! মোটর লইয়া পথে বাহির হইতেই একজন বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়া দিল, কোন্ পথে তাহারা গিয়াছে। প্রকাণ্ড 'রোল্‌স্ রয়েস্' সেই পথে ছুটিল। উদ্‌ভ্রান্ত নাহুসনুহুস 'স্টিয়ারিং' ধরিয়া বসিয়া আছে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—গাড়ির বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফরফর করিয়া মাথার চুল উড়িতেছে।

সে কি প্রাণান্তকর অনুধাবন! নক্ষত্রবেগে ঘোড়া মাঠ, বন, অরণ্য, পর্বত পার

হইয়া যাইতেছে; বিদ্যুৎবেগে নাহুসনুহুস অনুসরণ করিতেছে। প্রায় ধরে ধরে, এমন সময় সম্মুখে এক নদী। এক লম্ফে অশ্ব নদী পার হইয়া গেল। নাহুসনুহুসের রোল্‌স্ রয়েস্ পারিল না। স্টিয়ারিং ছাড়িয়া নাহুসনুহুস আক্রোশে দুই হাতে চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল।

ঝপাং।

নাহুসনুহুস জলে লাফাইয়াছে। কিন্তু সাঁতার জানে না। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। স্রোত ভীষণ। প্রাণপণে তবু চেষ্টা করিতে লাগিল সে। সহজে ছাড়িবে না। নাকে মুখে চোখে জল ঢুকিয়া, প্রবল স্রোতে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাকানি-চোবানির চরম হইল। তবু ছাড়িবে না। কি অমানুষিক 'আপ্রাণ' চেষ্টা; এমন না হইলে প্রেম! সমস্ত আত্মা দিয়া, সমস্ত সত্তা দিয়া নাহুসনুহুস ও-পারে যাইতে চায়।

প্রিয়তমা যে ও-পারে আততায়ীর হস্তে!

নাহুসনুহুস আর পারে না। বোধশক্তি হারাইয়া যাইতেছে, হস্ত পদ ক্লান্ত অবসন্ন। সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। নাহুসনুহুস বুঝি তলাইয়া গেল!

সেই সময়ে ঠিক ও-পারে একটি গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সহিস ছোকরাটি ও তরুণীটি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে, মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে।

হঠাৎ সহিসের নজরে পড়িল, নীচে নদীতে কে যেন ডুবিতেছে। সঙ্গিনীকে কহিল—"দেখ, কে যেন ডুবছে। ওকে তুলি।"

তরুণী কহিল—"ও কিন্তু নাহুসনুহুস।" সহিস সামান্য লোক নয়। মহামানব সে। সে হাসিয়া কহিল—"তা আমি জানি; হোক নাহুসনুহুস, কিন্তু মানুষ তো! সে ডুববে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব! হতে পারে না।" তীরবেগে ঘোড়ায় চড়িয়া তরতর করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল সে।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, নাহুসনুহুসের দেহ স্কন্ধে বহিয়া সহিস হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতেছে। সংজ্ঞাহীন বিশালকায় ভিজা নাহুসনুহুসকে লইয়া পাহাড়ে চড়া! কী কষ্ট! সহিসের মুখে দেবতার দীপ্তি—দেহে দৈত্যের বল।

ঘোড়াটি মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছু-পিছু আসিতেছে।

তাহার পর দুইজনে মিলিয়া নাহ্‌সনুহ্‌সের কী সেবাটাই করিল! সহিস তাহার একমাত্র কম্বলে তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া নিজে শীত ভোগ করিতে লাগিল।

তরুণী তখন কহিল—"প্রিয়তম, তুমি সহিস নও, তুমি দেবতা।"

কম্বলের ভিতর হইতে নাহ্‌সনুহ্‌স বলিল—"ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু এখন ঘুমাও।"

ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণী স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহার মা যেন বলিতেছেন—"বৎসে, তুমি যোগ্যতমকেই বিবাহ কর—ইহাই আমার পুনশ্চ ইচ্ছা।"

ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, সম্মুখে বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত-কপোতী চঞ্চুচুম্বন করিতেছে। পাশ ফিরিয়া দেখিল, নাহ্‌সনুহ্‌স জাগিয়া বসিয়া আছে। নাহ্‌সনুহ্‌স আবেগভরে কহিল—"দেখ, তুমি এই সহিসেরই উপযুক্ত। আমাকে এখন কেবল নদীটা পার করিয়া দাও। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"

তরুণী কহিল—"ধন্যবাদ। আপনাকে উনি নিশ্চয়ই নদী পার করিয়া দিবেন। ওঁকে জাগান।"

নাহ্‌সনুহ্‌স দেখিল, অদূরেই সহিস অঘোরে ঘুমাইতেছে। ডাকিল, সাড়া নাই। ঠেলিল, সাড়া নাই। সহিস জ্বরে অচৈতন্য।

তখন সে অগত্যা একাই পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। কাপড় তখনও ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখে নিরাশা।

হতাশ-প্রণয়ী নাহ্‌সনুহ্‌সের সে কি করুণ অবরোহণ!

সিনেমা শেষ হইয়া গেল। পথ চলিতে চলিতে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। কি আর করি! অগত্যা পোড়া বিড়িটা কান হইতে নামাইয়া ধরাইয়া ফেলিলাম।

বর্ষাব্যাকুল

ঘন-ঘোর করিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া নিবিড় কালো মেঘ থমথম করিতেছে। আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের আলো! পূরবী বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিতেছে।

মনটা বিকল হইয়া গেল। বাতায়ন-পথে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। বিছানায় উপুড় হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অবশ্যম্ভাবী বর্ষাসমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কি ঘনঘটা…! খবরের কাগজটা খুলিয়া দেখিলাম। অস্বস্তি বাড়িয়া গেল। কালিদাসটা কোথা?

গুরু গুরু গুরু গুরু—আকাশ ডাকিল।

"কেষ্টা—অ কেষ্টা!"

কেষ্টা চাকর আসিল। তাহাকে কহিলাম—"ওরে, বৃষ্টি আসছে। কড়া এক কাপ চা নিয়ে আয় তো। আর দেখ্, এক বাণ্ডিল বিড়িও আনিস।"

বাতায়ন-পথে দেখিলাম, ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। কালিদাসকে চাই। কালিদাস না হইলে জমিবে না। আসিলেন কিন্তু ভজহরিবাবু। তাঁহার সম্মুখের দন্ত কয়েকটি সর্বদাই প্রকাশিত। আমাদের ম্যানেজার তিনি।

"সহায়রামবাবু, আপনার একখানা চিঠি এসেছে আজ।"

চিঠি দিয়া ভজহরিবাবু চলিয়া গেলেন।

প্রিয়ার পত্র। বহুকাল পরে। বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ নিবিড় হইয়া আসিল। চিঠিখানি খুলিয়া আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আর একবার পড়িলাম। আবার একবার।

সমস্ত মনটা উদাস হইয়া গেল। কেষ্টা চা আনিল। একটু একটু চা পান করিতে করিতে প্রিয়ার পত্রখানি চতুর্থবার পাঠ করিলাম। আকুলতা বাড়িল বই কমিল না।

আকাশের ঘনায়মান আয়োজন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। নীরব অন্ধকার!

টপ টপ টিপ টিপ—বর্ষণ শুরু হইল।

হাতঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম, পৌনে দশটা। সমস্ত মনপ্রাণ বিচলিত! এখন যদি…নাঃ। পাশের বাড়ির গ্রামোফোন হইতে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন—"রতন পালংপর বৈঠল দুঁহু জন—"

সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল।

কড়—কড়—কড়—কড়াৎ—

আর পারি না। অন্তরের সমস্ত আবেগ ভাষায় রূপান্তরিত করিলাম—"কালিদাস রাস্কেলটা গেল কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস আপাদমস্তক ভিজিয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"উঃ, কি বৃষ্টি মাইরি!"

"কি বৃষ্টি মাইরি! সেই থেকে তোর জন্য ব'সে আছি। আমাদের জাতটা এইজন্যে উচ্ছন্ন গেল। সময়ের একটা জ্ঞান নেই! ক্যাড্ কোথাকার! এখন কি ক'রে যাই বল্ তো? না আছে একটা ছাতা, না আছে ওয়াটারপ্রুফ!"

কালিদাস অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"হঠাৎ বৃষ্টিটা নামতেই আটকে পড়লুম ভাই।"

"আজই কি শেষ?"

"হ্যাঁ, আজই শেষ।"

"ছি ছি মাইরি, গ্রেটা গার্বোর অমন ছবিটা দেখা হ'ল না। দশটা বেজে গেছে।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন মানসে কালিদাস কহিল—"তোর হাতে ওটা কি?"

"বউ চিঠি দিয়েছেন। তাঁর জ্বর, বড় মেজ সেজ ছোট ন—সব ছেলেগুলির জ্বর। মেয়ে দুটোর আমাশা হয়েছে। সে যাক গে। গ্রেটা গার্বোর লভ সিনটা মাইরি দেখা হ'ল না! এ দুঃখ রাখি কোথা—"

নিষ্ফল আক্রোশে মুষলধারার প্রতি চাহিয়া রহিলাম! পাশের বাড়িতে গান চলিতে লাগিল—"রসভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই—"

পূজার গল্প

গল্প শুনিতে চান তো? শুনুন তবে।

সেবার পূজার দুই-একদিন আগে সিমলা হইতে ফিরিতেছিলাম। আমি ইন্সিওরেন্সের দালাল। কার্যব্যপদেশে নানা স্থানে গতিবিধি। যে 'লাইফ'টির জন্য গিয়াছিলাম, তাহা লইতে পারি নাই। অন্য আর একজন সেটি বাগাইয়া লইয়াছে। সুতরাং মন খারাপ ছিল।

যে কামরায় উঠিলাম তাহাতে দেখি, অপরূপ সুন্দরী—একজন নয়—তিন তিন-জন। চোখ ঝলসাইয়া গেল। সঙ্গে একটি যুবক আছেন। তিনিও কন্দর্পকান্তি। আমার এই মেদবহুল কৃষ্ণবপু লইয়া ইহাদের নিকটে বসিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তবু বসিলাম। খানিকক্ষণ পরে যুবকটিকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত দূর যাবেন?" তিনি দেখিলাম, একটি সিনেমা-সাপ্তাহিকে নিবদ্ধদৃষ্টি—একটি অভিনেত্রীর অর্ধনগ্ন চিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

"কত দূর যাবেন?"

চকিত হইয়া যুবকটি বলিল—"কি বলছেন?"

"কত দূর যাবেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"বঙ্গদেশ।"

"আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি। একসঙ্গে যাওয়া যাবে বেশ।"

যুবকটি দেখিলাম, আবার সাপ্তাহিকে মন দিয়াছেন।

সাপ্তাহিকটিতে আমাদের কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে দেখিলাম। যুবকটির চিত্ত সেই দিকে আকর্ষণ করিবার আশায় কহিলাম—"এই বিজ্ঞাপনটা আমাদের কোম্পানির, আমরা যত বোনাস্ দিই—"

অর্ধনগ্ন অভিনেত্রীর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যুবকটি বলিলেন—"ওসব বুঝি না।"

"বোনাস্ বোঝেন না! আপনি ইন্‌সিওর্ড তো?"

"ওসব বুঝি না! যা বুঝি তা দেখছি।" বলিয়াই আবার সেই চিত্রের দিকে চাহিলেন। আমি বিষ্ণুচরণ বর্মা—ছাড়িবার পাত্র নহি। বলিলাম—"আপনার মত রসিক লোক জীবন-বীমা বোঝেন না এটা বিশ্বাস করা শক্ত। মাসে সামান্য কিছু অর্থব্যয় ক'রে যদি জীবনটাকে—"

বাধা দিয়া যুবক কহিলেন—"অনর্থক অর্থের কথা পেড়ে আমাকে বিব্রত করবেন না। বৈষয়িক যদি কিছু আলোচনা করতে চান, মায়ের সঙ্গে করুন।"

সহাস্য নমস্কারে তাঁহার জননীর সম্বর্ধনা করিলাম। বলিলাম—"আপনার ছেলে তো এ বিষয়ে আলোচনা করতেই চান না। আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত যে, জীবন-বীমা জিনিসটা সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্তব্য।"

মহিলাটি সমস্ত মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া বলিলেন—"আমিও কিন্তু ও-বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না; আপনার অসুবিধা না হয় তো একটু বিশদ ক'রে বলুন।"

"নিশ্চয়ই।"—বলিয়া শুরু করিলাম এবং অনর্গল আমাদের সম্মোহন-মন্ত্রগুলি সগর্বে আওড়াইয়া গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, মহিলাটির মনে রেখাপাত পর্যন্ত করিল না। অন্য দুইটি মহিলাও আমার বক্তৃতা মন দিয়াই শুনিলেন; কিন্তু তাঁহাদেরও কোন উৎসাহ দেখিলাম না।

একটু থামিয়া বলিলাম—"আশা করি আমার সব কথা আমি স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারছি।"

প্রথমা মহিলাটি বলিলেন—"হ্যাঁ, অস্পষ্ট কিছু নেই। কিন্তু আমার দরকার হবে না জীবন-বীমার।"

"আপনার না হয় না হতে পারে; কিন্তু আপনার পুত্রের, আপনার স্বামীর?"

"আমার স্বামী মৃত্যুঞ্জয়। সুতরাং তাঁর জীবন-বীমার প্রয়োজন কই?"

এমন সময় বাঙ্কের উপর হইতে স-শুণ্ড মুণ্ড বাহির করিয়া গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গণেশ কহিলেন—"তোমরা বড় গোলমাল করছ মা। এ চার দিন কি আর নিদ্রা হবে? একটু ঘুমিয়ে নাও না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম—একি! ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। জগজ্জননী দুর্গা বঙ্গদেশে চলিয়াছেন—সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদধূলি লইলাম। বলিলাম—"অবোধ আমি, ক্ষমা চাই।" শঙ্করী হাসিয়া বলিলেন—"কোন দোষ তো কর নাই বৎস। ফর্ম বাহির কর—বঙ্গদেশে পূজাটা ইন্সিওর করিয়া রাখি। তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছি।"

বল হরি, হরিবোল

"বল হরি, হরিবোল—"

নৈশ গগন মুখরিত করিয়া আমরা কয়জন প্রাণী চলিয়াছি। হঠাৎ রমেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে আমার ওপর?"

আমি বলিলাম—"না, কিছুমাত্র না।"

রমেশবাবু বলিতে লাগিলেন—"না হওয়াটাই আশ্চর্য। আজ বিকেলে আপনি আমার বাড়িতে অতিথি হলেন। রাত্রে আপনাকে মড়া বইতে নিয়ে যাওয়াটা ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু লোক জুটল না; কি করি বলুন!"

আমি বলিলাম—"আহা, ওর জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কলেজে পড়ার সময় মড়া পোড়ানোটাও আমাদের কোর্সের মধ্যেই ছিল প্রায়। প্রায়ই এ কার্য করতে হ'ত।"

হরেন্দ্রবাবু তখন বলিয়া উঠিলেন—"ওসব বাজে ভদ্রতা ছেড়ে এখন কেউ একটা মিঠে গোছের প্রেমের গল্প বলুন দেখি, সময়টা যাতে কাটে। এখনও বেশ কিছু দূর হেঁটে যেতে হবে। শ্যামবাবু, আপনি বলুন।"

শ্যামবাবু আমাদের মধ্যে একটু বয়স্থ লোক। তিনি বললেন—"আরে বাপু, দু-একটা প্রেম যা জীবনে করেছি তা কি আর এখন মনে আছে? আমাকে এখন অ্যালজাব্রার ফরমূলা জিজ্ঞেস করাও যা, প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই। এককালে করেছি সব। কিন্তু কিছুই ভাল মনে নেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা, তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে এলাম তো—বাতটা না বাড়ে।"

"বল হরি, হরিবোল—"

হরেন্দ্র তখন শ্যামবাবুকে ছাড়িয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন—"আপনি তো চন্দরদা এককালে খুব উড়েছিলেন। বলুন না দু-একটা গল্প—সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরিবোল—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"উড়েছিলাম বটে। কিন্তু ঠিক যে প্রেম করেছিলাম তা তো বলতে পারি না। কারণ each time, I had to pay for my love either in coins or in kinds! সুতরাং তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিত্ব নেই

মনের মধ্যে। রানী, হাবি, বিনোদিনী, নয়নতারা সব একাকার হয়ে গেছে—distinguish করা শক্ত।"

"বল হরি, হরিবোল—"

হরেন্দ্রবাবু রমেশবাবুকে তখন বলিলেন—"আপনার স্টকে কিছু আছে নাকি রমেশদা? ছাড়ুন না।"

রমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন—"আমি ভাই ইস্কুলের পড়া মুখস্থ ক'রে একজামিন পাস করাটাই পরমার্থ মনে করতাম। সুতরাং ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করা ছাড়া আর কিছু করি নি। বিয়ে ক'রে স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। ফলে চারটি মেয়ে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ।"

"বল হরি, হরিবোল—"

একটু থামিয়া রমেশবাবু আবার বললেন—"এইবার একটা প্রেম করব মনে করছি। কিন্তু অবসর কই? সকাল থেকে উঠে আপিস যাওয়ার তাড়া। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে মনে হয় চাট্টি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি। তোমার নিজের কিছু থাকে তো বল না ভায়া। অপরকে জ্বালাতন কর কেন?"

"বল হরি, হরিবোল—"

হরেন্দ্রবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ডাক্তারেরা যেদিন থেকে আশঙ্কা করলেন যে আমার বুকের দোষ আছে, সেদিন থেকে জীবনকে আর কারুর সঙ্গে জড়াতে সাহস পাই না। তা ছাড়া আমার মত মুখে বসন্তের দাগ, একচোখ কানা লোককে কোন্ মেয়ে ভালবাসবে বলুন! কিন্তু প্রেমের গল্প শুনতে আমার ভারি ইচ্ছে। বলুন না আপনারা কেউ একটা।"

"বল হরি, হরিবোল—"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কিছু মনে করবেন না মশাই। আপনি অপরিচিত লোক। জীবনে যদি ঘ'টে থাকে কিছু বলুন না। সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরিবোল—"

আমার জীবনে রমণীর আবির্ভাব ঘটে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা করে। সুতরাং কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম—'এখন কি ওসব ভাল লাগবে? তার চেয়ে বরং ভূতের গল্প বলুন কেউ।"

বয়স্থ শ্যামবাবু বলিলেন—"প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প আমার কাছে দুইই সমান। আপনি প্রেমের গল্পই বলুন।"

"বল হরি, হরিবোল—"

বলিতে লাগিলাম।

"তখন সবে আমি এম. এ. পাস করেছি। বেশি দিন নয়, বছরখানেক আগেকার কথা। মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে এক অশিক্ষিতা চাকরানীকে ভাল লেগে গেল। বয়স কম। কিন্তু ভারি সুন্দর। খোঁজ ক'রে শুনলাম মেয়েটি বিধবা। অমন নিষ্পাপ মূর্তি আমি কখনও দেখি নি।"

"বল হরি, হরিবোল—"

"তারপর ক্রমশঃ যেমন হয়। একদিন আড়ালে পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম। মেয়েটি শুধু বললে—'তা কি হয়'?"

"আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম, 'খুব হয়'। ব'লে একটা আধুলি বার ক'রে তার হাতে দিতে গেলাম। সে কিছুতে নিলে না।"

"বল হরি, হরিবোল—"

"এমনি ক'রে কিছুদিন গেল। যতদিন মামার বাড়িতে ছিলাম তার আশেপাশে ঘুরেছি। কিন্তু কিছুই সুবিধা ক'রে উঠতে পারি নি। মামা, মামী, বাড়িসুদ্ধ লোকজন। একদিন লুকিয়ে তার বাড়ি গেলাম। সেখানেও দেখি এক খাণ্ডার মাসী রয়েছে। বড় অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটতে লাগলো। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। মুখুজ্জেদের বাড়ি মামা মামী বাড়িসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হ'ল। ফাঁকা বাড়ি। কুসুমকে সেদিন একা পেলাম।"

হরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বল হরি, হরিবোল—"

"সেই দিনই বুঝলাম, কুসুমও আমাকে ভালবাসে। সেই দিনই তার সেই চকিত চাহনি আর ঠোঁটের কাঁপন দেখে আমি বুঝেছিলাম যে, আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সেদিন তাকে আমি যা-ইচ্ছা তাই করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না, কিছু করতে পারলাম না। শুধু একটি চুমু খেলাম।"

"বল হরি, হরিবোল—"

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না।

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তারপর?"

"তারপর ? তারপর আর কিছু নেই। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। কুসুমের আর দেখা পাই নি, শুনেছিলাম আমি চ'লে আসার পর সে-ও মামার বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

"বল হরি, হরিবোল—"

শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শব নামানো হইল। চিতা সাজানো হইল। শবের দেহাবরণ খুলিয়া তাহাকে চিতায় তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম—"থামুন—থামুন—থামুন—এ আপনার বাসায় কি ক'রে এলো রমেশবাবু ?"

রমেশবাবু বলিলেন—"অসুস্থ হয়ে এই মেয়েটি দুদিন আগে আমাদের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল কাকে খুঁজতে সে বেরিয়েছে। তা ছাড়া অত প্রশ্ন করবার অবসর ছিল কোথা ? বেচারী মারাই গেল। কেন বলুন তো ?"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ট্রেনে

ট্রেনে এক বৃদ্ধ চলিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও লোকটি যে এককালে শৌখিন ছিলেন তাহা বেশ বোঝা যায়। মাথার চুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের মোজাটা পর্যন্ত তাঁহার বিগত যৌবনের রুচির পরিচয় দিতেছে। হাতে একটি মোটা বর্মা চুরুট। খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি।

তিনি কামরাটিতে একাই ছিলেন। কিউল স্টেশনে ট্রেন থামিতে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবকটির ঘাড় চাঁচা, গোঁফ ছাঁটা, চোখে সস্তা দামের খেলো নীল চশমা, পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির অন্তরালে গোলাপী গেঞ্জি, মুখে বিড়ি, বগলে একটি মাসিক পত্র। আসিয়াই বেঞ্চি বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—"কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে—।" তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বিড়িটা ধরাইতে একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার কত দূর যাওয়া হবে স্যার ?"

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়াছিলেন। সংযতকণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন—"দানাপুর যাব। আপনি ?"

"তবে বেশ ভালই হ'ল, আমিও দানাপুরেই যাব। তা হ'লে আমার স্যার এই পুঁটুলি আর বইটা রইল। আমি চট্‌ ক'রে এক কাপ চা খেয়ে আসি। আর বিড়িও আনি এক বাণ্ডিল।"

অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল। মুখে বিড়ি। কিছুক্ষণ কোন কথাবার্তা নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাতের খবরের কাগজটা নামাইতেই যুবকটি হাত বাড়াইল—"কাগজটা একবার পেতে পারি স্যার ?"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা দিতে হইল।

একটু পরেই যুবকটি বলিয়া উঠিল—"ইস্, একটি ছোকরা আত্মহত্যা করেছে দেখছি প্রেমে প'ড়ে।"

বৃদ্ধ যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সশব্দে ঝালটা ঝাড়িয়া দিলেন—"আজকালকার এই গোঁফ-ছাঁটা ছোঁড়াগুলোকে দেখলে গা জ্ব'লে যায়।"

যুবকটি কিছুমাত্র না চটিয়া পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আপনাদের ছোকরাকালে কি আপনারা প্রেম করেন নি? সব যুধিষ্ঠির ছিলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির হয়তো ছিলাম না। কিন্তু বেয়াদপ ছিলাম না। বুড়ো লোকের সম্মান রেখে কথা কইতাম।"

ছোকরা দমিবার নহে। আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—"আপনারাও প্রেম করতেন তা হ'লে?"

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন—"আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ? দেখি একবার।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখুন। ওতে বেশ একটা ভাল গল্প আছে, পড়ে দেখুন। 'মগডালে' প'ড়ে দেখুন।"

বৃদ্ধ মাসিকটির আদ্যোপান্ত উল্টাইয়া 'মগডালে' পড়িতে শুরু করিলেন। লেখকের নাম নাই। বৃদ্ধ পড়িতে পড়িতে বর্মাতে দুইটা টান দিয়া বুঝিলেন, ধরাইতে হইবে। দেশলাইটা কোথা গেল? এ পকেট সে পকেট খুঁজিতেছেন, এমন সময় যুবকটি চট্ করিয়া নিজের দেশলাইটা হইতে ফস্ করিয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া বলিল—"এই যে আসুন স্যার।"

"Thanks"

"কেমন লাগছে স্যার গল্পটা?"

"একেবারে ট্র্যাশ। শেষ হ'লে বাঁচি।"

"শেষের দিকটা দেখবেন, রস আছে।"

"দেখা যাক।"

"বাগানের দৃশ্যটা কেমন লাগল?"

"বেশ অদ্ভুত। তবে কোন জিনিসই শেষ পর্যন্ত না প'ড়ে কিছু বলা যায় না।"

যুবক কিছু না বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

ফুল-বাগানে ঝুলবি যদি আয়
এই ভরা জোছনায়—"

বৃদ্ধ পড়িয়া চলিয়াছেন। বাহিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটিতেছে।

গল্প শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—"একেবারে বাজে।" যুবক বলিয়া উঠিল—"কেন, শেষ কালটায়—যেখানে মণিমালা কদমগাছের মগডালে উঠে ব'সে আছে, আর নায়ক ভুলে মনে করেছে যে, সে তালপুকুরে ডুবে গেছে—আর সেই ভেবে ক্রমাগত সাঁতার দিয়ে খুঁজছে, সেখানটা ভাল লাগল না আপনার?"

"রাবিশ! আজকাল ছেলেরা বোধ হয় সত্যিকার মেয়েমানুষের সন্ধান পায় না।"

"তার মানে?"

"তা না হ'লে ওই রকম গল্প লেখে কেউ! এই সত্যি কথাটা কেউ বুঝছে না যে, যাকে স্বর্গের দেবী ব'লে সবাই অস্থির হচ্ছে, she can be easily bought!"

"সেটা কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব?"

"প্রায় ক্ষেত্রেই, অন্তত আমার তাই ধারণা।"

"কি রকম বলুন না!"

"এই ধর একটা concrete example দিচ্ছি। আমারই ছেলেবেলায়, প্রায় বছর কুড়ি আগে সৈরভী ব'লে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হ'ল। তার গর্ভে একটা ছেলেও হ'ল। ছেলেটা মাস দুয়েকের, তখন বাস্, মাগী একদিন উধাও। শুনলাম তিনি রামেশ্বরপুরের জমিদারের প্রেমে পড়েছেন। আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মাথাই ঘামালাম না। I had another—girls were so cheap in those days!"

যুবক মুখ হইতে বিড়িটা ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাহার পর যুবক বিনীত স্বরে বলিল—"আমায় মাপ করবেন। না জেনে হয়তো আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি।"

"মানে?"

"মানে, সৈরভী আমারই মা। তিনি এখনও রামেশ্বরপুরের জমিদার বাড়িতে চাকরাণী আছেন। আপনি আমার বাবা।"

এই বলিয়া সে প্রণত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

তাহার পর হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা, আপনার নাম কি হারাধন বসাক?"

"আমার নাম রমেশ সেন।"

"ও, যাক। তবে আপনি নন। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বসাক। তা হ'লে আপনার একটা চুরুট দিন স্যার। আমার বিড়ি গেছে ফুরিয়ে। বাঁচালেন আপনি।"

বলিয়া ছোকরা হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভা সমিতি করিয়া, কবিতা লিখাইয়া, সর্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ অনায়াসে তাহাদের উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের বর্তমানে এসব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুসফুস গুজগুজ করিতেছে মাত্র; কারণ আর কিছুই নহে, শ্যামা নাম্নী ধোপানীটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।

যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী, তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার মহাশয় সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। প্রবীণ হালদার মহাশয় কিন্তু প্রবলভাবে উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই হালদার মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল, তখন তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন—"শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে! ছি ছি!"

এতৎ প্রসঙ্গে ভাদুড়ী মহাশয় য-ফলা আ-কার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করলেন। বলিলেন—"আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—"

পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, কোন্ ধোপানীটা বলত হে?"

দেখা গেল, হালদার মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাস-স্থান, চেহারা, বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে উপসংহারে বলিলেন—"শৈলেশ যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি জড়িয়ে পড়েছে কে জানত? অত বড় ছেলে, অত বড় মেয়ে—"

ভাদুড়ী মহাশয় আবার বলিলেন—"ছ্যা-ছ্যা! লোক হাসালে!"

খোঁড়া মল্লিক মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে শ্যামা পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু ধোবার নিকট মার খাইয়াছিল। মল্লিক মহাশয়

শৈলেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু ধোপাকে বললেন—"কথাটা আর কারও কাছে প্রকাশ করিস নি, বুঝলি ?

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করল—"কোন্ কথাটা ?" মল্লিক মহাশয় থতমত খাইয়া কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজেদের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করলেন। করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন—কেন সে পিরু ধোপার নিকট গিয়াছিল ? এ কি আহাম্মকি !

সুতরাং মল্লিক মহাশয়ের এই কাঁচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি মুখুজ্জে মহাশয়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিরুর বাড়িতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল—"মল্লিকের কথায় কিছু মনে করিস নি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে।"

এবারও বিস্মিত পিরু কহিল—"মানে ? কি বলেছেন ?" মুখুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন—"মানে ? ও কিছু নয়,—বুঝলি ?" বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন—"পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে ! মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে।"

সকলে চটিয়া মল্লিকের উপর খড়্গহস্ত। বেচারী মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিরুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল তখনই ভাবিল এবং হাসিল, মল্লিক মহাশয় আজকাল সিদ্ধি খাইতেছেন।

যাই হোক, শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার, মুখুজ্জে প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা-গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে ভিতরে অবশ্য ভাদুড়ী হইলেন কৌতূহলী, মুখুজ্জে উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ।

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাত ছোট নয়। অনেকগুলি বনিয়াদী ভদ্রগৃহস্থের সেখানে বসবাস। গোটা-দুই চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বরবাবুর বিপক্ষ দলও একটি ছিল, এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী, কর্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন সেই হেতু তাঁহার বিপক্ষ দলটি বেশ ভারীও ছিল। তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-রজকিনী-প্রসঙ্গটা তাঁহারা বেশ একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল—"হালদার মশাই ব'লে বেড়াচ্ছেন যে, শৈলেশ্বরবাবু নাকি খুলনা গেছেন।"

হুঁকাতে দুইটি টান মারিয়া রায় মহাশয় বলিলেন—"হালদারকে ব'লে দিও হে, সূর্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে, তা আমরা সবাই জানি। খুলনার চেয়ে ঢাকা বললে আরও মানাত।"

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন—"আহা, চট কেন! এ কথা হালদার বলবে না তো কে বলবে বল? ওই দলটার সব কটা পাজী। বুড়ো মিত্তিরটা সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি আবার মাস্টারি করেন।"

"ভাদুড়ীই বা কি কম! রোজ ওঁর ময়নাদীঘির ধারে বেড়াতে যাওয়াটার অর্থ কি?"

বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন—"সব ঘুঘু।"

"পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!" এই বলিয়া রায় মহাশয় হুঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

দুই

ফলে অচিরকালের মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ী মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায় মহাশয়, রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুখুজ্জে মহাশয়, মুখুজ্জে মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙুলী মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শৈলেশ্বরবাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা-সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি জনমত ক্রমশ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে, ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও যান নাই—কারণ স্টেশনের কর্মচারীরা কেহ তাঁহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি পদব্রজেই কোথও গিয়া স-রজকিনী আত্মগোপন করিতেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর গলায় বলিতে লাগিলেন—"আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানীটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠামাঠি দৌড়ুচ্ছেন!"

তিন

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বরবাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে, ভীত-চকিত শৈলেশ্বর-গৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকূল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার সমবয়স্কা গৃহিণীগণ বেশ রসায়ন দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল।

"ও মা, কি ঘেন্নার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না!"—বলিয়া অনেকেই গালে হাত দিল এবং ঘাড় কাৎ করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন—"পুরুষমানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই। একবার চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্!"

হালদার-গৃহিণী একটু সহানুভূতির স্বর দিয়া বলিলেন—"উনি তো বলছিলেন, শৈলেশবাবু খুলনা গেছেন।"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"থাম্ লো থাম্। আমার কর্তাটিও ওই দলে। সব চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। ব'লে দিয়েছি এবার পষ্ট করে যে, ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবে দাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে। বুড়ো মিনসের অত আড্ডা দেওয়া কেন?"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর ফাঁদি-নথ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। মরীয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"কোনদিন কিন্তু ওঁকে শ্যামা ধোপানীর সংস্রবে দেখি নি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিরু ধোপা। শ্যামা তো কোনদিন আসেও নি আমাদের বাড়ি।"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"এই বুদ্ধি না হ'লে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন! তারা যা করবে তা তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে নাকি? শৈলেশবাবু হলেন একটা ঘাগী মোক্তার। তাঁর সঙ্গে চালাকি! পুরুষমানুষদের বশে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে—নজরবন্দী ক'রে রাখা। চোখে চোখে রাখা। যা বললেন আমাদের গাঙ্গুলীদিদি, চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"

চার

শৈলেশ্বরবাবুর দুই পুত্র—মাধব ও যাদব। মাধব বি. এ. পাস করিয়াছে। যাদব আই. এ. পড়িতেছে। তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে! তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটি ঝুনা ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন ছোকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধদের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল। হালদার মহাশয়ের উপর ধনী রায় মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নামে ডাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিয়াছেন। ভাদুড়ী মহাশয় মানিক পোদ্দারের নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন, গাঙুলী মহাশয়ের উস্কানিতে পোদ্দারের পো ভাদুড়ী মহাশয়কে চাপ দিতে শুরু করিয়াছে। মল্লিক মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষ দলের কাহারও বাড়ি আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইতে 'সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা' নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারিখানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি কি করিয়া বিপক্ষ দলের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া স্বদলের কয়েকজন পাণ্ডা স্থানীয় পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোস্টমাস্টার বেচারা এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—Everything is fair in love and fight। শেষ পর্যন্ত ল'ড়ে দেখব, তবে ছাড়ব।"

পাঁচ

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

হঠাৎ শ্যামা ধোপানী কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ি গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোন কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল—যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীণের দল কতকটা হতভম্ব হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অবশ্য তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন—"ভূতের কাছে মামদোবাজী! মামার বাড়ি! পিরু ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে তো!"

শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিল না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়, কূপে পড়িয়া। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কুয়া ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

মাত্র দশটি টাকা

অপ্রস্তুত হইয়া বিধুবাবু বলিলেন—"আচ্ছা থাক্, তাতে কি হয়েছে? হাতে যখন থাকবে তখন দেবেন। ব্যস্ত কি?"

ততোধিক অপ্রস্তুত হইয়া নিখিলবাবু বলিলেন—"না, ব্যস্ত হবার কথা বই কি! এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ঘোরালাম। আজ আপনাকে ঠিক দিতাম, কাল রাত্রে টাকাটা এনেও রেখেছিলাম। কিন্তু সকালে বোসজা মশাই এসে একেবারে নাছোড় হয়ে পড়লেন। বেনারসে তাঁর ছেলের অসুখ করেছে, তার এসেছে—কিছু টাকা না হ'লে—"

বিধুবাবু বলিলেন—"তা বেশ করেছেন দিয়েছেন। তার জন্যে আর কি হয়েছে! তিনি ফেরত দিলে আমাকে দেবেন 'খন। আজ দেখি যদি বিপিন কিছু ধার দেয়! আমারও আজ দরকার কিছু টাকার—" বলিয়া বিধুবাবু উঠিলেন। বিধুবাবু বাহির হইয়া যাইতেই নিখিলবাবুর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়া গেল এবং মনে মনে তিনি বলিলেন—"চামার কোথাকার। কটা টাকার জন্যে আর ঘুম হচ্ছে না।"

বাহিরে গিয়া বিধুবাবুরও মুখভাব বদলাইল এবং তিনিও অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"বেটাচ্ছেলে ভোগাবে দেখছি।"

দুই

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দিন কাটিতে থাকে। একটি সপ্তাহ কাটিল। বিধুবাবু আবার একদা প্রাতে নিখিলবাবুর বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রায় মাস তিনেক পূর্বে বিধুবাবু নগদ দশটি টাকা নিখিলবাবুকে ধার দিয়াছিলেন এবং "কালই সকালে দিয়ে দেব" এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু নিয়তির এমনি পরিহাস যে, আপিসের গণ্যমান্য বড়বাবু নিখিলনাথ মিত্রকে অদ্যাপি অধমর্ণই থাকিতে হইয়াছে—তাহাও সামান্য দশটি টাকার জন্য এবং বিধুচরণ বসুর মত একটা লোফারের নিকট। "হায় রে নিয়তি, তোমাকে গড় করি। নলরাজার মত বিচক্ষণ রাজাকেও তুমি নাকাল করিয়াছিলে, আমি তো সামান্য কেরানী মাত্র"—ইহাই

ছিল নিখিলনাথের সান্ত্বনা। বাল্যকালে নিখিলনাথ মহাভারতের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বিধুচরণ আসিতেই নিখিলনাথ মুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি বিধুচরণের পথ চাহিয়াই উৎকণ্ঠিতভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। বিধুচরণ আসাতে তাঁহার সে দারুণ উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল।

"বাঁচা গেল। আসুন বিধুবাবু, আপনার কথা রোজই ভাবি। আজ আমাদের পাড়ায় গণেশ-অপেরা যাত্রা হবে। আসবেন শুনতে? একজন মনোমত সঙ্গী না পেলে এ সব জিনিস শুনে সুখ নেই। আসুন না।"

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, বিধুচরণের মুখমণ্ডলে এইরূপ একটি আনন্দ-জ্যোতি প্রকাশ পাইল। তিনি উদ্ভাসিতচক্ষু তুলিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশতো। কটার সময়?"

"আটটা—সন্ধ্যে আটটা।"

"আসব শুনতে।"

এমন সময় নিখিলনাথবাবুর ছয় বৎসরের কন্যা মিণ্টু আসিয়া বলিল—"বাবা, মা বললে চিনি ফুরিয়ে গেছে।" বিধুবাবু মিণ্টুকে ধরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এত আলাপ তিনি নিজের মেয়ের সহিতও করেন না।

"বাঃ খুকী, তোমার ফ্রকটি তো বেশ সুন্দর! মাথায় ফিতেও চমৎকার দেখছি তো!"—ইত্যাকার নানারূপ আলোচনায় আরও মিনিট দশেক কাটিল।

বিধুচরণবাবুর এখানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দশটি টাকা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাগাদা করিতে পারিলেন না। নানা ছুতানাতায় কালহরণ করিতে লাগিলেন, যদি নিখিলনাথবাবু কথাটা নিজেই পাড়েন। বিধুচরণবাবুর চক্ষুলজ্জা প্রবল।

নিখিলনাথবাবুর মহাভারতীয় মন। তিনি ও-দিক দিয়াই গেলেন না। এ বৎসর ফতেপুর সিক্রিতে কি ভীষণ শীত পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য গরীব লোকদের কি দারুণ কষ্ট হইতেছে, এই সম্পর্কে তিনি নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল, নিখিলনাথবাবু বলিলেন—"এইবার আপিস যাওয়ার যোগাড় করা যাক।"

বিধুচরণ এইবার মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"বোসজা মহাশয়ের কাছে টাকাটা ফেরত পেয়েছেন নাকি ?"

নিখিলনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—"ঠিক ঠিক, ভুলেই গেছি তো। টাকা আপনার জন্যে রেখেছি আমি।" বলিয়া তিনি পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন।

"আরে গেল যা! চাবিটা ফেললাম কোথা ?" সমস্ত পকেটগুলি খুঁজিলেন। টেবিলের নীচে, আলমারির মাথায় সর্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য, চাবি পাওয়া গেল না। বিধুচরণও খুঁজিলেন এবং শেষটা বলিলেন—"আচ্ছা থাক, ব্যস্ত কি ?"

তিন

সন্ধ্যাবেলা যথাসময়ে আসিয়া বিধুবাবু দেখিলেন, নিখিলনাথ অনুপস্থিত। খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, কোন প্রয়োজনীয় কার্যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন স্থিরতা নাই। বিধুচরণ একাই বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। উত্তরার অভিনয় তাঁহার বেশ ভাল লাগিল। শরীরের সহিত মনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রমাণও মিলিল। উত্তরার দুঃখে তিনি খুব বেশি অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলেন, হৃদয়ের বেদনা গলদেশ আশ্রয় করিয়াছে। ঢোঁক গিলিতে কষ্ট হইতেছে এবং টন্‌সিল দুইটি ফুলিয়াছে। এমন কি টেম্পারেচার লইয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বরও হইয়াছে। সামান্য জ্বর ক্রমশ অসামান্য হইয়া উঠিল। তখন শয্যাগত বিধুচরণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নিখিলনাথের সঙ্গে দেখা না হইলে তিনি কদাপি যাত্রা শুনিতে যাইতেন না, এবং ইহাও সত্য কথা যে মূলে দশটি টাকা না থাকিলে কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না। এইরূপ বিশ্লেষণ করিবার পরে বিধুচরণ বলিতে বাধ্য হইলেন—"ব্যাটা আমাকে ধনে-প্রাণে মারবে দেখছি!"

বিধুচরণ এক সপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিলেন এবং চিকিৎসা বাবদ তাঁহার ১৭৮/১৫ খরচ হইল।

চার

উক্ত ঘটনার পর একটি মাস কাটিয়াছে। কারণ পৃথিবী বাঙালী নহে, নিয়মিতভাবে সে নিজকক্ষে ঘুরিয়া চলিয়াছে, নিয়মিতভাবে দিবা-রাত্রি আসিতেছে এবং যাইতেছে।

সেদিন মাসের ছয় তারিখ। নিখিলনাথ নীচের ঘরটাতে বসিয়া মানসাঙ্ক কষিতেছিলেন। আগামী কল্য তিনি মাহিনা পাইবেন। কাটিয়া-কুটিয়া ৫৫।৶১০। ইহার মধ্যে বাড়িভাড়া দিতে হইবে ১৫৲, মুদীকে দিতে হইবে ২০৲। বাকি থাকে ২০।৵০১০। সাড়ে সাত আনা ছাড়িয়া দিলে—থাকে কুড়ি টাকা। ইহার মধ্যে সমস্ত মাসের তরকারি খরচ, ছেলেমেয়ের স্কুলের মাহিনা, দুধ, কেরোসিন তেল, কাপড়-চোপড়ের বিল। নাঃ, বিধুচরণবাবুকে দশটা টাকা দেওয়া অসম্ভব।

গৃহিণীর হাতে অবশ্য গোটা কয়েক টাকা আছে। বাজার-খরচ প্রভৃতি হইতে এক-আধ পয়সা করিয়া বাঁচাইয়া নিখিল-গৃহিণী গোটা কয়েক টাকা জমাইয়াছেন ঠিকই, কিন্তু ঠিক কয়টা টাকা তাহা নিখিলের সঠিক জানা নাই, তাহা ছাড়া এই কয়টি টাকা হইতে শোভাকে বঞ্চিত করিতে নিখিলনাথের মায়া হয়। কি বলিয়া চাহিবে!

বিধুর কাছে সে টাকাটা লইয়াছিল, রেস খেলিবার জন্য। বলা বাহুল্য, হারিয়াছে। এ কথা অকপটে স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, কোনরূপে ম্যানেজ করিয়া টাকাটা সে বিধুকে দিয়া দিবে। কিন্তু প্রতিমাসেই সে একবার করিয়া মানসাঙ্ক কষিয়া দেখিতেছে, ম্যানেজ করা অসম্ভব। অথচ মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া বিধুকে আর ঠেকাইয়া রাখাও অসম্ভব। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। নিখিলনাথ কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় গলির মোড় হইতে হঠাৎ বিধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—"এই একবার নিখিলবাবুর কাছে যাচ্ছি।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিখিলনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাশেই একটা চোর-কুঠুরি ছিল, তাহাতে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।

পাঁচ

"নিখিলবাবু!"

মিণ্টু আসিয়া কহিল—"বাবা তো এক্ষুনি এখানে ব'সে ছিলেন! বাইরে গেছেন তা হ'লে।"

"আচ্ছা। এলে ব'লো যে, আমি এসেছিলাম।"

"আচ্ছা।"

বিধুবাবু চলিয়া গেলেন। বিধুবাবু চলিয়া যাইতে না যাইতে "বাপ রে বাপ—উঃ উঃ—" করিতে করিতে সবেগে নিখিলনাথ চোর-কুঠুরি হইতে বাহির হইলেন। চোর-কুঠুরির কোণে একটা বোলতার চাক ছিল। কামড়ের চোটে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া নিখিলবাবু গাড়ু হইতে খানিকটা জল লইয়া চোখে মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঁ চোখটা ফুলিয়া চোখ ঢাকিয়া গেল এবং ডান দিকের গালটার স্ফীতি মিণ্টুর হাস্যোদ্রেক করিল। নিখিলনাথ উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক এমনি সময় দুইজন লোক ধরাধরি করিয়া বিধুবাবুকে লইয়া হাজির। কি করিয়া নিখিলনাথের কাছে টাকাটা আদায় করা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমন অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিলেন যে, কলার খোসায় পিছলাইয়া একেবারে সাংঘাতিক রকম পড়িয়া গিয়াছেন। মাথা ফাটিয়াছে, হাতও ভাঙিয়াছে। দুইজন পথিকের সহায়তায় অতিকষ্টে তিনি নিখিলনাথের বাড়ি ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাড়ি অনেক দূর।

নিখিলনাথ উপরে গিয়া বিছানায় শুইয়া ছিলেন। ডাকাডাকিতে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুটি দিয়া দেখিলেন, বিধুচরণ আবার ফিরিয়াছে।

উভয়ে উভয়কে দেখিয়া যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন—"বাঁচান আমাকে।"

আরও তিনমাস কাটিয়াছে।

নিখিলনাথ এখনও টাকা দেন নাই।

বিধুচরণ এখনও ঘোরাফেরা করিতেছেন।

শেষরক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক অম্বুজাক্ষ ভৌমিক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। বর্তমান বাজারে লেখক মাত্রেই একটু বিপন্ন। ভাল লেখার সমঝদার নাই, ভাল লেখার বাজারদর কম এবং ভাল লেখাকে ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য একদল সমালোচক সর্বদাই সশস্ত্র হইয়া আছেন। ভৌমিক মহাশয়ের বর্তমান চিন্তার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি গত পরশ্ব হইতে একটি গল্প শুরু করিয়াছেন—খুব মনোরমভাবেই শুরু করিয়াছেন—(লিখিতে লিখিতে নিজেরই তাঁহার বার কয়েক রোমাঞ্চ হইয়াছে)—কিন্তু কি করিয়া এই বিস্ময়কর উপাখ্যানটি তিনি শেষ করিবেন, তাহা তাঁহার মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। গল্পের শেষ রক্ষা করা সত্যই একটি দুরূহ সমস্যা—গল্পলেখক মাত্রেরই তাহা জানা আছে। শেষ-বরাবর আসিয়া ভৌমিক মহাশয় লেখনী সম্বরণ করিয়া বসিয়া আছেন। সকাল হইতে চার পেয়ালা কড়া চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হইয়া গিয়াছে; গল্প কিন্তু শেষ হইতে চাহে না।

ভৌমিক মহাশয় বসিয়া আছেন—নির্জন ত্রিতলের ঘরটিতে। ঘরের কপাটটি খোলা। মুক্ত দ্বারপথ দিয়া কিঞ্চিৎ বাতাস, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, ছেলেমেয়েদের হুড়াহুড়ির শব্দ এবং দুইটি বায়সের চিৎকারধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না; কিন্তু উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যেন গল্পের প্লটটিকে গলাধাক্কা দিয়া মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে—ভৌমিক মহাশয়ের এইরূপ মনে হইল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্বারদেশ অর্গলবদ্ধ করিলেন এবং একটি ভীমকান্তি সিগার ধরাইয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। জানুযুগল পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু গল্পের কোন সুরাহা হইল না. ভৌমিক মহাশয় তখন ক্লান্ত হাঁটুকে আর না ঘাঁটাইয়া দক্ষিণ কর্ণটি লইয়া পড়িলেন। একটি দিয়াশলাইকাঠি সন্তর্পণে তিনি দক্ষিণ কর্ণবিবরে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ও গণ্ডদেশ কুঞ্চিত করিলেন। গল্পের শেষটা আজ লিখিয়া দিতেই হইবে—কারণ গল্প দেওয়ার আজই শেষদিন। আজ গল্পটি দিতে না পারিলে 'চমৎকারিণী' নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থান এ মাসে অন্তত হইবে না। এ মাসে

না হইলে পঁচিশটি টাকা তো মারা যাইবেই, উপরন্তু তিনি গৃহিণী এবং সম্পাদক উভয়েরই নিকট খেলো হইয়া যাইবেন।

সম্পাদককে কথা দিয়াছেন যে, একটি বৃহৎ চমকপ্রদ গল্প তিনি পঁচিশ টাকা পাইলে লিখিয়া দিবেন এবং তৎপূর্বে তিনি গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা দিয়া একখানি মুগার শাড়ি খরিদ করিয়া দিবেনই দিবেন। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বইকি!

গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই তিনি 'চমৎকারিণী' পত্রিকায় আদৌ লিখিতে রাজী হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি ওরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কাগজে উত্তেজক গল্প লিখিতে রাজী হইতেন কি? অম্বুজাক্ষ ভৌমিক একজন নামজাদা রক্ষণশীল লেখক। চিরকাল তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি গল্পে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাইয়া আসিয়াছেন। এবং এই ধরনের গল্প ভৌমিক মহাশয়ের হাতে খোলেও ভাল। তাঁহার লিখিত 'হিন্দু-বৈজয়ন্তী' গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপদেশ গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশ করিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার 'বঙ্গ বিষাণ' নামক গ্রন্থটি প্রত্যেক যুবক-যুবতী, শুধু যুবক যুবতী কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। এ হেন ভৌমিক মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায় উপনীত হইয়া কেবল গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থেই এক ছ্যাবলা কাগজের সম্পাদকের ফরমাশ অনুযায়ী এই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। নীতিমূলক তাঁহার একটি সুন্দর গল্প ছিল। কেমন করিয়া বিলাসপুরের ধর্মাত্মা জমিদার একটি অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত সর্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন, কেমন করিয়া দুরাত্মা ধনী মাধবলাল বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেমন করিয়া আবার সেই সর্বস্বান্ত জমিদার কেবলমাত্র পুণ্যফলে এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় হস্তচ্যুত জমিদারি পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন—এই সমস্তই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁহার "সতীর আশীর্বাদ" নামক গল্পটিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 'চমৎকারিণী'র সম্পাদক মহাশয় মাইনাস্ থ্রী চশমা পরিধান করিয়া সম্ভবত কণ্টিনেণ্টাল ভাব-রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ান, তিনি উক্ত গল্পটি পছন্দ করেন নাই। কি ধরনের গল্প হইলে তাঁহার পছন্দ হইতে পারে তাহারও আভাস দিয়াছেন। তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে "যা থাকে কপালে" বলিয়া পরশু দিন হইতে ভৌমিক

মহাশয় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বদ্ধপরিকর হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শেষ পর্যন্ত কানে দিয়াশলাই-কাঠিও ঢুকাইতে হইয়াছে।

দুই

"উঃ" বলিয়া কাঠিটি ভৌমিক মহাশয় কান হইতে বাহির করিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন, খোলার বাড়ির চালে বসিয়া একটি বীর হনুমান দাঁত খিঁচাইতেছে এবং একটি বৃদ্ধা তদ্দর্শনে নিজের বড়িগুলি সামলাইতেছেন। ভৌমিক মহাশয় যে গল্প ফাঁদিয়াছেন, এই সব অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য তাহাতে কাজে লাগিবে না ভাবিয়া তিনি চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইলেন। অন্য দিকে মানে ঘরের দেওয়ালের দিকে। কিন্তু ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়াটে গৃহের দেওয়ালেও এমন কোন কিছু ছিল না, যাহা তাঁহার "প্রেমের জন্য" নামক গল্পের শেষ রক্ষা করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া ভৌমিক চক্ষু মুদিয়া চুরুটে একটি টান দিলেন। টান দিয়াই বুঝিলেন, চক্ষু খুলিতে হইবে। চুরুট নিবিয়াছে, ধরানো দরকার। নিপুণভাবে চুরুটটি তিনি ধরাইলেন। ধরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ অবস্থায় কি করা উচিত! নায়ক নায়িকার বাড়ির পাঁচিল ডিঙাইয়াছে। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রি। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নায়ক গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া একটি পেয়ারাগাছের তলায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সম্মুখে একটি গরু থাকাতে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার সাহস হইতেছে না।

ভৌমিক মহাশয় এই পর্যন্ত অবলীলাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর আর কি লিখিলে আর্ট বজায় থাকিবে, নায়ক আর কোন্ কোন্ দুরূহ প্রক্রিয়া করিলে তাহা সম্পাদকের মনোহরণ করিতে পারিবে, তাহা ভৌমিক মহাশয়ের মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। তিনি চিরকাল পুণ্যের জয় ও পাপের পতন চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন—এই অশ্লীলমনা নায়ককে লইয়া এখন কি করা কর্তব্য তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে 'বেল্লিক'কে চাবকাইয়া উহার পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলি। কিন্তু তাহাতে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইবে এবং আর্ট ক্ষুণ্ণ হইলেই পঁচিশটি টাকা!

উঃ, ভগবান, এ কি সমস্যা! তখন তিনি প্রাণপণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর, এ উভয়-সঙ্কট হইতে আমাকে বাঁচাও। পাপের চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না; অথচ গৃহিণীকেও চটাইতে পারিব না। দয়াময়, দয়া কর।"

ভগবান যেন স্বকর্ণে শুনিলেন।

দুই মিনিটে সব ঠিক হইয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া যাইবার পর সূক্ষ্মকলেবর ভৌমিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার গৃহিণীর আর মুগার শাড়ির দরকার নাই।

কারণ তিনি বিধবা হইয়াছেন।

যুগল স্বপ্ন

সুধীর আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা ফুলসুদ্ধ রজনীগন্ধার ডাঁটা। চোখে মুখে হাসি। তাহার সমস্ত মন যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে।

সুধীর আসিয়াই বলিল—"হাসি, আজ একটা ভারি সুখবর আছে। কি দেবে বল। তা না হ'লে বলব না।"

হাসি বলিল—"বলুন না কি?"

"কি দেবে বল আমাকে?"

"কি আর দিতে পারি আমি? আচ্ছা, আপনার রুমালে একটা বেশ সুন্দর এমব্রয়ডারি ক'রে দেব। চমৎকার প্যাটার্ন পেয়েছি একটা।"

"না, ওতে আমি রাজী নই।"

"তবে কি চাই আপনার? চকোলেট আছে দিতে পারি।"

"আমি কি কচি খোকা নাকি, চকোলেটে তুষ্ট হব?"

হাসি হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"তা হ'লে শুনতে চাই না, যান। এমব্রয়ডারি ক'রে দেব বললাম, চকোলেট দিতে চাইলাম, তাতে যখন আপনার—"

সুধীর বলিল—"চললাম তা হ'লে।"

হাসি আবার ডাকিল—"বলবেন না কিছুতে?"

"একটি জিনিস পেলে বলতে পারি। সেই যে, সেদিন যা চেয়েছিলাম।"—বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসির পানে চাহিয়া হাসিল।

হাসি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সামলাইয়া লইল। বলিল—"আপনাকে বলেছি, তা হয় না।"

কিন্তু সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল। সে শুনিল, সুধীর বলিতেছে—"মনে করেছিলাম খবরটা খুব লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু পারলাম না। মাপ ক'রো আমায়। শুনে এলাম তোমার বিয়ে সাঁতরাগাছিতে সেই পাত্রটির সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে।"

বলিয়া স্বধীর চলিয়া গেল।

হাসি ডাকিল—"স্বধীরদা শুনে যান।"

স্বধীর ফিরিয়া আসে নাই।

দুই

অলকা আসিয়াছে।

সেই অলকা, যাহাকে একবার দেখিবার জন্য অজয় সমস্ত দিন অপেক্ষা করিত—কখন সন্ধ্যাবেলায় সে আসিবে!

অলকা আসিয়া বলিতেছে—"আচ্ছা অজয়দা, ইংরিজীতে 'পেট' ব'লে কোন কথা আছে নাকি?"

অজয় বলিল—হ্যাঁ আছে, 'পেট' মানে মাথা।"

"সত্যি?"

"অভিধান খুলে দেখ। পেট মানে মাথা।"

"আমাদের বরুণাদি তা হ'লে ঠিক বলেছেন তো!"

অজয় বলিল—"আচ্ছা, মুণ্ডুর ইংরিজী কি বল তো?"

অলকা মিটিমিটি তাকাইয়া বলিল—"হেড।"

"হেড মানে তো মাথা।"

"মুণ্ডু মানেও তো মাথা।"

অজয় হাসিয়া বলিল—"এই বুঝি তোমার বাংলা ভাষার জ্ঞান! মাথা আর মুণ্ডু বুঝি একই বস্তু!"

অলকা হাসিয়া বলিল—"তফাত কি?"

অজয় গম্ভীরভাবে বলিল—"তোমার সঙ্গে আর ওই পাঁচী ধোপানীটার সঙ্গে কোন তফাত নেই তা হ'লে বল। দুজনেই তো মেয়েমানুষ!"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল—"পাঁচী ধোপানীটি কে?"

"ওই যে তোমাদের গলিটার মোড়ে একজন ধোপার মেয়ে আছে। কম বয়স—তোমার বয়সী হবে।"

অলকা বক্র হাসি হাসিয়া কহিল—"আজকাল অজয়দা দেখছি সমস্ত জিনিসই

বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে আরম্ভ করেছেন! ধোপানী পর্যন্ত বাদ পড়ে না!"

অজয় বলিল—"নিশ্চয়। নিজের জিনিসটি যে ভাল সেটা যাচাই ক'রে দেখে নিতে হবে না?"

"কে আপনার নিজের জিনিস?"

"আছে একজন।"

অলকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পাশের টেবিলটা গুছাইতে লাগিল।

অজয় জানালা দিয়া অকারণে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুইটি স্বপ্ন দুইজনে দেখিতেছে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দুইজন পাশাপাশি শুইয়া আছে।

হাসির হাতখানা অজয়ের বুকের উপর।

হাসি ও অজয়—স্বামী-স্ত্রী।

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের, অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়, তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোরবাবু উকিল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরিব প্রজার সর্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল; আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন বিধবার সম্পত্তিঘটিত একটা মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে, সেজন্য তিনি একটু উদ্বিগ্ন অন্যমনস্ক আছেন।

এমন সময় আর একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন—"আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি ফী নিয়ে থাকি তা জানেন তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কত দিতে হবে আপনাকে?"

"বত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা, বেশ।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন—"আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁর একমাত্র ছেলের

বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে, ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?"

"হ্যাঁ, ছেলের কোনও রোগ নেই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান?" বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জানতে আসা যে, যদি বংশ লোপই পায়, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?"

নস্যের টিপটা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন—"ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা তো নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাকিলেও সব সময় কি সব জিনিস করা সম্ভব?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—"সেন্টিমেণ্ট অনুসারে চললে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই? ওই সব বাজে সেন্টিমেণ্ট নিয়েই তো আমরা ডুবতে বসেছি।"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেণ্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা যোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন—"ধরুন, যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তা হলে সম্পত্তি কারা পাবে?"

আইন-অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না—"ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার তো শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বললাম—আপনার সেন্টিমেণ্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন—"না না, কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি ব'লেই তো আপনার কাছে আসা।"

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ি আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া-চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া-চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা—"সরোজিনী দেবী"।

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া, তরুণীটির ব্যবহারে সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরের বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু কোথায়?"

"কাছারিতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক হইয়া গেলেন—এ কি সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে?"

"ও-বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না।"

"কেন? ব্যাপার কি?"

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না, মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমিও তো মত দিয়েছ!"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে?"

বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?"

"হ্যা, তাঁদেরও মত যে, ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো ?"

"হ্যা, ছেলের কোনও রোগ নেই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান ?" বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জানতে আসা যে, যদি বংশ লোপই পায়, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে ?"

নস্যের টিপটা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন—"ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা তো নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাকিলেও সব সময় কি সব জিনিস করা সম্ভব ?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—"সেন্টিমেণ্ট অনুসারে চললে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই ? ওই সব বাজে সেন্টিমেণ্ট নিয়েই তো আমরা ডুবতে বসেছি।"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেণ্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা যোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন—"ধরুন, যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তা হলে সম্পত্তি কারা পাবে ?"

আইন-অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না—"ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি ? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার তো শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বললাম—আপনার সেন্টিমেণ্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন—"না না, কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি ব'লেই তো আপনার কাছে আসা।"

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ি আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া-চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া-চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা—"সরোজিনী দেবী"।

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া, তরুণীটির ব্যবহারে সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরের বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু কোথায়?"

"কাছারিতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক হইয়া গেলেন—এ কি সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে?"

"ও-বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না।"

"কেন? ব্যাপার কি?"

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না, মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমিও তো মত দিয়েছ!"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে?"

চট্ করিয়া কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুত স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে কোন-কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয় বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি,—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ, প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়।

স্থতরাং নারী-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে বেকুবের মত ফস্ করিয়া কিছু-একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্তত করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই স্থলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং স্থলেখাকে যত দূর জানি, তাহাতে তাহাদের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অরুণদার কথা ছাড়িয়া দিলে স্থলেখার ক্রন্দনের আর একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে স্থলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস দুই পূর্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি স্থলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। শিশুটির মৃত্যুর পর স্থলেখার দুই দিন 'ফিট্' হয়—ইহা তো আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমলহৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে।

কিন্তু হ্যাঁ, আর একটা কারণও তো হইতে পারে। পুত্রশোক-প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন; কিন্তু স্থলেখার ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বিগত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা-হাউসে দেখানো হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নর-নারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া

প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভাল লাগে, প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাতে রাগ হয়। আশ্চর্য লোক এই বিপিন! কিছুক্ষণ আগেই সিনেমার "লাস্ট শো" হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল। হয়তো তাহাতেই সুলেখার সিনেমা-শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়? সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য "সীট বুক" করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে। তরুণী পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক না বিপিন লোমশ, সে মানুষ তো! তাহা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকরা —অনেক কথাই বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমা-ঘটিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক, যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমন কি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড় পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণতঃ যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে—অর্থাৎ চিৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণতঃ যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন, সুলেখা সম্ভবত তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে।

কারণ যাহাই হউক, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ। রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ,—অর্থাৎ করুণতর। কোন সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং জ্যোৎস্না যতই আকাশপ্লাবিনী হউক না কেন, এ বিষয়ে খুব সম্ভবত আমরা একমত যে, এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ী কাঁদিলে আমরা এতটা আর্দ্র হইতাম না, উপরন্তু হয়তো বিরক্তই হইতাম।

স্থলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে এবং এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্থলেখার ক্রন্দনের কারণ না নির্ণয় করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। এমন কি অরুণদাকে জড়াইয়া একটা সস্তা-গোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, "কেন নয়? এমন চাঁদিনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাকি? ওই তো দূরে 'চোখ গেল' পাখি অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে! সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধা স্বপ্ন-বিহ্বল! চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার পাথার! এমন দুর্লভক্ষণে অরুণদার কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব, না, অপরাধ?" মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ব্যস্ত-সমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবত। কিন্তু এ কি!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?"

"না, বড্ড কন্‌কন্ করছে।"

"এই পুরিয়াটা খাও তা হলে। ডাক্তারবাবু কাল সকালে আসবেন বললেন, কেঁদে আর কি হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও, লক্ষ্মীটি!"

জ্যোৎস্নার টুকরাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

দেখিলেন তো? বলিয়াছিলাম, সবই সম্ভব!

বুধ্‌নী

জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—এ কথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পূরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জলভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু সে শিখা নিবিবে। একটি সবল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে। কাল তাহার ফাঁসি।

সে দোষী কি নির্দোষ সে আলোচনা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হয়তো তাহাকে লইয়া মাথাই ঘামাইতাম না, যদি সেদিন জেলখানায় বেড়াইতে গিয়া তাহার আর্ত-করুণ চিৎকার না শুনিতাম!

"বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী!" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।

দুই

হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। এই পার্বত্য পল্লীতেই একদা বন্দুকধারী বিল্টু শিকার সন্ধান করিতে করিতে বুধ্‌নীর দেখা পায় এক মহুয়া গাছের তলায়। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নী। সভ্য কোন যুবক আলো-ছায়া-খচিত মহুয়াতরুতলে কোন কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্যভরে চলিয়া যাইত, বিল্টু তাহা করে নাই। বন্য পশুর মত সে তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্‌নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু বিল্টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।

তিন

তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে

প্রভাতে বিস্তীর্ণ মাঠে ইহাদের সভা বসিত। সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত। একটা পাত্রে খানিকটা সিঁদুর গোলা থাকিত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদুর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদুর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়। সেই কুমারীর আত্মীয়স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ সড়কি বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে এবং যুবা যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে, মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্যাস্তের পর আত্মীয়স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল বাঁশী বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিল্‌টু বুধ্‌নীকে জয় করিয়াছিল। এই তো সেদিনের কথা—এখনও দুই বৎসর পূরা হয় নাই।

চার

অসভ্য বিল্‌টু জংলী বুধ্‌নীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্যলোক, বর্বর বন্য-দম্পতির আদবকায়দা আমার জানা নাই। যাহারা গুহানিবাসী সুপ্ত শার্দূলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে উঠে নামে, পূর্ণিমা-নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।

শুধু এইটুকু জানি, বিবাহের পর বিল্‌টু বুধনীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই—একদণ্ডও নয়। বনে জঙ্গলে পর্বতে গুহায় এই বর্বর দম্পতি অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশফুল, বিল্‌টুর হাতে বাঁশের বাঁশী—এই সম্বল।

পাঁচ

সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু। বুধ্‌নীর

সে কি আনন্দ! বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিল্টু দেখিল—এ কি! বুধ্নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা! বুধ্নী তো তাহার আর একার নাই! অসহ্য।

ছয়

বিল্টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করিয়া গেল—বুধ্নী—বুধ্নী—বুধ্নী—বুধ্নী! ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।

নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল— এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুনি-সম্পর্ক-বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত, মুখটি একটু লম্বা-গোছের, নাকটি থ্যাবড়া, চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব, গোঁফদাড়ি কামানো, গলায় কণ্ঠী, কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কম্‌বাইন্‌ড্ হ্যাণ্ড' চাকর নরেশের জন্য ফাউল কাটলেট বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন, মোটেই তা নয়। ইঁহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম. এ. পাস—নরেশ কেমিষ্ট্রীতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রোফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়িতে ইঁহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। এত বড় যে ইহাতে দুই-তিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই পরিবারহীন। নরেশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু

বিবাহের কিছুদিন পরেই পত্নী ইহলোক ত্যাগ করাতে তাঁহার এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন, 'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন, নির্মলা সত্যই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এই মাত্র।

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির, এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্বেও একই বাড়িতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পন্টুকে উভয়ে ভালবাসিতেন। পন্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই— "আমরা চললাম। পন্টুকে তোমরা দেখো।" পন্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবা-মাত্রই পরেশ বলিলেন—"বাকী অর্ধেকটা তা হ'লে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক।" তাহাই হইল। পন্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পন্টুর আর ভাবনা কি?

পন্টু, নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ এবং পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পন্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পন্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত, তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন

না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে, বড় হইয়া পণ্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পণ্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য, ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ, আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পণ্টুকে ভালবাসিতেন। এ বিষয়ে উভয়ের কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পণ্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ, তিনি স্বভাবতঃই একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই; কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—"আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হ'ত?"

"বেশ, দেখাও।"

কবিরাজ আসিলেন, সাত দিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল। পণ্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা, একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্ঠিটা দেখালে কেমন হয়? কি বল?"

"বেশ তো! তবে যাই কর, এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড।"

"তাই নাকি?"

পণ্টুর কোষ্ঠি লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—"মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।" কি করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পণ্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—"কবিরাজী ওষুধেতে বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব নাকি?"

"তাই ডাক না হয়।"

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পণ্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পণ্টু প্রলাপ বকিতেছে—"মা, আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়?"

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক।

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—"আমি একবার তারকেশ্বর চললাম, ফিরতে দু-এক দিন দেরি হবে।"

"হঠাৎ তারকেশ্বর কেন?"

"বাবার কাছে ধর্না দেব।"

নরেশ কিছু বলিলেন না। ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।"

ডাক্তারী চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি মাটির ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—"বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বললেন যে, রোগীকে যেন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার ক'রে খাইয়ে দিতে, তা হ'লেই সেরে যাবে।"

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড-রোগীকে ফুল-বেলপাতা-পচা জল কিছুতেই খাওয়ানো চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পণ্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইন্‌জেক্‌শন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পণ্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েক দিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন।

"ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পণ্টু কেমন যেন করছে!"

"অ্যাঁ, বল কি?"

পণ্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হাঁ, হাঁ, আমার আর ইন্‌জেক্‌শন

দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পল্টু, খাও, খাও তো বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল।

রূপকথা

সুন্দর জ্যোৎস্না!

চারিদিকে জনমানবের সাড়া নাই। গভীর রাত্রি। দূর হইতে নদীর কলকল-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। স্বপ্ন-বিহ্বল নেত্রে দেখিতেছি, জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। কুৎসিত জিনিসও সুন্দর হইয়া উঠিল। ওই পচা-ডোবাটাও যেন জরিদার কাপড় পরিয়া মোহিনী সাজে সাজিয়াছে। আকাশের কালো মেঘটাতেও রূপালি আবেশ।

নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। তাহারই প্রতীক্ষায়। তাহারই প্রতীক্ষায় এই গভীর রাত্রির সমস্ত জ্যোৎস্নাও যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আসিতেছে।—হাঁ, ওই যে! সর্বাঙ্গে তাহার জ্যোৎস্নার আকুলতা। তাহার নূপুরশিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিতেছে।…ওই সে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

সহসা একটা দুর্ধর্ষ দস্যু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই কিশোরীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। জ্যোৎস্নায় শাণিত ছোরাটা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল! রক্তের ধারায় জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিলাম। ধরিয়া দেখি—এ কি, এ যে আমারই বিবেক!

ঐরাবত

ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয়, বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক—প্রচণ্ড সংযম—অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিতেন—তিনবার দন্তধাবন করিতেন—দুই বেলা স্নান করিতেন। পালোয়ানের মত স্বাস্থ্য। লেখাপড়াও জানিতেন—শোনা যায় তিনি বি. এ. পাস। দরিদ্র নন—খাইবার পরিবার সঙ্গতি আছে, চাকুরি করিতে হয় না। পৈতৃক জমিজমা যাহা আছে, তাহাতেই চলিয়া যায়। হাতে দু'পয়সা আছে। কিন্তু ত্রিগুণাবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁহার মৌলিকতা। এবং তাঁহার মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণ প্রণালী সংক্ষেপত এই। তিনি উঠিতেন খুব ভোরে। উঠিয়াই কার্বলিক লোশনে ভিজানো নিমের দাঁতন লইয়া দন্ত-পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর করিতেন ব্যায়াম। মুদ্গর, ডাম্বেল, ডেভালাপার। অর্ধঘণ্টা কাল ব্যায়াম করিয়া তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে নিকটবর্তী নদীটিতে গিয়া অবগাহন স্নান করিতেন।

স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি বাড়ি ফিরিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, প্রাতঃকালে অবগাহন তাঁহার করা চাইই। বাড়ি ফিরিয়া তিনি স্টোভ জ্বালিতেন।

আপনারা হয়তো ভাবিতেছেন, চা খাইবার জন্য।

মোটেই তা নয়। কোনরূপ মাদকদ্রব্যের বশীভূত তিনি ছিলেন না। স্টোভ জ্বালিয়া তিনি ভাতে-ভাত চড়াইয়া দিতেন। স্টোভের নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহ্নিকটাও শেষ করিয়া লইতে হইত। প্রাণায়ামও করিতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই ত্রিগুণাবাবুর আহ্নিক, স্নান, আহার সমস্তই সমাধা হইয়া যাইত। কম্প্লিট্।

তিনি বলিতেন—যখন খাইতেই হইবে, অনাহারে থাকা যখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তখন ও বখেড়া সকাল সকাল চুকাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সমস্ত দিন সময় পাওয়া যায় কত!

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি একজোড়া মিলিটারী বুট পরিধান করিতেন। মিলিটারী বুট পরিলে আরও যে-সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ পরিধান করা সাধারণ

লোকে সঙ্গত মনে করেন, ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি বুটজুতা পরিতেন কেবল বখেড়া মিটাইয়া রাখিবার জন্য। একবার সকালে উঠিয়া বাগাইয়া পরিয়া ফেলিতে পারিলে—ব্যস, নিশ্চিন্ত।

অন্য জুতা পরিলে বার বার খোল আর পর—খোল আর পর। সময় নষ্ট হয় কত!

তাহার পর তসরের কাপড়টি মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন। তসরের কাপড়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল—ওই একই কারণে। একবার কিনিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

আরও দুইটি জিনিস তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

একটি মোটা বাঁশের লাঠি। যেমন-তেমন লাঠি নয়। বেশ শক্ত তৈলপক্ক গাঁটে-গাঁটে লোহার তার জড়ানো সমর্থ একখানি লাঠি। আর থাকিত চামড়ার একটি বড় ব্যাগ—পোস্টাফিসের পিওনরা সাধারণতঃ যে-জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়—সেই জাতীয় একটি ব্যাগ। ব্যাগটি তিনিও কাঁধে ঝুলাইয়া লইতেন। ব্যাগটিতে তাঁহার টুকিটাকি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত। যথা—কপিং পেন্সিল, একটি বাঁধানো নোটবুক, শুক্নো খেজুর, টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মাথায় তাঁহার একটি টোকা থাকিত, যে টোকা পরিয়া কৃষকগণ মাঠে চাষ করিয়া থাকে। রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণকল্পে বেশ মজবুত-গোছের একটি টোকা ত্রিগুণাবাবু কৃষকদের দ্বারাই প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। ছাতার বখেড়া মিটিয়া গিয়াছিল। সর্ববিষয়ে গোড়া বাঁধিয়া এবং বখেড়া মিটাইয়া কাজ করাই ত্রিগুণাবাবুর বিশেষত্ব। দাড়ি-গোঁফ সম্বন্ধেও তিনি বখেড়া মিটাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা মনের আনন্দে বাড়িয়া—তাঁহার মুখ তো বটেই—বুক পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিগুণাবাবু জামা পরিতেন না।

প্রশ্ন করিলে গোছা গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভ্রূর অন্ধকারে অবস্থিত তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিত। বলিতেন—"গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা একটা বখেড়া নয় কি?"

সকলেই স্বীকার করিত—বখেড়া।

বাঁশের লাঠিটি ভীষণদর্শন।

ত্রিগুণাবাবুও রাগী লোক।

সুতরাং বখেড়া বাড়াইয়া লাভ কি!

কিন্তু যখন মিলিটারী বুট পায়ে, মালকোঁচা-মারা, উপবীতধারী, নগ্নগাত্র, বলিষ্ঠ, বখেড়া-বিরোধী ত্রিগুণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ এবং মস্তকে টোকা পরিয়া পথে বাহির হইতেন, তখন তাহা সত্যই একটি দেখিবার মত দৃশ্য হইয়া উঠিত।

অনেকে হাসিত—

অনেকে ঠাট্টা করিত—

অনেকে প্রণামও করিত।

ত্রিগুণাবাবু অবশ্য এসব গ্রাহের মধ্যেই আনিতেন না। প্রাকৃতজনের স্তুতিনিন্দা তাঁহার নিকট চিরকাল উপেক্ষার বস্তু ছিল।

স্ত্রী? তিনি বহুপূর্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাবাবুর দুইটি পুত্র অবশ্য আছে। তাহারা মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছে। তাহাদের নামকরণ ব্যাপারেও ত্রিগুণাবাবুর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একজনের নাম রাখিয়াছিলেন রায় বাহাদুর—আর একজনের রায় সাহেব। বলিয়াছিলেন—"রায় বাহাদুর আর রায় সাহেব হবার জন্যে পরে হয়তো ব্যাটারা প্রাণপাত করবে। আগে থাকতে বখেড়া মিটিয়ে রাখাই ভাল।"

দুই

অতি প্রত্যুষে আহারাদি শেষ করিয়া ত্রিগুণাবাবু চার ক্রোশ দূরবর্তী কিষণপুর গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতায় আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে। গোড়া বাঁধিয়া কাজ করাই তাঁহার নিয়ম।

সুতরাং তিনি অল্পবয়স্কদের, বিশেষ করিয়া বালকদের, লইয়া পড়িয়াছিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন—ইহার জন্য তাঁহাকে চার ক্রোশ দূর যাইতে হয় কেন? নিজের গ্রামে কি বালক ছিল না?

ছিল।

কিন্তু কেহ তাঁহাকে আমল দিত না।

গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায় না—এ কথা সুবিদিত।

চার ক্রোশ দূরে ত্রিগুণাবাবুর কয়েক বিঘা জমি প্রজাবিলি করা ছিল। প্রজাদের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল।

সুতরাং তাহাদের পুত্রদের তিনি অনায়াসে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বালকেরা সকাল হইতে নয়টা পর্যন্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্যবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া তাহার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে মামুলি লেখাপড়া শিখিতে যাইত।

একটি সুবিশাল বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াই ত্রিগুণাবাবু তাঁহার উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন।

একদিন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে বখেড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিগুণাবাবু বখেড়া-বিরোধী।

সুতরাং তিনি বখেড়া মিটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ওই বটবৃক্ষতলেই একটা পাকা ঘর তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

তিন

কিন্তু অকস্মাৎ নূতন একটা বখেড়া বাধিয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়া দেখেন, ব্রহ্মচর্যলোলুপ তাঁহার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।

ত্রিগুণাবাবু আসিতেই ত্রস্ত হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিল। মাসিক-পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তুলিয়া তিনি দেখিলেন।

দেখিবামাত্রই চক্ষু-স্থির।

প্রথমেই মলাটের উপর ঢেউ-খেলানো রঙীন অক্ষরে লেখা—'মরমী'। তাহার পর পাতা উল্টাইতেই একটি নগ্ন নারীমূর্তি।

তাহার পরই একটি কবিতা।

কবিতার ছন্দ বোঝা যায় না—

অর্থ কিন্তু পরিষ্কার।

পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাহার পরই একটি গল্প—

একটি রোগা-গোছের ছোকরা একসঙ্গে চারিটি তরুণীর মোহড়া লইতেছে। এ তো ভয়ানক কাণ্ড!

পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া ত্রিগুণাবাবু দেখিলেন—সব সরিয়া পড়িয়াছে।

একটি ছাত্রও নাই।

চার

সেই দিনই ত্রিগুণাবাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ঠিক ইহার দুই দিন পরে যে সংবাদটি চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। তাহা এই—

'মরমী' কাগজের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

চিত্রকর নিধিরাম বসাকও অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাঁহার মস্তকের আঘাতও সাংঘাতিক।

গল্পলেখক সুজিৎ সেনের দক্ষিণ হস্তটি শোচনীয়ভাবে জখম হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাঁহার জীবনসংশয়।

কবি অমিয় পালিত মারা গিয়াছেন।

একজন ভীষণদর্শন লোক অকস্মাৎ 'মরমী'-অফিসে ঢুকিয়া বিনা কারণে উক্ত মনস্বী-চতুষ্টয়কে আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং একটি বাঁশের লাঠির দ্বারা তাঁহাদের গুরুতররূপে প্রহার করিতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়া সত্ত্বেও

কিন্তু কেহ গুণ্ডাটাকে ধরিতে পারে নাই। সে সকলের হাত ছিনাইয়া ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

বুঝিলাম, আর কেহ নয়—ত্রিগুণাবাবুই।

বখেড়া মিটাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

পাঁচ

ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ।

কোন সঠিক খবর তাঁহার কেহ পাইতেছে না।

নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি টেররিস্ট দল গড়িয়া তুলিতেছেন।

কাহারও মতে তিনি ভারতবর্ষেই নাই—খালাসীর বেশে জাহাজে চাপিয়া রাশিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আর একদল দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল—ওসব বাজে কথা—তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদলভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ নানা কথা।

লোকে কিন্তু এক কথা বেশীদিন বলিতে চাহে না।

তাহারা ক্রমশ ত্রিগুণানন্দের কথা ছাড়িয়া অন্য কথায় মাতিল।

ত্রিগুণানন্দ-গুজব-ভারাক্রান্ত দিবসগুলি ক্রমে ক্রমে কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকে ক্রমশ ত্রিগুণাবাবুর কথা ভুলিতে লাগিল। এমন কি পুলিসও।

ছয়

আমারও মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একখানি চিঠি আসিয়া হাজির।

ত্রিগুণাবাবুরই চিঠি।

লিখিয়াছেন—

ভায়া,

অনেকদিন পরে আমার চিঠি পাইয়া সম্ভবত বিস্মিত হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই—এতদিন আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় যে কাণ্ড করিয়াছিলাম, খবরের কাগজের মারফত আশা করি তাহা অবগত আছ। পরে বুঝিয়াছিলাম, কাণ্ডটি করিয়া ভুল করিয়াছি। বখেড়া অত সহজে মিটিবার নয়। আমি যে ভাবে উহা মিটাইতে চাহিয়াছিলাম সে ভাবে মিটাইতে হইলে কলিকাতা সুদ্ধ সবাইকে খুন করিতে হয়। কলিকাতা শহরে যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রয় হয় সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। সমস্ত স্টলগুলি পরিদর্শন করিয়া, সিনেমা দেখিয়া এবং আধুনিক যুবক-যুবতীদের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল—রক্তারক্তির রাস্তা ধরিলে সকলকেই সাবাড় করিতে হয়, কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ঠগ বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা উজাড় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং ও-পথ আমার পক্ষে অপ্রশস্ত। পুলিসের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকি—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি এবং চিন্তা করি, কি উপায়ে বখেড়া মিটানো যায়। ইহাই যদি দেশের প্রগতি হয় তাহা হইলে সে প্রগতির শেষ ফল দেখিবার জন্য শেষ পর্যন্ত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে কি? থাকিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ অবস্থায় কোন্ পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত তাহাই একদা রাত্রে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় মনে হইল মানস-পটে সিনেমা-দৃষ্ট এক নায়িকার মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। মুখখানি যেন আমার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলা বাহুল্য, একটু বিব্রত হইলাম।

কিন্তু যাক, ঈশ্বরেচ্ছায় কিছুক্ষণ পরে মুখ মন হইতে সরিয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুমাইবার পরই বোঝা গেল বখেড়া মেটে নাই—কারণ সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে কি ঘটিল লিখিতে পারিব না। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখ, তাহা অবর্ণনীয়।

ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখিলাম, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে

এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরে মাথা কুটিতেছে। স্বপ্নের ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া রহিলাম। কিন্তু দেখিলাম, জাগিয়াও নিস্তার নাই—মুখ ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

এইরূপ প্রত্যহ। কোনদিন সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তরুণী—একটা-না-একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।

বলিব কি ভায়া, শেষটা উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম।

ভয়ও হইল। চিন্তা করিতে লাগিলাম—এ অবস্থার প্রতিকার কি? মাঝে মাঝে রাগও হইত ;—কিন্তু স্বপ্নের মাথায় তো লাঠি মারা যায় না। ঘোর জালে পড়িয়া গেলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—কথাটা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলাম।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমশ এই সত্যই আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, আমার মনের কামনা মরে নাই। ঘুমাইয়া ছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবী করিতেছে।

কি উপায় করি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

একদিন সহসা পৌরাণিক গল্প একটা মনে পড়িয়া গেল।

গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।

আশা করি তুমি গল্পটা জান।

...সুতরাং, কালবিলম্ব না করিয়া বখেড়া মিটাইয়া ফেলিয়াছি। কিছু অর্থব্যয় করাতে পুলিসের বখেড়াও মিটিয়াছে। আগামী পরশু গ্রামে পৌঁছিব। তুমি আমার বাড়িটা পরিষ্কার করিয়া রাখিও। সম্ভব হইলে দেওয়ালগুলিতে চুনকাম করাইয়া দিও। মোট কথা, চতুর্দিক বেশ পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ইতি—ত্রিগুণানন্দ।

সাত

ঐরাবত আসিতেছেন।

স্টেশনে গেলাম।

যথাসময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।

সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।

ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

ঐরাবত 'ক্লীন-শেভড'—গোঁফদাড়ি একেবারেই নাই!

মাথায় দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা।

মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট।

পরিধানে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি। পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্পশু! হাতে সোনার রিস্টওয়াচ।

সর্বাঙ্গ হইতে ভুর ভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে। আমি নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

চমক ভাঙিল যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন—"হাঁ ক'রে দেখছিস কি? এই তোর বউদি! বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।"

হেঁট হইয়া বউদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

উৎসবের ইতিহাস

সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

—সাণ্ডেল মশাইকে আরো চারটি পোলাও দাও।

—আন্—আন্—ওরে, এদিকে লুচি নিয়ে আয়—লুচি—লুচি

—মাংস আপনাকে দেব আর একটু ?

—না—না—সে কি কথা ! দাও খানিকটা মাংস—

—ডাল—ডাল চাই—ডাল ?

—ছ্যাঁচড়া—ছ্যাঁচড়া—

—ওহে, ছ্যাঁচড়া রেখে তুমি পায়েসটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও দিকি !

—এ-হে-হে জলের গেলাসটা পা লেগে প'ড়ে গেল যে! তোমরা দেখেও চলতে পার না ? উটের মত চলছ সব !

—এই রসগোল্লা, এদিকে এস—মুখুজ্জে মশাইকে গোটা আষ্টেক দাও—খাইয়ে লোক উনি—

—তুমি যাও তো হে, কয়েক 'পিস্' ভাল দেখে মাছ বেছে নিয়ে এস তো—মিত্তির মশাইকে দাও—

—দেখো হে, আখতার মিঞা আলাদা বসেছেন ব'লে যেন কিছু বাদ না পড়ে ! নরেন, তুমি ওঁর কাছেই থাক—

—সিঙ্গী মশাইকে খানিকটা ছ্যাঁচড়া দিয়ে যাও—চাট্‌নিও।

নানা আকৃতির জন তিরিশেক লোক আহারে প্রবৃত্ত।

জন পাঁচ-ছয় ছোকরা পরিবেশন করিতেছে। স্বচক্ষে দেখিলে তবে বিশ্বাস হইবে। না দেখিলে মনে হইবে শতখানেক লোক ভিতরে দাঙ্গা করিতেছে।

দুই

ঠিক ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়টি করুণরসাত্মক।

কিন্তু সত্য।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় 'থাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের নিকট টাকা ধার করিতেছেন। অসহায় মল্লিকের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে তো!

দেখা গেল মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক।

চাহিবামাত্র টাকাটা ঝনাৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"ফিষ্টি একটা করতে হবে বইকি! ফিষ্টি না করলে চলে! এ কটা টাকা—যদি সিক্স্‌ পারসেন্টই দাও—কদিন যাবে শুধতে? অমন তৈরী ছেলে তোমার! বড় ভাল ছোকরা নরেন—বড় ভাল—ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও—দেখো—"

মুখুজ্জের অর্থে উৎসবের আয়োজন হইল।

পোলাওটা সামান্য একটু ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ রসভঙ্গ হয় নাই।

সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়াছে।

তিন

ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা-পরম্পরা একটু জটিল।

সংক্ষিপ্ত তালিকাবদ্ধ আকৃতি নিম্নলিখিতরূপ—

(১) অনন্যোপায় নরেন মল্লিক (প্রবীণ মল্লিকের পুত্র) দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সাগ্রহে বিশু সান্যালকে তৈলাক্ত করিতেছে।

(২) তৈলনিষিক্ত বিশু সান্যাল দিশাহারা হইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৩) খবরটি গোপন রহিল না।

(৪) ফলে, বিশু সান্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমশক্তিশালী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন এবং একখানি পত্র লিখিলেন।

(৫) উভয় পত্রই আথতার আলির হস্তগত হইল এবং সমস্যাকুলচিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৬) বিশু সান্যালকে সুচারুরূপে তৈলাক্ত করিবার পর নরেন মল্লিক আবিষ্কার

করিল যে, তাহার তৈল-নিষেক-শক্তি মোটেই নিঃশেষিত হয় নাই। এখনও সে বহু লোককে তৈল-সুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ করা অনুচিত।

সে গিয়া 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়কে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল—"এইবার কাহাকে তৈলাক্ত করি বলুন তো! আখতার আলিকে গিয়া ধরিব কি?"

ঈষৎ-হাস্যসহকারে মুখুজ্জে বলিলেন—"সুবিধা হইবে না। আখতার আলি নিরামিষ তৈল পছন্দ করে না। তুমি বরং সিঙ্গীর কাছে যাও। পরাণ সিঙ্গী ঘাগী লোক! যদি রাজী করতে পার—নির্ঘাত লেগে যাবে।"

(৭) অবিলম্বে তৈল ও তুলি লইয়া নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হইল এবং তাহাকেও যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত করিল।

(৮) তৈলার্দ্র সিংহ মহাশয় নরেনকে আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে লইয়া পানু মিত্রের নিকট গেলেন।

(৯) ঘাগী-ঘুঘু সম্মিলন হইল। পানু মিত্তির ঘুঘু। বোঝা গেল তিনি কেবলমাত্র তৈল-নিষেকে নরম হইবার পাত্র নহেন। তিনি নরেন মল্লিকের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি সিংহ মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কর্ণকুহরে ফিসফিস করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন। ঘাগী-ঘুঘু-সংবাদ নরেনের অগোচর রহিয়া গেল।

(১০) প্রকাশ্যে পানু মিত্র নরেনকে কেবল বলিলেন—"শুধু হাতে হবে না হে। একটা ভালগোছের ডালি চাই—বুঝলে? ডালিটি নিয়ে কাল বিকেলে এসো—দু বোতল হুইস্কিও এনো—"

(১১) ঘাগী সিঙ্গী মহাশয় ঘুঘু মিত্তিরের নিকট গোপনে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থাৎ নরেনের পিতার কর্ণগোচর করিলেন।

প্রবীণ মল্লিককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইতে হইল।

(১২) পরদিন ঘুঘু-সমভিব্যাহারে স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।

(১৩) ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজনসুলভ। তিনি নরেনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 'ফোন' করিলেন।

(১৪) সমস্যাচ্ছন্ন আখতার আলি বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতেছিলেন, এমন সময়—ট্রিং—ট্রিং—ট্রিং—ফোন বাজিয়া উঠিল।

(১৫) আখতার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সমস্যা বিদূরিত হইল।

(১৬) নরেন নির্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।

চার

যে ঘটনাটি এখনও ঘটে নাই কিন্তু যাহা অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহার উল্লেখ না করিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

তাহা এই, নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পাণিপীড়ন করিতে হইবে।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়াই ঘুঘু মিত্তিরের মধ্যস্থতায় নরেন সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই নিয়োগকর্তা আখতার আলির জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে—অর্থাৎ নরেনের এতদিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

সংক্ষেপে, সে চাকুরি পাইয়াছে।

হউক কেরানীগিরি, হউক বেতন তিরিশ টাকা—

চাকুরি তো!

প্রস্পেক্‌ট্‌ও আছে।

উপরোক্ত ভোজনোৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

পাঁচ

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্ততঃ করিয়া সর্বশেষে উল্লেখ করিতেছি।

নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম. এ।

অলকনন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শশকগণের সহিত মেষগণের ঘোরতর সংঘর্ষ! উভয় পক্ষেরই আর্যশোণিত আকস্মিক উন্মাদনায় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়াছে। ভীষণ আরাবে সকলের কর্ণপটহ বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম। সত্যই এরূপ শব্দঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব! ওই শোন—শশকগণের দামামা-ধ্বনি মেয়েদের নাকাড়া-নিনাদকে ছাপাইয়া উঠিতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মেষগণের তূর্যাস্ফালন শশকদিগের ভেরী-হুঙ্কারকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

চরাচর কম্পমান।

শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি হিংস্র পক্ষীকুল চক্রাকারে গগনে উড্ডীয়মান। সিংহগণ এই লোমহর্ষক সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণতি চিন্তা করিয়া সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করিতেছে।

আকাশে বাতাসে আশঙ্কা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে।

বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যঙ্গকার দিগিন্দ্র সোম ক্ষিপ্ত হইয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কহিল—"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—পাকা খবর শুনে এলাম।"

দিগিন্দ্রের লেখনী হস্তচ্যুত হইল।

তিনি ব্যায়ত আননে হেবোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দুই

অতি-আধুনিক জনৈক প্রতিভা—অর্থাৎ সুকবি পঞ্চু মিত্র—হর্ষোৎফুল্ললোচনে গদ্যছন্দে কাঁদিয়াছিলেন—

শাওন রাতের প্রিয়া
ওগো শুনছ?
এসো তুমি তোমার নরম পা ফেলে ফেলে
আমার মনের ওপর।
এসো।

হয়তো তোমার কষ্ট হবে একটু,
কারণ মন যে আমার গোটা নয়—
তোমার নরম পা রাখবে কোথায় তুমি !
লক্ষ টুকরোয় ভাঙা যে আমার মন
তোমার গোটা নরম পা দুখানি রাখবার মত
গোটা মন নেই তো !
তবু এসো ভাই তুমি,
বুঝলে ?
শাওন-রাতের প্রিয়া আমার !…

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ধনেশ এক পয়সা দেবে না। কেন আর মিছিমিছি—"

বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া কবি বলিলেন—"সত্যি বলছেন আপনি !"

হেবো চটিয়া বলিল, "বিশ্বাস না করেন লিখে যান—"

লেখনী ত্যাগ করিয়া কবি কহিলেন—"এ কি খবর শোনালেন আপনি এই দারুণ দুপুরে ?" অর্ধদগ্ধ বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং প্রাচীর-সংলগ্ন টিকটিকি-দম্পতির পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন। উহারাই তাঁহাকে উপরোক্ত কবিতাটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

তিন

বিখ্যাত জীববিদ্যা-বিশারদ প্রখরেশ পাল বিদ্যা-সমুদ্র মন্থন করিয়া অপূর্ব প্রবন্ধ-রত্ন "উটপাখীর ডিম্ব"—উদ্ধার করিতেছিলেন। প্রখরেশ ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি। তাঁহার চতুর্দিকে নানারূপ ভয়াবহ আকৃতির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা উত্তুঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রায় সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। উটপাখীর ডিম্ব সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ জার্মান পণ্ডিতের মতামত তিনি তন্ময়চিত্তে প্রণিধান করিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কহিল—"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন মিছে খেটে মরছেন!"

"অ্যাঁ, বলেন কি!"

পাল মহাশয়ের চশমা নাসিকা-চ্যুত হইল।

ডিম ভাঙিয়া উষ্ট্রপক্ষী নিমেষে মরীচিকায় বিলীন হইয়া গেল।

হেবো হাসিয়া বলিল—"ঠিকই বলছি—নিট খবর।"

পাল মহাশয় নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তূপীকৃত গ্রন্থরাজির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

চার

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক মুরারিমোহন "সর্পিণী" নামে একটি চমকপ্রদ গল্প শুরু করিয়াছিলেন। মুরারিমোহনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি গল্প অল্প করেন না। "সর্পিণী" গল্পের ষোড়শী তন্বী নায়িকা তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষকে হত্যা এবং পাঁচজনকে মৃতপ্রায় করিয়া গলায় দড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছিল—

এমন সময় হেবো আসিয়া উপস্থিত।

তাহার বার্তা পূর্ববৎ।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

মুরারিমোহন মুখে বলিলেন বটে—"যাক, বাঁচা গেল।"

তাঁহার অন্তরাত্মা কিন্তু অন্য কথা বলিতে লাগিল।

পাঁচ

পণ্ডিত প্রভাকর শর্মা "গীতার রাজনৈতিক আদর্শ" লিখিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া তাঁহাকে আদর্শভ্রষ্ট করিল।

শর্মা মহাশয় প্রথমটা হেবোর কথা বিশ্বাসই করিতে চান না।

হেবো কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

অবশেষে শর্মা মহাশয়কে বিশ্বাস করিতেই হইল যে, ধনেশ সত্যই পয়সা খরচ করিতে রাজী নয়।"

বিশ্বাস হইবামাত্র তিনি গামছা পরিয়া তেল মাখিতে বসিয়া গেলেন।

উদ্দেশ্য গঙ্গা-স্নান করা।

এই গ্রীষ্মে "গীতার রাজনৈতিক আদর্শ" লইয়া মাথা ঘামানো অপেক্ষা গঙ্গা-স্নান করা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল।

ছয়

প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠকও মুদ্গর পরিত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণার্থে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"প্রাণায়াম ও ব্যায়াম"। রচনাটি গবেষণামূলক।

তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, প্রাণায়ামহীন ব্যায়াম করার কোন সার্থকতা নাই। চিনি-হীন সন্দেশের ন্যায় তাহা নিতান্তই অর্থহীন। ভীম, অর্জুন, শ্রীরামচন্দ্র, হনুমান প্রমুখ পৌরাণিক বীরগণ প্রাণায়াম করিতেন কি না তাহাই তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি উল্টাইয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় ছিলেন—

এমন সময় হেবো আসিয়া হাজির।

বলে কি!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা পাঠকজির ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিল।

রক্তাভ চক্ষু দুইটি হইতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল।

গর্দানের ও বাহুযুগলের পেশীসমূহ ফুলিয়া উঠিল।

তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন।

"ইয়ার্কি নাকি? পয়সা দেবে না! একটি ঘুষিতে ব্যাটার—"

হেবো সরিয়া পড়িল।

সাত

ঐতিহাসিক বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় একটি অতিশয় মৌলিক প্রবন্ধের মালমসলা যোগাড় করিতেছিলেন।

প্রবন্ধের নাম—"আলিবর্দী খাঁ নামে সত্যই কি কেহ ছিলেন?"

হেবো আসিয়া তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টায় বাধা দিল।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

আলিবর্দী খাঁর অস্তিত্ব ছিল কি না, সে চিন্তা সুতরাং নিরর্থক।

দাঁ মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন। ঐতিহাসিক হইলেও কবিরাজি তাঁহার পেশা।

আট

এই প্রকারে হেবো প্রায় পঞ্চাশজন লেখককে নিবৃত্ত করিল।

সে পাকা খবর পাইয়াছে, ধনেশ এক পয়সাও খরচ করিবে না।

সুতরাং 'অলকনন্দা' নামে যে মাসিক-পত্র বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল তাহা আর বাহির হইবে না।

দিগিন্দ্র সোম কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া ধনেশ পোদ্দার ইহার জন্য দশ হাজার মুদ্রা খরচ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

কিন্তু কে নাকি তাহাকে ভুজুং দিয়াছে, টাকাটা জলে পড়িবে।

ফলে ধনেশ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিগিন্দ্র সোম কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন।

তিনি সহজে কোন ব্যাপারে হাল ছাড়েন না। অনেক নৌকাই তিনি বহু দুর্যোগে তীরে ভিড়াইয়াছেন। তা ছাড়া শক্তিশালী লোক। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত ব্যঙ্গকার, তৃতীয়ত শুধু তাঁহার লেখনীরই জোর নাই—গলারও জোর আছে।

অথচ হঠকারী নহেন।

মাথা ঠাণ্ডা।

'অলকনন্দা' বাহির হইলে তাঁহারই সম্পাদক হইবার কথা। বেশ মোটা মাহিনা

মিলিবার আশা ছিল, সুতরাং সোম মহাশয় হাল ছাড়িলেন না। কি ভাবে চলিলে 'পানি' পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, যদিও ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ, কিন্তু এই সব কার্য (বস্তুত যে কোন বৃহৎ কার্যই) সুচারুরূপে হাঁসিল করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তিনি দল পাকাইলেন।

আশাহত যাবতীয় লেখকবৃন্দ তাঁহার দলে জুটিল।

উদ্দেশ্য—যেমন করিয়া হোক ধনেশকে পুনরায় তাতাইতে হইবে।

বিবাহের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন প্রজাবৃদ্ধিতে, সঙ্ঘের স্বাভাবিক পরিণতি তেমনি সভায়। নিষ্ফলা বিবাহ বরং সম্ভবে; কিন্তু নি-সভা সঙ্ঘ অসম্ভব।

সুতরাং অচিরেই দিগিন্দ্র সোমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনিবার্য হইয়া উঠিল।

কথা হইল সভা মাঠে বসিবে।

বাড়িতে সভা আহ্বান করিলে এতগুলি লোককে চা-চুরুট যোগানো সোম মহাশয়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইত; দ্বিতীয়ত তাঁহার বাড়িতে স্থানাভাব—এতগুলি লোককে বসাইবার মত প্রশস্ত স্থান তাঁহার ভাড়াটে বাসায় ছিল না। সুতরাং সভা মাঠে বসিবে ঠিক হইল। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগ ঘটিল। মাঠে এতবড় সভা করিতে হইলে পুলিসের অনুমতি চাই। দিগিন্দ্রবাবু সভাপতি জানিলে পুলিসের অনুমতি পাওয়াও মুশকিল। সুতরাং নির্বাচিত কয়েকজন সভ্য লইয়া একটি ছোট পরামর্শ-সভা বসিবে স্থির হইল। মাঠেই বসিবে।

নির্বাচিত সভ্যগণের নাম—

(১) দিগিন্দ্র সোম

(২) সুকবি পঞ্চু মিত্র

(৩) বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল

(৪) গল্প-লেখক মুরারিমোহন সাঁতরা

(৫) ব্যায়াম-বীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠক

(৬) ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ

(৭) হেবো

অর্থাৎ সপ্তরথী সম্মিলন।

দুর্দমনীয় দিগিন্দ্র সোম অধিনায়ক। সভা বসিল।

দিগিন্দ্রবাবু তাঁহার অনিন্দনীয় ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন—"বন্ধুগণ, আমরা কি এখনও বাঁচিয়া আছি? আমরা জীবিত—না, মৃত? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। আশা করি, আপনারা অবগত আছেন, কেন আজ আমি আপনাদের আহ্বান করিয়াছি। পরম স্নেহাস্পদ হেবো আপনাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া যে বার্তা বিতরণ করিয়া ফিরিয়াছে, তাহার সম্যক অর্থ কি আপনারা সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন? আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহার সরল অর্থ এই—ধনগর্বিত ধনেশ পোদ্দার সমগ্র লেখক-জাতির মুখে জুতা মারিয়াছেন। এই পাদুকা-কর্দম-লাঞ্ছিত মুখ আর কি আমরা সভ্যসমাজে দেখাইতে পারিব? আমরা দরিদ্র তাহা ঠিক, আমরা অসহায় তাহাও ঠিক, ভাগ্যনিয়ন্তা ভাগ্যহীন করিয়াই আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা প্রাণপাত করিতেছি না কি? নিরন্ন আমরা অশক্ত দেহে বাণীসাধনার একাগ্রতায় কত বিনিদ্র রজনী যে যাপন করিয়াছি, ধনেশ কি তাহার খবর রাখেন? তিনি আমাদের বাণীপূজার সহায়ক হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহা আমরা সকলেই জানি। হঠাৎ কোন্ অধিকারে তিনি আমাদের অপমান করিলেন? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছি—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?"

পুষ্কর পাঠক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

দন্ত কড়মড় করিয়া পেশীবহুল মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত করত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বলেন তো এক্ষুনি ব্যাটার দফা নিকেশ ক'রে দিয়ে আসি। ও-ব্যাটাকে সাবড়াতে কতক্ষণ! ফুটপাতে একটি আছাড় মারলেই মুণ্ডুটি ছাতু হয়ে যাবে—"

প্রাণায়াম-সাধক পাঠকজি চটিলে আর রক্ষা নাই।

এ কথা সকলেই জানিতেন।

সুতরাং সকলেই নিঃশব্দে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন—কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না।

সভাপতি দিগিন্দ্র সোম মাথা-ঠাণ্ডা লোক।

তিনি একটু পরে একটু কাশিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন—

"পাঠকজির উত্তেজনার স্বাভাবিকতা আশা করি আপনারা কেহই অস্বীকার করেন না। তাঁহার এই উক্তি তাঁহার মত বীরের উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু পাঠকজির প্রস্তাবিত কার্যটা শুধু যে দুরূহ ও বিপজ্জনক তাহাই নয়—তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধনেশবাবুকে ক্ষমা করিতে চাই এবং সম্ভব হইলে দলে টানিতে চাই। আর যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন—"

ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণকান্তি লোক। গলা খাঁকরি দিয়া তিনি বলিলেন—

"আমার দৃঢ় ধারণা, ধনেশবাবুর বায়ু প্রকুপিত হইয়াছে। বর্তমানে যদি কিছু করিতেই হয়, তবে তাঁহার কবিরাজি মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি এখন রোগী। ধনাধিক্য হেতু বায়ু-বিকৃতির নজির—বলেন তো—ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি। রোমে নীরো, ইজিপ্টে ইখন্যাটান, পারস্যে নাদিরশাহ—"

সভাপতি মহাশয় দাঁ মহাশয়কে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—

"দাঁ মহাশয়ের প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, ইহা তাদৃশ কার্যকরী হইবে না। ধনেশবাবু কিছুতেই আমাদের অনুমোদিত উপায়ে চিকিৎসিত হইতে রাজী হইবেন না। সহজ অথচ কার্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি—"

উস্কখুস্ক চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া হরিকুমার-শিষ্য সুকবি পঞ্চু মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মিহি গলায় বলিলেন—

"অনুমতি করেন তো ধনেশবাবুকে গদ্যকবিতায় চিঠি লিখিতে পারি আমি একটা। সমালোচিকা তপতী দেবীর কথা যদি সত্যি ব'লে মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে পাষাণ গলাবার ক্ষমতা আছে আমার ছন্দলক্ষ্মীর—"

বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অধীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"থামুন তো মশায় আপনি। বাজে ফুক্কুড়ি করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে পরে। কাজের কথা হোক আগে। আমার ধারণা, ধনেশ পোদ্দারকে ছলে

অথবা কৌশলে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই। বলে তার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। যাঁরাই জীবন-যুদ্ধের অর্থাৎ স্ট্রাগল ফর একজিস্টেন্সের রীতিনীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করেছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে হ'লে ছল ও কৌশলও কম উপযোগী অস্ত্র নয়। ধনেশকে ছলে অথবা কৌশলে আয়ত্তে আনতে হবে।"

গল্প-লেখক মুরারিমোহন বলিলেন—

"গণেশবাবুকে ধরলে হয় না? বেশ ভাল লোক তিনি—"

প্রায় সমস্বরে সকলে প্রশ্ন করিলেন—"গণেশ কে?"

"ধনেশের বাবা।"

মুরারিবাবু বলিতে লাগিলেন—"গণেশবাবু চমৎকার লোক। আমার সঙ্গে আলাপও আছে। গণেশবাবু যদি অনুরোধ করেন, ধনেশবাবু তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। ধনেশবাবু আর যাই হোন, খুব পিতৃভক্ত শুনেছি—"

"তাই চলুন। গণেশবাবুকেই ধরি গিয়ে সকলে মিলে।"

রুদ্ধ আবেগে দিগিন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বাকী সকলেও সোৎসাহে সম্মত হইয়া গেলেন।

হেবো কিছু বলিল না।

সে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরারিবাবু ভুল জানিতেন।

আসল কথা জানিত হেবো।

কথাটি এই—ধনেশ পিতৃভক্ত ছিল না, গণেশই পুত্রভক্ত ছিলেন। কারণও ছিল।

বৃদ্ধ গণেশ তরুণী তৃতীয় পক্ষ ও বিগত দ্বিতীয় পক্ষের অনেকগুলি অপোগণ্ড কাচ্চাবাচ্চা লইয়া প্রথম পক্ষের পুত্র ধনেশের দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। ধনেশ ঘাড় ধরিয়া বৃদ্ধ পিতাকে কাচ্চাবাচ্চা সমেত রাস্তায় বাহির করিয়া দেন নাই, ইহাই যদি পিতৃভক্তির নিদর্শন হয়—তাহা হইলে ধনেশ পিতৃভক্ত।

পিতার প্রতি ভক্তি থাকিবার ধনেশের কোন হেতুও ছিল না।

এক জন্মদান করা ছাড়া গণেশ ধনেশের আর কোন উপকার করেন নাই। এই বিপুল ধনসম্ভার ধনেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই—নিজে উপার্জন করিয়াছেন। গণেশ সামান্য চাকুরি করিতেন এবং স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে আজীবন তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি ধনেশকে লেখাপড়াটা পর্যন্ত শিখাইবার অবসর পান নাই। ধনেশ স্বকীয় প্রতিভাবলে পাট ও লোহার কারবার করিয়া বিগত যুদ্ধের বাজারে বহু টাকার মালিক হইয়া বসিয়াছেন।

তবে ইহা সত্য কথা, ধনেশ পিতার প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করেন না। কিন্তু পিতৃভক্ত বলিতে যাহা বুঝায়, ধনেশ তাহা নন।

পিতা গণেশ পুত্র ধনেশের আধিপত্যে দুই পক্ষ লইয়া গরুড় পক্ষীটির মত সসঙ্কোচে বাস করিয়া থাকেন।

এই গণেশকে গিয়া দিগিন্দ্রবাবুর দল গোপনে ধরিয়া পড়িলেন। গণেশ লোক খারাপ নন। এতগুলি ভদ্রসন্তানের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। আশ্বাস দিলেন, ধনেশকে তিনি অনুরোধ করিবেন।

করিলেনও।

শুনিবামাত্র ধনেশ বলিয়া বসিলেন—"ক্ষেপেছ? এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তোমাকে এসে ধরেছিল বুঝি! যত সব বোগাসের দল!"

গণেশ চুপসাইয়া গেলেন।

সুতরাং পরদিন দিগিন্দ্রবাবুকেও চুপসাইতে হইল।

এ রকম যে ঘটিবে, হেবো তাহা জানিত।

দুই

আবার পরামর্শ সভা বসিল।

গল্প-লেখক মুরারিমোহন আবার একটি পরামর্শ দিলেন এবং রাজনৈতিক দিগিন্দ্রবাবু আবার তাহাতে নাচিলেন। সুতরাং বাকী সকলকেও নাচিতে হইল।

"কঙ্করানন্দের কাছে যাওয়া যাক।"

কঙ্করানন্দ ধনেশের গুরু।

কঙ্করানন্দকে ভিজাইতে পারিলে ধনেশ তাতিবেই।

গুরুবাক্য ধনেশ কিছুতেই ঠেলিতে পারিবে না।

সদলবলে গিয়া সকলে কঙ্করানন্দের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত শুনিয়া কঙ্করানন্দ বলিলেন—"তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু। ধনেশকে আমি অনুরোধ করব।"

সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

এইবার নিশ্চয়।

হেবো কিন্তু হাসিল।

* * * *

হেবোর হাসি বিফল হইল না।

ধনেশ অটল।

গুরুবাক্য সে অবহেলা করিয়াছে, অথচ গুরু চটেন নাই।

ধনেশ-কঙ্করানন্দ-সংবাদ নিম্নলিখিত প্রকার।

সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া ধনেশ গুরুদেবকে বলিলেন—

"গুরুদেব, আপনার আদেশ আমি নতশিরে মানতে বাধ্য। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করবার অনুমতি দিন আমাকে। এতগুলো টাকা কি আপনি জলে ফেলে দিতে আদেশ করেন? যদি করেন, দেব—জলেই ফেলে দেব আমি। আমার বিজ্‌নেস-পার্টনার নাথমল স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাকে যে, মাসিক-পত্র বার করলে টাকাটা ডাহা জলে পড়বে। তা ছাড়া অতগুলো টাকা বাজে ব্যাপারে আটকে ফেলতে ইচ্ছে নেই আমার। আমার আন্তরিক ইচ্ছে আপনাকে—"

স্মিতহাস্যভরে কঙ্করানন্দ বলিলেন—"আমার কিসের দরকার বল! আমি কাঁকর খাই, কাঁকরে শুই—"

"না না না, আপনার জন্যে নয়—সে স্পর্ধা আমার নেই। আপনাকে কেন্দ্র ক'রে একটা আশ্রম স্থাপন করব ব'লে অনেক দিন থেকে আমার বাসনা।"

"তবে যা ভাল বোঝ কর।"

সুতরাং কঙ্করানন্দকে ভিজাইয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রিকাল।

বাহিরের ঘরটাতে বসিয়া দিগিন্দ্রবাবু কানে কলমের উল্টা দিকটা ঢুকাইয়া বিকৃতমুখে কান চুলকাইতেছিলেন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

আসিয়া বলিল—"দিগিনদা, যোগাড় করেছি।"

"কি ?"

"কান থেকে কলমটা বার করুন আগে।"

বেশ করিয়া একবার শেষ চুলকানি চুলকাইয়া লইয়া দিগিন্দ্র কলমটা কান হইতে বাহির করিলেন।

করিবামাত্র হেবো তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—"ঠিকানা পেয়েছি। ধনেশও আজ কলকাতার বাইরে গেছে। আজই সুযোগ, যাবেন এখন ?"

"এক্ষুনি।"

দুই

চিৎপুর অঞ্চলে একটি সুসজ্জিত কক্ষ।

মদিরাক্ষী একটি যুবতীর সম্মুখে দিগিন্দ্র কাঁচুমাচু হইয়া বসিয়া আছেন।

যুবতী হাসিয়া বলিলেন—"নিন, পান খান একটা।"

"হ্যাঁ, এই যে !"

ত্রস্ত দিগিন্দ্র একটি পান তুলিয়া লইলেন।

"মাসিক-পত্র আপনাদের বার করিয়ে দেবই—কথা দিলাম। নিশ্চয় দেব। কিন্তু তার বদলে আমাকে কি দেবেন বলুন !"

যুবতীর কৌতুকদীপ্ত নয়ন দুটিতে চাপা হাসি ফুটি-ফুটি করিতে লাগিল।

দিগিন্দ্র উত্তর দিবে কি ! তাহার অবস্থা তখন শোচনীয়।

গরম দুধে পাঁউরুটি পড়িলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, দিগিন্দ্রের অবস্থা তখন অনেকটা তাই—অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

আবদার-তরল কণ্ঠে যুবতী আবার বলিলেন—"আপনাদের কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে কিন্তু।"

দিগিন্দ্র নিরুত্তর।

দিগিন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া হেবোই শেষ উত্তর দিল।

"নিশ্চয়, প্রত্যেক মাসেই আপনার ছবি থাকবে।"

তিন

বলা বাহুল্য, ধনেশ পুরুষ মানুষ।

সুতরাং সে কাবু হইল।

শুধু কাবু নয়, ঢালা হুকুম দিল—"যত টাকা লাগে—কুছ পরোয়া নেই।" সুতরাং 'অলকনন্দা' এইবার নির্ঘাত বাহির হইবে।

মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছে।

কয়েকজন উদীয়মান শিল্পী চিৎপুরে গিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছেন। হেবোর নির্দেশ অনুযায়ী 'অলকনন্দা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম রঙীন ছবিটির নাম হইবে 'পূজারিণী'। দ্বিতীয় ছবিটির 'স্নানার্থিনী। তৃতীয় ছবিটির নামকরণ হেবো এখনও করে নাই।

যুগান্তর

এককড়ির প্রপৌত্র, দুকড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার স্বীয় পুত্র ছকড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোদ্দারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত। বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যে-কোন বিষয়ে—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্তমান সামাজিক অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জনী আস্ফালন করিয়া জাহির করিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা সানন্দে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

অন্য উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এবং গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। সুতরাং হরিণহাটি গ্রামে সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে যাঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছেন, তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোদ্দার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করাতে সারা জীবনটা ভরিয়া নানা-প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি লইয়া যেখানে সেখানে যখন তখন আস্ফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন, বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার করেন। ফিতা-বাঁধা ফতুয়াই তাঁহার সাধারণ অঙ্গচ্ছদ। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখেন নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোদ্দার পুত্র ছকড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া দিয়া গৃহিণী ছকড়ির মাথাটি এমনভাবে খাইয়াছেন যে, পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ন্যায় মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কলিকাতায় পড়াশোনা করিতে যায় দূরদর্শী পোদ্দার মহাশয় তখনই আপত্তি করিয়াছিলেন। বি. এ., এম. এ. পাস করিয়া দশটা মুণ্ড, বিশটা হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে, তাহাতেই বা কি? এই বাজারে অতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন। এখন নাও, ছেলে 'লভে' পড়িয়াছে।

দুই

ছেলে যে 'লভে' পড়িয়াছে এ কথাটা প্রথমত পোদ্দার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব কুণ্ডুর সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের পত্রের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ:

একদা পাঁচকড়ি পোদ্দার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, ছকড়ির বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না—ইহা অত্যন্তই অন্যায় হইতেছে। বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ছকড়ি লেখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এবং মাধব কুণ্ডুও সে কথার সমর্থন করিলেন যে, জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছকড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না, এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না করিলে নানা প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষত কলিকাতার মত শহরে।

পোদ্দার মহাশয়ের স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়েকেই তিনি ছকড়ির জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহুদিন পূর্বেই বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফলাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোদ্দার মহাশয়ের ভারি পছন্দ। তা ছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্বোপরি বছর চারেক পূর্বে বিশ্বনাথ যখন

দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং ঐখানেই বিবাহ ঠিক। মাধব কুণ্ডুও এ বিষয়ে একমত। পাকা কথা দেওয়ার পর হইতেই—অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর ধরিয়া—পোদ্দার মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোদ্দার মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

"দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। ইস্কুলে-পড়া হাল-ফেশিয়ান মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে। বউমাটিকে গৃহ-কর্মনিপুণা কর। আমার সহধর্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রান্না একাই রাঁধিতে পারেন। তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ত্ব গ্রামসুদ্ধ লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই চাল বজায় রাখিতে পারে—"

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

"ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সংসারধর্মে সুনিপুণা করিতে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তোমার বউমা মসলা বাটা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার গৃহকর্ম নিয়মিতভাবে করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জরির কার্য করিতেও শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন সুতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে, দেখিলে সত্যই অবাক্ হইতে হয়—"

ইহার উত্তরে পোদ্দার মহাশয় জবাব দিতেন—

"উল-বোনা ও জরির কার্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা এমন কি উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি: বউমাটিকে ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে। মাধব কুণ্ডু খবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আক্কেল গুড়ুম হইয়া যায়—"

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

"উল-বোনা ও জরির কার্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না—"

এইভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছকড়ি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশোনা করে। বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে, পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে সে বিবাহ করিবে—তৎপূর্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ডুর পরামর্শ অনুযায়ী পোদ্দার মহাশয় ঠিক করিলেন যে, জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছকড়ি বিবাহ করিবে না। আজকালের ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ডু বর্তমান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোদ্দার মহাশয় মাধব কুণ্ডুর নির্দেশমত ছকড়িকে পত্র দিলেন যে, আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসে।

তিন

ইহার উত্তরে ছকড়ি যাহা লিখিল, তাহাতে পাঁচকড়ি আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব যে এতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাধব কুণ্ডুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছকড়ি লিখিয়াছে—

"বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পূর্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ কথা জানাই নাই তাহার কারণ, আপনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিয়া আসিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

কুণ্ডু আসিলে পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"ছকড়ির চিঠি।

প'ড়ে দেখ।—এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোদ্দার-বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মায়!"

কুণ্ডু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"লভে পড়েছে।"

"কিসে পড়েছে?"

"লভে—লভে—মানে প্রেমে।"

পোদ্দার মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তারপর বলিলেন—"এর মূলে কি আছে জান?"

কুণ্ডু বলিলেন—"পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা।"

"না, আমার গিন্নী। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটাকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই। দাও চিঠিখানা—"

পোদ্দার পত্রখানি লইয়া খড়ম চট্‌চট্ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোদ্দার মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোদ্দার মাধব কুণ্ডুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আত্মগোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ডু বলিলেন—"চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনে তীর্থটা সেরে আসা যাক। এক ঢিলে দুই পাখিই মরবে।"

পাঁচকড়ি পোদ্দার তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ডু সঙ্গী।

চার

দীর্ঘ ছয় মাস পোদ্দার মহাশয় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ডু সঙ্গে থাকাতে ভ্রমণটা মনোরমই হইল। ফিরিবার পথে কাশীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

"ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমার নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়িতে কোন

ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে, তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম তুমি নাকি কাশীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মর্মে হরিণহাটিতে কুণ্ডু মহাশয় একখানি পত্রও নাকি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমার ঠিকানা যোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পাই নাই। অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি এবং তোমার মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

"তুমি স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে, আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিসটা ধীরে-সুস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস করি, লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।

"শ্রীমান ছকড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তাহাদের মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মেলামেশাটা একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছকড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টই বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে, সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত; এবং ইহাও সে বলিল যে তুমি যদি জানিতে পার যে, মেয়ে স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ডু মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটিতে দিবে না। তোমাকে তো আমিও চিনি। তুমি একগুঁয়ে লোক—হয়তো বাঁকিয়া বসিবে। নানারূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছকড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্বিঘ্নেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছকড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে এবং ছকড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, এইবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমি হরিণহাটি গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম, তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ!

"সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না হয় দু ঘা মারিয়া যাও।

কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্কুলে পড়িলেও সত্যই গৃহকর্মনিপুণা হইয়াছে। নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার...” ইত্যাদি।

পাঁচ

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটারফ্লাই ফ্যাশানে গোঁপ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক-বাড়ির বৈঠকখানার বারান্দায় বিলাতী মরশুমী ফুলের কয়েকটি টবও বসানো হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডুর মুখের দিকে শুধু একবার চাহিলেন।

কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, “সব লক্ষ্য করছি—”

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরীর বেণী রচনা করিতেছেন। বৌ!

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্বৃত বেশবাস সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধূ ছুটিয়া গৃহমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—“হঠাৎ খবর-টবর না দিয়ে এসে পড়লে যে? যাক, এলে বাঁচলাম। ভাল ছিলে তো বেশ?”

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিলেন—“ওটা কি?”

“ওমা, ছকড়ির খোকা হয়েছে যে! অমলকুমার—”

“কি?”

“অমলকুমার। বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।”

পোদ্দার স্তম্ভিত।

বিস্ময় কাটিলে তিনি বলিলেন—“অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা। আমি কাশী ফিরে চললাম—”

বলিয়া তিনি সত্যই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন—“ওমা, সে কি কথা গো!”

''অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না।''

''বেশ তো, তুমিই একটা নাম দাও না।''

''নকড়ি।''

''বেশ তাই হবে।''

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাস্তব ও স্বপ্ন

আদেশ শুনিয়া পলাশ অবাক্ হইয়া গেল।

তাহার পর যথোচিত সংযত কণ্ঠে কহিল—"তা কি ক'রে সম্ভব ?"

বড়বাবু রুক্ষস্বরে উত্তর দিলেন—"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না মশাই, কাল নটার মধ্যে আপনাকে লেজারটা কমপ্লিট ক'রে দিতে হবে। দশটার সময় ইনেস্‌পেকশন হবে—"

পলাশ আবার বলিল—"সমস্ত লেজারটা কমপ্লিট করতে হ'লে তো সমস্ত রাত কেটে যাবে। আমি কি সমস্ত রাত এইখানে ব'সে কাজ করব ?"

"সমস্ত রাত! দশটা পর্যন্ত কাজ করলে অমন দুটো লেজার কমপ্লিট হয়ে যায়। এখন তো মাত্র আড়াইটে বেজেছে। সাত-আট ঘণ্টা ভাল ক'রে কাজ করলে লেজার কমপ্লিট হবে না? কাকে শেখাচ্ছেন আপনি! আমিও একদিন আপনার পোস্টেই চাকরি করেছি।"

"বাড়িতে আমার ছোট মেয়েটির জ্বর দেখে এসেছিলাম—এত রাত্রি পর্যন্ত আপিসে থাকলে—"

পলাশ তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না। বড়বাবু তাঁহার 'রিভলভিং' চেয়ারখানাতে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া পলাশের মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া কঠিন স্বরে বললেন—"দেখুন, এইজন্যেই আমি সায়েবকে বলেছিলাম যে, এম. এস-সি-ফেমেস্‌সি ক্লার্ক আমার দরকার নেই। ওঁরা 'স্টিক' ক'রে থাকবেনও না, আর যতদিন থাকবেন ততদিন কাজকর্ম না ক'রে খালি তর্ক করবেন। আপনার ছোট মেয়েটির জ্বর হয়েছে ব'লে কি আমরা আপিস বন্ধ ক'রে দেব নাকি ? আমার বাড়িতেও দুটো ছেলের হুপিং কাশি, একটির চোখ উঠেছে, পিসিমার হাঁপানি, গিন্নীর কোমরে ফিক্-ব্যথা— তাই ব'লে কি আমি ঘরে বসে বুক চাপড়াব ? না, বুক চাপড়ালেই কিছু উপশম হবে ?"

পলাশ বলিল—"কিন্তু এত কাজ যে এরিয়র পড়েছে তা তো ঠিক আমার দোষে নয়। আমি যতদিন থেকে—"

উত্তপ্ত তৈলে এইবার বার্তাকু নিক্ষিপ্ত হইল।

বড়বাবু টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"I order you to do it. You shall suffer if you do not obey. Go—"

পলাশ চলিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, বড়বাবু প্রাকৃত ভাষায় স্বগতোক্তি করিতেছেন—"আরে মোলো—কচু খেলে যা—"

বড়বাবুর মুখটি লম্বা ধরনের—অনেকটা মোচার ন্যায়। থুৎনির কাছে এবং মাথার দিকে একটু সূচালো। মস্তক কেশবিহীন। সামনের দিকটাতে এত টাক পড়িয়াছে যে, আলো পড়িলে চক্‌চক্ করে। চক্ষু দুইটি বড় বড এবং অস্বাভাবিক রকম সাদা। গায়ের বর্ণ ঘোর কালো হওয়ায় আরও সাদা দেখায়। মুখে গোঁফ-দাড়ি নাই, পরিষ্কার কামানো। বলা বাহুল্য বড়বাবুর দেহ-সৌষ্ঠবে নয়নমুগ্ধকর কিছু নাই। তাহাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয় নাই, কারণ তিনি কোন প্রণয়-ব্যাপারে নায়ক-পদপ্রার্থী নহেন। জীবনে তিনি যাহা কামনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি এই বদ চেহারা এবং স্বল্প বিদ্যা সত্ত্বেও পাইয়াছেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এত বড় আপিসের বড়বাবুর পদে উন্নীত হওয়া কি সোজা কথা?

দুই

বড়বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাশ দেখিল যে, বড়বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন কৌতূহলী কেরানী বড়াবাবুর দ্বারের কাছে উৎকর্ণ হইয়া আড়ি পাতিয়াছে। পলাশকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে, শ্রবণযোগ্য আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। পলাশও আসিয়া নিজের স্থানটিতে বসিল। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমানিত সে জীবনে কখনও হয় নাই। ছি-ছি, মাসে চল্লিশটা টাকার জন্য এই লাঞ্ছনা! একটু পরেই একটি সুদর্শন ছোকরা আসিয়া পাশের টুলটা টানিয়া বসিল এবং এক টিপ নস্য টানিয়া হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললে হুঁকো-মুখো?"

অফিসে সকলেই বড়বাবুকে আড়ালে 'হুঁকো-মুখো' বলিয়া ডাকিত। পলাশ কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিল না।

অমিয় বলিল—"কি বললে, বল না?"

অমিয় পলাশের বন্ধু। এককালে সহপাঠী ছিল।

পলাশ বলিল—"বললে এই লেজার বুক কমপ্লিট ক'রে দিতে।" পলাশ এক বিরাটকায় খাতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল।

অমিয় বলিল—"এখন বলবে বইকি। কাল অডিট আসছে কিনা! তোমার পোস্টে ওর শালা এতকাল ছিল। কুটোটি নাড়ত না, তাই এতসব বাকি—"

পলাশ নির্বাক্ হইয়া রহিল।

অমিয় সহানুভূতির স্বরে বলিল—"এখন আর ভেবে কি হবে ভাই? উঠে-প'ড়ে লেগে যাওয়াই ভাল। বল তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার ফাইল আমি ক্লিয়ার ক'রে ফেলেছি।"

এমন সময় চশমা সামলাইতে সামলাইতে বিশ্বাস মহাশয় প্রবেশ করিলেন। স্ফীতোদর বর্তুলাকার ভদ্রলোক। মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুল; হাসিলে কালো পানের ছোপ-ধরা কয়েকটি দন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অফিসের অনেককালের কর্মচারী। অফিসের সকলের সহিত তাঁহার দাদামহাশয় সম্পর্ক। তাঁহার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা সকলেই করে। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করাতে রসিকতার মাত্রাটা সম্প্রতি একটু বাড়িয়াছে।

বিশ্বাস মহাশয় আসিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া অভিভাবক-ভঙ্গীতে বলিলেন—"ছি-ছি, কাজটা তোমার অন্যায় হয়েছে ভাই, বড়বাবুর মুখের উপর অমন জবাব দেওয়াটা তোমার উচিত হয় নি; হাজার হোক প্রবীণ লোক, তা ছাড়া শিবতুল্য মানুষ—" বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি নিম্নস্বরে গল্প জুড়িয়া দিলেন—"আমাদের আপিসে আমরা তো সুখে আছি হে, রাম রাজত্বে আছি বললেই চলে। ওই আমাদের সামনের আপিসের বড়বাবুর তুলনায় আমাদের বড়বাবু তো সাক্ষাৎ শিব। ওদের বড়বাবু রেগে গেলে জুতো পর্যন্ত ছোঁড়েন।"

একবার গল্প শুরু করিলে বিশ্বাস মহাশয়ের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। সত্যের বড় বড় নদী পর্বত তিনি অনায়াসে মিথ্যা কল্পনার এরোপ্লেনে উড়িয়া পার হইয়া যান। এ ক্ষমতা তাঁহার আছে, সুতরাং তিনি তাঁহার শ্লথ চশমাটা নাকের উপর ঠিকমত বসাইয়া লইয়া শুরু করিলেন—

"সেকালে শুনেছি পালা ক'রে বড়বাবুদের পা টিপে দিতে হ'ত—তামাক

সেজে দিতে হ'ত, তবে চাকরি বজায় থাকত। শঙ্কর খুড়োর মুখে গল্প শুনেছি—একবার তাঁর আপিসের বড়বাবুর হ'ল ডিসপেপ্‌সিয়া। ডাক্তার উপদেশ দিলেন, গন্ধভাদালের সঙ্গে চুনোমাছের ঝোল ক'রে খেতে। তাই শুনে শঙ্কর খুড়ো সকালে উঠে নিজেদের খিড়কির পুকুর থেকে স্বহস্তে জাল ফেলে চুনোমাছ ধ'রে আর এক বোঝা গন্ধভাদালের লতা সংগ্রহ করে নিয়ে আপিসে হাজির হলেন। আপিসে গিয়েই কিন্তু শঙ্কর খুড়োর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। গিয়ে দেখেন, সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় মণ খানেক চুনোমাছ আর গাড়ি খানেক গন্ধভাদালের লতা এসে পৌঁছে গেছে, দুর্গন্ধে আপিসে টেকা মুশকিল। সায়েব চ'টে লাল—"

অমিয় হাসিয়া করজোড়ে বলিল—"বিশ্বাসদা, ঢের হয়েছে। এইবার একটু দয়া করুন। এই বিরাট লেজার কমপ্লিট করতে হবে।"

বিশ্বাস মহাশয় একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"এতে আর দয়া করা-করি কি ভাই! তোমরা হিতকথা বললে তো আর শুনবে না। তোমাদের মেজাজ তেরিয়া হয়েই আছে। মাথা ঠিক রেখে কথাটা পর্যন্ত কইতে পার না। বাঙালীর ছেলে চাকরিটি গেলে তখন খাবে কি?" বলিয়া তিনি মাথা ঝাঁকিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ চশমাটা আবার নাকের উপর বসাইয়া দিলেন, তাহার পর চোখের ইশারায় পলাশকে ডাকিয়া বলিলেন—"একটা কথা বলছি শোন, প্রাইভেটলি—"

পলাশ উঠিয়া গেল। বারান্দায় গিয়া বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—"বড়বাবু চ'লে যাওয়ার আগে একবার গিয়ে অ্যাপলজি চেয়ে এসো।"

"অ্যাপলজি? কেন?"

ইহার বেশী আর পলাশ বলিতে পারিল না। সে এই অল্প দিন হইল চাকুরিতে ঢুকিয়াছে, এখনও তাহার গায়ে ইউনিভার্সিটির গন্ধ লাগিয়া আছে; এই সদাগরী অফিসের রীতি-নীতি এখনও সে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিশ্বাস মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"এখনও টেমপোরারি লিস্টে রয়েছ, বুঝছ না? বড়বাবুর কলমের এক খোঁচায় তোমার চাকরিটি খতম হয়ে যেতে পারে, ওঁর ছোট শালা মুকিয়ে রয়েছে, তোমাকে তো উনি নিতেই চান নি প্রথমে। এম. এস-সি পাস ব'লে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। তোমার শ্বশুর হেরম্ববাবুর সঙ্গে টম্‌লিন্‌সন সাহেবর অত্যন্ত দহরম-মহরম, তারই জোরে তুমি চাকরিটি পেয়েছ;

তুচ্ছ একটা কথার জন্যে খুইয়ো না। বড়বাবুকে বল যে, 'আমায় মাপ করুন—এমন আর কখনো হবে না।' সব ঠিক হয়ে যাবে। এধারে শিবতুল্য লোক উনি।" দ্বারপ্রান্তে অমিয় দেখা দিল, অমিয়কে দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয় শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও; কাজ করোগে তোমরা, আমার কাজ হয় নি এখনও। ওরে, এক পয়সার মিঠে পান বোঁ ক'রে নিয়ে আয় তো বাবা।" বলিয়া তিনি একটি পয়সা একটা পাঙ্খা-কুলিকে দিলেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিলেন—"একটু দোক্তাও আনিস—ওই মোড়ের দোকানটা থেকে নিস্—বেড়ে দোক্তা মাগীর—"

বিশ্বাস মহাশয় চলিয়া গেলেন।

অমিয় এবং পলাশ আসিয়া লেজার লইয়া পড়িল।

তিন

রাত্রে পলাশ বাড়ি ফিরিতেছে।

দশটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলিটার মুখে দাঁড়াইয়া পলাশ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। এই দুর্গন্ধ গলিটার এক প্রান্তে সে তাহার সাধের সংসার পাতিয়াছে। মেয়েটা কেমন আছে কে জানে। নানা আবর্জনা পার হইয়া সে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল; স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আসিয়া দ্বার খুলিল এবং প্রশ্ন করিল—"আজ ফিরতে এত রাত হ'ল?"

"আপিসে আজ কাজ বেশী ছিল।"

বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া হেমাঙ্গিনী আবার প্রশ্ন করিল—"আপিসে তোমাদের ফুলবাগান আছে নাকি?"

"তার মানে?"

"ফুল কোথায় পেলে?"

"কই? ও, ভুলেই গেছলাম! খুকী কেমন আছে?" বলিয়া কোটের বাটন-হোল হইতে একটি ক্ষুদ্র যূথিকাগুচ্ছ খুলিতে খুলিতে বলিল—"নাও, তুমি খোঁপায় পর, ময়লা কোটে এসব মানায় না। অমিয়র বউ দিলে।"

"অমিয়র বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ অনুভব করিয়া জবাবদিহির সুরে পলাশ বলিতে লাগিল—"মানে, অমিয়ও এতক্ষণ আপিসে আমার সঙ্গে সমানে ছিল কিনা! আমার কাজের সাহায্য করছিল। আজ তার ভায়রাভাই এসেছে—বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার একটু আয়োজন ছিল—আমাকে নেমন্তন্ন করলে—'না' বলতে পারলাম না; অমিয় না থাকলে আজ লেজার কমপ্লিট করা অসম্ভব হ'ত। খুকী কেমন আছে?"

"খাওয়া-দাওয়া ওদের বাড়িতে সেরেই এসেছ তা হ'লে?"

"হ্যাঁ। খুকীটা কেমন আছে?"

"রাত্রে ওখানে শুলেও পারতে! আসবার দরকার কি ছিল! খুকীর জন্মে তো তোমার ঘুম হচ্ছে না! ভারি এক ব্যাগারী হরেন ডাক্তার জুটেছে—সন্ধ্যেবেলা এসে পনরো-ষোল টাকার ইন্‌জেক্‌শনের ফরমাশ ক'রে গেছেন। এদিকে মেয়ের দুধ পর্যন্ত পেটে যাচ্ছে না, নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে—"

ঝনাৎ করিয়া সদর-দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইল। পলাশ বুঝিল, এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলে পাশের বাড়ির লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইবে মাত্র। নীরবে ঘরে ঢুকিল। চোখে পড়িল তাহার 'ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস্'খানা দিয়া একটা বাটিতে কি ঢাকা রহিয়াছে। বোধ হয় সাবু কিংবা বালি। নিকটে একখানা চিঠিও রহিয়াছে। দেখিল হরেন ডাক্তার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। চিঠি পড়িয়া পলাশের গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। মেয়ের ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে, আজ রাত্রেই ইন্‌জেক্‌শন্ না দিলে জীবন সংশয়। সর্বনাশ, ইন্‌জেক্‌শন কিনিবার মত টাকাও যে তাহার হাতে এখন নাই! অথচ—

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল, হেমাঙ্গিনী খাইতে বসিয়াছেন। বাঙালী ঘরের অধিকাংশ সাধ্বী স্ত্রীগণের আদর্শ-অনুযায়ী হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ স্বামীর প্রত্যাশায় অভুক্তা ছিলেন এবং স্বামীর বিলম্বহেতু মনে মনে চটিতেছিলেন।

স্বামীর বন্ধুর বাড়িতে আহারাদি সমাপনান্তে যুবতী বন্ধু-পত্নীর নিকট হইতে পুষ্পগুচ্ছ উপহার পাইয়াছেন দেখিয়া হেমাঙ্গিনী উক্ত সাধ্বী স্ত্রীগণের অনুকরণে ক্লান্ত স্বামীকে কটূক্তি বর্ষণান্তে কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত লইয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনীর দোদুল্যমান দুল দুইটির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া পলাশ ভাবিতে লাগিল, শেষ পর্যন্ত কি—

চার

কল্পনাপ্রবণ পলাশকান্তির যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা পাঁচটা। নিদ্রাভঙ্গ হইলেও স্বপ্নভঙ্গ হইতে চায় না। অত্যন্ত দীর্ঘ স্বপ্ন দেখিয়াছে সে। তাহার মনে হইতে লাগিল, কুপিতা হেমাঙ্গিনী আশেপাশে কোথাও ঘুরিতেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিল যে, সে তাহার সেই পুরাতন মেসের সনাতন জারুল কাঠের চৌকিতেই শুইয়া আছে। সমস্তটাই স্বপ্ন! আঃ, বাঁচা গেল।

সে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল; শেল্ফ হইতে হেমাঙ্গিনীর ফোটোখানা লইয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিল। দেখিতে মন্দ নয় মেয়েটি। তবু ও-খপ্পরে আর সে পা দিবে না।

এমন সময় হেরম্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকরিবামাত্র পলাশ ফোটোখানি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—"আমি ভেবে দেখলাম ভাল একটা রোজগারের যোগাড় না ক'রে এখন বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

হেরম্ববাবু হাসিয়া বলিলেন—"চাকরি তো আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি তোমার জন্যে। টম্‌লিন্‌সন সায়েব আমাকে প্রমিস ক'রে রেখেছেন। তোমার বন্ধু অমিয়বাবু, তোমাদের এই মেসেই থাকেন বিশ্বেস মশাই, এঁদের আপিসেই তোমার ভাল একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দেব। প্রথমেই চল্লিশ টাকা থেকে—"

পলাশ সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে না,—অত কম মাইনেতে আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না। দেখি যদি একটা প্রোফেসারি জোটাতে পারি। বি. সি. এস.-টা দেবারও চেষ্টা করব।"

ক্ষুণ্ণ হেরম্ববাবু বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা হইল, ফোটোগ্রাফারটা ঠিক ফোটো লইতে পারে নাই। পোজটা ঠিক হয় নাই।

পাঁচ

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পলাশ এবং অমিয় একটি সিনেমা শোতে যাইতে যাইতে গল্প করিতেছিল। বিশ্বাস মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা

নয়, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে একটি মনোহারিণী শাড়ি কিনিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পলাশ এবং অমিয়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের পছন্দের উপর বিশ্বাস মহাশয়ের অগাধ বিশ্বাস।

অমিয় বলিতেছিল—"স্বপ্নে নিজের সংসারটা কেমন দেখলি ?"

"ঠিক দাদা-বৌদির সংসার যেমন।"

"আর আপিস কেমন লাগল ?"

"আপিসে তুমি বিশ্বাস মশায় আর তোমাদের হুঁকো-মুখো! বিরাট এক লেজার বুক!"

অমিয় হাসিয়া উঠিল।

"একটু দাঁড়াও ভায়ারা।" বলিয়া বিশ্বাস মহাশয় মোড়ের একটি পানওয়ালীর নিকট পান খরিদ করিতে গেলেন।

অমিয় বলিতে লাগিল—"আচ্ছা গাধা তো তুই! একটা স্বপ্ন দেখে অমন একটা দাঁও ছেড়ে দিলি? অমন সুন্দরী মেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরিও। কার ভাগ্যে জোটে অমন!"

বিশ্বাস মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া কথাবার্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ঠিক করলে না দাদা! বাজার বড় খারাপ। তা ছাড়া স্বপ্নে তুমি যাই দেখ, আমাদের আপিসে কাজ ক'রে সুখ পেতে। বড়বাবু আমাদের শিবতুল্য লোক। ...ও কি, তোমরা ওদিকে বেঁকলে যে! আমার শাড়িটা—!"

হাতঘড়িটা দেখাইয়া অমিয় বলিল—"মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আর। কাল নিশ্চয় কিনে দেব। আপনি আজ আটটার পর যাবেন কিন্তু—"

ছয়

আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গী। নানাবর্ণের সুদৃশ্য মোটরকার হইতে নানাবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত নানা জাতীয় মানব-মানবী অবতরণ করিতেছে। আনন্দের স্বপ্নলোক এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া পলাশ ত্বরিতপদে টিকিট কিনিতে গেল এবং সেই দিন সকালেই দাদার নিকট হইতে মনিঅর্ডার-যোগে প্রাপ্ত

দশ টাকার নোটখানা ভাঙাইয়া দুইখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ফিরিবার মুখে টিকিট-ঘরের প্রতি ধাবমান একটি লোকের সহিত অন্যমনস্ক পলাশের ধাক্কা লাগিয়া গেল, পলাশ মুখ তুলিয়া দেখিল। লোকটি আর কেহ নয়, কন্যাদায়গ্রস্ত হেরম্ববাবু। তিনিও স্বপ্নাতুর।

খড়মের দৌরাত্ম্য

ফ্রেঞ্চ-ফার্ট দাড়ি, দশ-আনা-ছ-আনা চুল, পরনে বিচিত্র লুঙ্গি, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ—এ-হেন লোকের নাম রাধাবল্লভ। পিতামহ-প্রদত্ত নাম। রাশিয়ায় শুনিয়াছি নাম বদলাইবার সুযোগ আছে। এ দেশেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে নিজেদের পছন্দসই নামকরণ করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভ একবার ম্যাট্রিক দিবার সুযোগ অবশ্য পাইয়াছিল, কিন্তু নাম বদলাইবার কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। পৃথিবীতে এই সব অঘটন কেন ঘটে তাহা বলা শক্ত। সেই দুরূহ গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে রাধাবল্লভের নামটা আরো একটু আধুনিক হইলে যেন মানাইত ভাল। কারণ রাধাবল্লভ সত্যই একজন আধুনিক যুবক। চিন্তায়, পোশাকে, কথায়-বার্তায় বিশেষ করিয়া উপার্জন ব্যাপারে রাধাবল্লভ একেবারে অতি-আধুনিক। ব্রিজ এবং ফ্লাশ খেলায় সুদক্ষ। এই পথে তাহার অর্থাগমও হয়। হয় বলিয়া রাধাবল্লভের মাতুল রাধাবল্লভের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ সিগারেট-সিনেমার খরচটা আর তাঁহাকে যোগাইতে হয় না। এই বাজারে তাহাও কম লাভজনক নয়।

দুই

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিবার পর হইতে রাধাবল্লভ তারুণ্য-চর্চা করিতেছে। তারুণ্য-চর্চা বলিতে কি বুঝায় তাহা এ যুগের পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বোঝেন। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। নিরঙ্কুশভাবে তাহার তারুণ্য-চর্চা চলিতেছিল। হঠাৎ একদিন বেচারা ঘা খাইয়া গেল।

মহাদেব-ঘায়েলকারী দুষ্ট দেবতাটি হঠাৎ একদা রাধাবল্লভ পোদ্দারকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অব্যর্থ শর-সন্ধান করিলেন। মদনাহত মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা সুবিদিত। মদনাহত রাধাবল্লভ পোদ্দার কি করিয়াছিল তাহা হয়তো অনেকে জানেন না। আমি জানি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেচারা ধারে খানিকটা স্নো কিনিয়া ফেলিয়াছিল। আয়না, স্নো এবং রাধাবল্লভ যখন পরস্পর-

পরস্পরে নিমজ্জিত, তখন কিন্তু পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন, আবেগ-জর্জরিত রাধাবল্লভ তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না।

তিন

পুঁটি নাম্নী যুবতীটিই একদা রাধাবল্লভের হৃদয়-নাট্যনিকেতনে বিনা নোটিসে ঝড়াৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া গেল ট্রামের জানালা গলিয়া। কখন পৃথিবীতে কি ভাবে যে কি ঘটে তাহা বলা দুষ্কর। পুঁটির সম্বলের মধ্যে অবশ্য তাহার বয়স। কিন্তু সেই বয়সটা কত—ষোল কি ছাব্বিশ—তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার পূর্বেই বেচারা রাধাবল্লভ মুগ্ধ হইয়া গেল। একবার মুগ্ধ হইয়া গেলে আর চালাকি চলে না। মন-রূপ অশ্বের মুখ হইতে মানুষ তখন যুক্তি-রূপ বল্গা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ঘোড়া চার পা তুলিয়া লাফাইতে থাকে। হইলও তাই। মুগ্ধ রাধাবল্লভ লুব্ধভাবে হ্যারিসন রোডে ঘুরিতে লাগিল। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। এমন তো কতবারই ঘটিয়াছে। হ্যারিসন রোডের ট্রামে আসিতে আসিতে কতবার কত মেয়েই তো রাধাবল্লভের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু ওই দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্তিনী পুঁটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একযোগে বলিয়া উঠিল, মোনা লিসা! আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সমস্ত নায়িকাগণ আসিয়া যেন রাধাবল্লভের মন-প্রাঙ্গনে শঙ্খ-হস্তে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল পুঁটিকে বরণ করিবার জন্য। এমন তো আগে হয় নাই।

এত বড় বিপর্যয় রাধাবল্লভের জীবনে আর কখনও হয় নাই। প্রেমে পড়িলে শোনা গিয়াছে জ্যোৎস্নাকে উত্তপ্ত এবং রৌদ্রকে হিমশীতল বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভের স্পর্শ-শক্তির কোন বৈকল্য ঘটিল না বটে, কিন্তু তাহার জনবহুল হ্যারিসন রোডকে নিতান্ত নির্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ওই দ্বিতল বাড়িটা ছাড়া যেন হ্যারিসন রোডে আর কিছুই নাই, বাকি সব হাওয়া—প্রেমাক্রান্ত রাধাবল্লভের এইরূপ ধারণা হইল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বোধ হয় রাধাবল্লভ সেদিন ঠিক হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে উর্ধ্বমুখ হইয়া শিস্-যোগে পুঁটিকে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। এমন সময় পিতামহ প্রজাপতির খড়মখানা সজোরে

আসিয়া লাগিল। কোথায় যে লাগিল, তাহা ঠিক করিয়া দেখিবার পূর্বেই বেচারা অজ্ঞান হইয়া গেল।

খড়মখানা আসিল অবশ্য 'লরি'রূপে।

চার

দয়ার শরীর ছিল বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি জীবনে বহুবার নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন। দয়ালু রামকিঙ্কর হাজরাও হইলেন। নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই হাবলি-মিণ্টা-পণ্টু-বিশু-খোকনের পিতা ছা-পোষা হাজরা মহাশয় অচেতন রাধাবল্লভকে আনিয়া নিজের বাহিরের ঘরটাতে স্থান দিলেন। পাশে যে সদ্য-পাস-করা নবীন ডাক্তারটি ছিলেন তাঁহাকেও ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তারবাবু রাধাবল্লভকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এঁকে নড়ানো উচিত নয়। নাড়া-চাড়া করলে মারা যেতে পারেন।" সুতরাং রাধাবল্লভকে হাসপাতালে পাঠাইবার উদীয়মান ইচ্ছাটি দমন করিয়া দয়ালু রামকিঙ্করবাবু বাড়িতেই তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। মনে দয়ার সঞ্চার হইলে পয়সা খরচ অনিবার্য। রামকিঙ্কর-বাবুকে গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া ডাক্তার ছোকরাটির নির্দেশ অনুযায়ী একটি আইস-ব্যাগ খরিদ করিতে হইল। যদিও হাজরা মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি তিনি মনে মনে কহিলেন, গেরো আর কি!

পাঁচ

দুই দিন পরে অচেতন রাধাবল্লভ চক্ষু খুলিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখে, দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি নয়, হাবলি।

সে চক্ষু মুদিল।

একটু পরে আবার খুলিয়া দেখে, পুঁটি নয়, হাবলি।

ফলের রস করিয়া দিল হাবলি।

ঔষধ খাওয়াইল হাবলি। পুঁটি কই?

রামকিঙ্করবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছে?"

"আজ একটু ভাল।" কি সুন্দর স্বর হাবলির!

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে হাবলি।

বিছানা কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দেয় হাবলি।

মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় হাবলি।

সব হাবলি।

আরও তিন দিন কাটিল।

পুঁটি নাই।

খালি হাবলি।

আবার খড়ম দেখা দিল।

এবার ছদ্মবেশে নয়, স্বরূপে।

রামকিঙ্কর হাজরার হস্তে।

পাশাপাশি

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চা ও পরনিন্দা করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব! আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির জন্য দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি; কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে। স্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততপক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ, মাছির জ্বালায় অস্থির! যেই একটু শুইব, ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে! এত মাছি আর এত গরম! স্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার একটু উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে ঠায় বসিয়া চিন্তা করাও তো মুশকিল! শুইলেই মাছি! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারবার আরক ছিটাইয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়তো হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন আচ্ছা চিন্তাশীল লোক তো!

পেটের চিন্তার মত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিন-রাত সেই চিন্তাই করিতেছি। চিন্তাশীল নই, আমি চিন্তাগ্রস্ত।

...ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয়, কলিকাতাই বেস্ট্ ফিল্ড্। চাকুরিও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এতকাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলিকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে, আমি কোন জমিদার-তনয়। তাহা নয়। বাবা শৌখিন লোক ছিলেন এবং সেইজন্যই সম্ভবত

কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা-দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুই

এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে, বিকাশবাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোনঝির খুড়-শাশুড়ীর ভাইপোর পিসতুতো শালার আপন ভায়রা-ভাই এই বিকাশবাবু। রীতিমত অঙ্ক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম-সাক্ষাতেইতাঁহাকে বলিয়া বসিলাম—"কি ভায়া, চিনতে পারছ!" ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, "অনেক দিন পরে কিনা! তাই একটু—মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?"

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম —"নাঃ, চিনতে পার নি দেখছি। চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে।—মানে, বাঁকুড়ারও ইন্‌টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের—" বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে ফরম্যুলাটা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম—"তুমি হ'লে গিয়ে আমাদের হেমন্তের ভায়রাভাই। আপন লোক সব কলকাতার গলি-ঘুঁজিতে প'ড়ে আছে—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠে না। এবার মনে করলাম, যাই, একটু বিকাশভায়ার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

কুলির মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন—"থাকবেন নাকি এখানে?"

"বেশীদিন নয়—দু-চার দিন।"

"ও!"

কুলি বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম, বিকাশভায়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ধৈর্য অবশ্য বেশীক্ষণ টিকিল না। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল।

কেহ বলে, লজেঞ্জুস্! কেহ বলে, ঘুড়ি চাই! কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল, তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুশী হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরাই শুধু জমাইতে পারে।

…বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

তিন

তিন দিন কাটিল। কলিকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম, আমার পরিচিত একজনও নাই। সহপাঠীগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্বে থাকিতাম তাহা এখন 'ডাইং ক্লিনিং' হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না, আমিও কাহাকেও চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্যুপরি তিন দিন এইরূপে কাটিল। বিকাশবাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন, যেন 'লেট' না হইয়া যায়। গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—ফিরিয়া বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসেন। কোন রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপড়াইয়া কল-তলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন—"ভাত বাড়। ওগো, শুনছ—লেট হয়ে যাবে—পৌনে নটা হ'ল—যেতেও তো আবার খানিকক্ষণ লাগবে—।" তাহার পরই ঊর্ধ্বশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোনদিন রাত্রি দশটা, কোনদিন এগারটা। সুতরাং বিকাশবাবুর সহিত আলাপ বেশীক্ষণ জমাইবার অবসর পাই না। ভাবি—কাজের মানুষ। বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকরিও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

চার

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক যখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে তখন বলিলাম—"ভায়া, আমিও তোমার সঙ্গে একটু বেরুব।"

"আমার সঙ্গে ? কেন ?"

"একটা কথা। মানে—"

"তা হ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার লেট হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"দরকারটা কি ?"

"অর্থাৎ—" কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

"টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না, সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।"

"না না, টাকাকড়ি চাই না। আচ্ছা, চল, ট্রামেই বলব এখন।"

"ট্রামে তো আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

"বেশ তো! চল, আমিও হেঁটে যাই। কতদূর ?"

"ইডেন গার্ডেন।"

"ইডেন গার্ডেনে আপিস ? কিসের আপিস ?"

"আপিস কে বললে আপনাকে ?" বলিয়া বিকাশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"তবে ?"

"আরে রামঃ, আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই ?"

"কোথা যাও তা হ'লে ?"

একটু ইতস্তত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন—"পালিয়ে যাই।"

নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিকাশবাবু বলিয়া চলিলেন—"বাবা কিছু টাকা fixed deposit রেখে গিয়েছিলেন—তাহার ৪০্ টাকা সুদ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারি নি। অথচ এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম! চলুন। লেট হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না।"

উভয়ে আবার খানিকক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশবাবু আবার বলিলেন—"বাড়িতে কথাটা ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেতে অ্যাপ্রেন্টিসি করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয়।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশবাবু বলিলেন—"পালিয়ে আসি। বুঝলেন না? বাড়িতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে সারাদিন ব'সে থাকা অসহ্য। সারাক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে। বাঁশী কিনে দাও, লজেন্স্ দাও, পুতুল দাও! পাশের বাড়ির ছেলের লাল জামা হয়েছে, সেই রকম জামা ক'রে দাও! গিন্নীরও নানা রকম আবদার আছে।—স'রে পড়ি। বুঝলেন না!"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—"বাড়িতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না! সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার প'ড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়িতে থাকলে হৈ-হৈ ক'রে একটা ডাক্তার-ফাক্তার ডাকতে হ'ত ধার ক'রেও। ছিলাম না—নিশ্চিন্ত। চলুন একটু পা চালিয়ে। ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে, সেইটেতে গিয়ে শুয়ে-ব'সে সারাদিনটা—বুঝলেন—লেট হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে সেটা দখল করে—বুঝলেন!"

পাশাপাশি দুইজনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায়!

বিদ্যাসাগর

বিদায় লইবার প্রাক্কালে বিনীত নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গেল—"ওই মোড়টায় ডিস্‌পেন্‌সারি খুলেছি মাস্টার মশায়, দয়া ক'রে যাবেন মাঝে মাঝে—"

"আচ্ছা।"

…স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

পুরাতন ছবি।

তখন টিউশনি করিতাম।

উপর্যুপরি কয়েকবার বি-এ ফেল করার দরুণই হউক অথবা শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎ লাভের ফলেই হউক—ধর্মে মতি হইয়াছিল। স্বামী চিন্ময়ানন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া হিন্দুধর্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতাম। বুঝিতাম কর্মজগতে যাহাই হউক, ধর্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়। দিনের পর দিন স্বামীজী যে সকল তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে শুনাইতেন সেগুলি এই গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রাসঙ্গিক তাহাই শুনুন।

একদিন তিনি জন্মান্তর-রহস্য প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিতেছিলেন। এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার!

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। স্বামীজীর বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাকে ধরিলাম—জন্মান্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটনের পন্থা বলিয়া দিতে হইবে।

প্রথমটা তিনি আপত্তি করিলেন।

ছাড়িলাম না।

শেষে তাঁহাকে বলিতেই হইল।

তাঁহার উপদেশানুসারে মুদিতনেত্রে নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিলাম।

জন্মান্তর-রহস্য-উদ্‌ঘাটন করিতেই হইবে।

ছাত্রের পড়া লইতেছিলাম।

"সাধু শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কি হবে?"

বলিতে পারিল না।

"মুনি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে কি হবে?"

পারিল না।

"নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কি হবে?"

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া একটা উত্তর দিল—ভুল উত্তর। ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া 'উপক্রমণিকা'খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

…এইরূপ প্রত্যহ।

হঠাৎ বাসনা হইল ছোকরা পূর্বজন্মে কি ছিল একবার দেখিলে হয়। আমার বিশ্বাস, হয় গাধা, না হয় গরু ছিল। স্বামীজীর প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা তো খুবই সহজ!

সেদিন গভীর নিশীথে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

এ কি—এ যে বিদ্যাসগর!

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর!

স্বয়ং 'উপক্রমণিকা'কার জন্মান্তর-রহস্যের ফেরে পড়িয়া নর শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছেন না! আশ্চর্য ব্যাপার!

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আমার আর শাসন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি—

অশ্রুজলে তাহার চরণ দুইখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা!

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম শাসন করিতে পারি নাই—সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।

ফলে সে ফোর্থ ক্লাস হইতে কিছুতেই প্রমোশন পাইল না।

আমার চাকরিটি গেল। ভাগ্যক্রমে অন্যত্র একটা কেরানীগিরি জুটিয়া গেল—চলিয়া গেলাম।

বছর পাঁচেক পরে আমার নূতন কর্মস্থলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সব কথা শুনিলাম। পড়া-শোনা ছাড়িয়া দিয়া দিনকতক সে শখের থিয়েটারে মাতিয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্রে নাকি উত্তম অভিনয় করিত! মেডেল পাইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু সে লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের এজেণ্ট। আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কোম্পানিতে—

আমার চোখে জল আসিল।

সাধ্যাতীত হইলেও কিছু ইন্সিওর করিলাম।

আবার আজ সে আসিয়াছিল।

চেহারাটা বেশ ভদ্র ভারিক্কি-গোছের হইয়াছে। বলিল, ইন্সিওরেন্সের দালালি করিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রাইভেট হোমিওপ্যাথি পড়িয়া সে ডাক্তার হইয়াছে এবং এই শহরে প্র্যাকটিস করিবে মনস্থ করিয়াছে। আমি যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

যথাসাধ্য করিব—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

নিষ্প্রয়োজনবোধে দুইটি খবর তাহাকে দিলাম না। খবর দুইটি এই—

(১) স্বামী চিন্ময়ানন্দ চৌর্যাপরাধে জেল খাটিতেছেন।

(২) আমি ক্রিশ্চান হইয়াছি।

পাঠকের মৃত্যু

প্রায় দশ বৎসর আগের কথা।

আসানসোল স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলাম। ঠিক আমার পাশেই আর একজন বসিয়া ছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বই ছিল। বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। আলাপ-পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে, ভদ্রলোককে ট্রেনের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমার ট্রেনেরও ঘণ্টা তিনেক দেরি ছিল।

আমরা উভয়েই বাঙালী।

সুতরাং পাঁচ মিনিট পরেই তাঁহাকে যে প্রশ্নটি আমি করিলাম তাহা এই—"আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন না—"

এই উত্তরই স্বাভাবিক এবং আশাও করিয়াছিলাম।

অবিলম্বে বইখানি দখল করিয়া বসিলাম।

দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহর।

আসানসোল স্টেশনের টিনের ছাদ।

সমস্ত কিন্তু তলাইয়া গেল।

উপন্যাস অদ্ভুত!

বহির মালিক ভদ্রলোক আড়নয়নে একবার আমার পানে চাহিয়া একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং একটি টাইম-টেবিল বাহির করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া চলিলাম।

চমৎকার বই!

বস্তুত এমন ভাল উপন্যাস আমি ইতিপূর্বে পড়ি নাই।

একেবারে যেন জুতাইয়া দিতেছে।

দুই ঘণ্টা কাটিল।

বহির মালিক ভদ্রলোক টাইম-টেবিলটি বারংবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার ট্রেনের তো আর বেশী দেরি নাই। এইবার—"

বলিয়া একটু গলা-খাঁকারি দিলেন।

আমি তখন তন্ময়।

চকিতে একবার হাতঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্ধেকের উপর বাকি। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

অদ্ভুত বই!

বাকি ঘণ্টাটা যেন উড়িয়া চলিয়া গেল।

আমার ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

বইয়ের তখনও অনেক বাকি।

রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।

বলিলাম "নেক্সট ট্রেনে যাব। এ বই শেষ না ক'রে উঠছি না।"

বহির মালিক ভদ্রলোক একটু কাশিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ট্রেন চলিয়া গেল; বই পড়িতে লাগিলাম।

শেষ কিন্তু করিতে পারি নাই।

শেষের দিকে অনেকগুলি পাতা ছিল না।

বহির মালিককে বলিলাম—"এঃ, শেষের দিকে এতগুলো পাতা নেই! আগে বলেন নি কেন? ছি-ছি—"

এতদুত্তরে ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম, তাঁহার রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

দুই

দশ বৎসর পরে উক্ত পুস্তকখানি আর একবার আমার হস্তগত হইয়াছিল। আমার ভাগিনেয়ীর শ্বশুরালয়ে।

তাহাকে পৌছাইতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই ফিরিয়া আসার কথা। কিন্তু বইখানির লোভে থাকিয়া গেলাম।

সুযোগমত বইখানি সংগ্রহ করিয়া আবার সাগ্রহে শুরু করা গেল। খাপছাড়া ভাবে শেষটুকু না পড়িয়া গোড়া হইতেই আবার জমাইয়া পড়িব ঠিক করিলাম।

কয়েক পাতা পড়িয়াই কেমন যেন খট্‌কা লাগিল।

উল্টাইয়া দেখিলাম—হ্যাঁ, সেই বই-ই তো!

আবার কয়েক পাতা অগ্রসর হইলাম—নাঃ, কেমন যেন গোলমাল ঠেকিতেছে।

তবু বই পড়িতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল—নাঃ, আর তো চলে না।

একি সেই বই, যাহা আমি আসানসোল স্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ঊর্ধ্বশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িলাম?

এমন রাবিশ মানুষে লেখে!

এ শেষ করা তো অসম্ভব।

দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়াছিল, টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।

দত্তমহাশয়

"ছোকরার গোঁফ উঠে নি এখনও ভাল ক'রে, এরই মধ্যে এই কাণ্ড! গোঁফ উঠলে না জানি—"

এই পর্যন্ত বলিয়া দত্তমহাশয় নয়নের দৃষ্টিকে নিজ গুম্ফমুখী করিলেন এবং একটি পাকা গোঁফ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট বিশ্বাসকে বলিলেন—

"আর ক'টা আছে দেখ তো হে! এঃ, এরকম ভাবে পাকলে তো ছদিনেই সব সাফ হয়ে যাবে দেখছি।"

"কই, আর নেই তো! যেটা ছিঁড়লে দেখি ওটা।"

ছিন্ন রোমটি দত্তমহাশয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যেই ছিল।

বিশ্বাসকে সেটি তিনি দিলেন।

বিশ্বাস সেটি নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে বলিলেন—"তুমি কাঁচা গোঁফগুলা অমন পট পট ছিঁড়ে ফেলছ কেন বল দেখি? এ গোঁফ কি পাকা? এ তো তামাকের ধোঁয়া লেগে অমন হয়েছে।"

দত্তমহাশয় ইতিমধ্যে আর একটি ছিঁড়িয়াছিলেন।

বলিলেন—"আচ্ছা, এটা দেখ তো।"

"এটা তো একেবারে ডাহা কাঁচা—তামাকের রঙ পর্যন্ত ধরে নি। আর ছিঁড়ো না।"

দত্ত দক্ষিণ চক্ষুটি বুজিয়া বক্রায়িত বাম চক্ষুর দৃষ্টিটিকে বাম গুম্ফপ্রান্তে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ওষ্ঠটিকে নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত করিয়া আবার নূতন শিকারের চেষ্টায় ছিলেন। বিশ্বাসের কথায় তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না; কিন্তু অচিরাৎ তৃতীয় একটি রোম তিনি মুখভঙ্গী সহকারে উৎপাটন করিলেন এবং সেটিও বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রথম প্রসঙ্গে উপনীত হইলেন।

"ছোকরা তা হ'লে মোকদ্দমায় পড়েছে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! তুমি শুনলে কোথা থেকে খবরটা? সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি স্টেশনের দিকে গিয়েছিলাম একবার বেড়াতে বেড়াতে, তখনি ছোকরার রকম-সকম দেখে কেমন যেন আমার সন্দেহ—"

এই পর্যন্ত বলিয়া দত্তমহাশয় থামিলেন।

বিশ্বাস তৃতীয় গোঁফটির সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করিলেন না। গা চুলকাইতে লাগিলেন।

দত্তমহাশয়ের মুদ্রাদোষ যেমন গোঁফ-ছেঁড়া, বিশ্বাসমহাশয়েরও মুদ্রাদোষ তেমনি গা-চুলকানো। শুধু চুলকাইয়াই তিনি নিরস্ত হন না। সর্বাঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি যেন আহরণ করিয়া আনেন, সেই আহরিত বস্তুটি আঘ্রাণ করেন এবং পরমুহূর্তেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সেটি ফেলিয়া দেন। তাহাই করিতেছিলেন।

দত্ত নাসিকার ঠিক নিম্নবর্তী গুম্ফগুচ্ছটি পর্যবেক্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি কি শুনে এলে ?"

কণ্ডুয়ন-নিরত বিশ্বাস উত্তর দিলেন—"ওই বাঁড়ুয্যে উকীল কাকে যেন রাস্তায় বলছে কানে এল—একটা মেয়েকে নিয়ে ছোটবাবু আমাদের কেসে পড়েছেন। ভাল ক'রে জিগ্যেস করি নি আমি—পথে আসতে আসতে কানে এল। স্টেশনে তুমি কি দেখেছিলে সেদিন ?"

দত্ত উচ্চস্বরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"দেখব আর কি! আমার মাথা আর মুণ্ডু! প্ল্যাটফর্মের ওপর ব'সে আছে দেখলাম জরিদার-ওড়না-পরা এক বাঈজী-গোছের সুন্দরী যুবতী। আর তার কাছে এক রোগা-গোছের বুড়ো। পাকা দাড়িতে মেহেদির রঙ লাগানো—গায়ে আধময়লা-গোছের পাঞ্জাবি আর পায়জামা। ওমর খৈয়াম কেতাবে যেমন সব ছবি থাকে আজকাল হে—ঠিক তেমনি। স্টেশনের ছোটবাবু দেখলাম ঘন ঘন চাইছেন সেদিকে। স্টেশনে আর জনপ্রাণী নেই।—বলিয়া দত্তমহাশয় আবার হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এত কথা বিশ্বাসটাকে না বলিলেই তিনি পারিতেন। কি দরকার ছিল!

বিশ্বাস অঙ্গ হইতে আহরিত বস্তুটি শুঁকিয়া কুঞ্চিত-নাসা হইয়া ছিলেন। দত্তের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিলেন—"ওই—ওই—ওড়না-পরা মেয়ে, আর লাল-দাড়ি বুড়োকেই আমাদের বাঁড়ুয্যে উকীল স্বচক্ষে আজ আদালতে দেখে এসেছে। আমাদের ছোটবাবু ছিল। তুমি যা বল, কথাটা ঠিকই দেখছি। গোল্লায় গেছে আজকালকার ছেলেগুলো।...আচ্ছা, তুমি অনর্থক ব'সে কাঁচা গোঁফগুলো ছিঁড়ছ কেন বল দেখি ?"

বিশ্বাসমহাশয় গত এক বৎসর হইতে দত্তের পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া

প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দত্ত ইহার প্রতিবাদ করেন না। বিশ্বাসের এই অত্যুক্তিটুকু উপভোগ করিতে করিতে তিনি পাকা গোঁফগুলি তুলিতে থাকেন। বিশ্বাসের কথায় ভুলিয়া পাকা গোঁফ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন তেমন কাঁচা ছেলে দত্তমহাশয় নহেন।

পাত্রী-পক্ষ পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া ভুল করিবে না।

বিশ্বাসও করিতেন না, যদি না তাঁহার যখন-তখন টাকা ধার লওয়ার প্রয়োজন থাকিত।

দত্ত বোঝেন সবই, বলেন না কিছু।

দত্তমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষটি গত হইয়াছেন।

তৃতীয় পক্ষের সন্ধানে আছেন তিনি।

দুইটি প্রধান অন্তরায়।

পাকা গোঁফ এবং অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা কন্যাটি।

কন্যার বিবাহ না দিয়া তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব।

কন্যাটির বিবাহ হইয়া গেলে দত্তমহাশয় স্বচ্ছন্দে শুভকার্যে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই মনোমত পাত্র জুটিতেছে না।

গা চুলকাইতে চুলকাইতে বিশ্বাস বলিলেন—"ছোকরা তা হ'লে বেশ ঘুঘু!"

দত্ত উঠিয়া গিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে ছোট হাত-আয়নাটি বাহির করিয়া আনিয়া গুম্ফরাজি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস আবার তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"জেল হওয়া উচিত, চাকরি যাওয়া উচিত—এসব লোকের। পাজি, চরিত্রহীন, বখাটে সব ছোকরা—"

বিশ্বাসের এত উষ্মার কারণ ছিল। তাঁহার ধারণা, তিনি স্টেশনের নবাগত ছোটবাবুটির নিন্দা করিয়া দত্তমহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। দত্তের কাছে আজকালকার ছেলেদের গালাগালি দিয়া বিশ্বাসমহাশয় বরাবর সুফল পাইয়া থাকেন। আজ তাঁহার কিছু টাকার দরকার। সুতরাং পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া এবং আজকালকার ছেলেছোকরাদের গালাগালি দিয়া—অর্থাৎ দুই-নলা

বন্দুক দিয়া বিশ্বাসমহাশয় লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্বে বহুবার তিনি এই পন্থায় সফলকাম হইয়াছেন।

দত্তর কিন্তু আজ কোন সাড়াশব্দ নাই।

গা চুলকানো বন্ধ করিয়া বিশ্বাস আড়চোখে একবার দত্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দত্ত উপরের ঠোঁটকে নীচের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া নিবিষ্টমনে দর্পণে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিয়াছেন।

বিশ্বাস ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, দত্তমহাশয়ের মনের প্রসন্নতা ঠিক ততদূর পর্যন্ত হইয়াছে কি না, যতদূর হইলে নির্ভয়ে টাকার কথাটা পাড়া যায়।

সুতরাং গা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি আর একটি গুলি ছাড়িলেন।

''আজকালকার ছেলেরা, বিশেষতঃ ওই খদ্দরধারীগুলো—"

হঠাৎ দত্ত আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া চক্ষুর দৃষ্টি বিশ্বাসের দিকে ফিরাইলেন।

বিশ্বাসের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

চক্ষু দুইটি যেন দুইটি জলন্ত অঙ্গারখণ্ড।

এ কি হইল!

চক্ষু যাহাই হউক, মুখে কিন্তু দত্তের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন—"টাকার দরকার আছে নাকি? আজ আমার হাতে টাকা নেই বিশ্বাস।"

বিশ্বাস মনে মনে মরিয়া গেলেন।

মুখে কিন্তু বলিলেন—''না, টাকার দরকার নেই—"

কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর বসা বৃথা। বিশ্বাস পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, দত্ত আজ চটিল কেন, এমন তো কখনও হয় নাই!

দুই

একটু পরেই দত্তের বৈঠকখানায় বাঁড়ুয্যের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহারও

আগমনের কারণ টাকা। দত্তের নিকট তিনিও আসিয়াছিলেন টাকা ধার করিতে। হঠাৎ দরকার পড়িয়া গিয়াছে।

উকীল হইলেও বাঁড়ুয্যে স্পষ্টবক্তা, সাদা-সিধা মানুষ।

দর্পণ-হস্তে গুম্ফচয়ন-নিরত দত্তকে তিনি বলিলেন—"আরে, উপড়ে কি আর ওর কিনারা করতে পারবে? তার চেয়ে ও আপদ কামিয়ে ফেল—"

দত্ত কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

প্রতিবাদ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। যে যাহা বলে শুনিয়া যান, যেটুকু স্মরণযোগ্য মনে করিয়া রাখেন, বাকিটা অপর কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দেন। সোজা হিসাব। তর্ক করিয়া লাভ কি? বাড়ুয্যে কাজের কথা পাড়িলেন।

"শ-পাঁচেক টাকা দিতে পারবে হে? হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব, স্থদও দেব—"

দত্তমহাশয় কুসীদজীবী এবং সেই কারণেই ধনী।

সুতরাং নিঃসঙ্কোচে মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কত স্থদ দেবে?"

"যত চাও। মাসখানেকের মধ্যেই শোধ ক'রে দেব।"

দত্তমহাশয় আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, স্টেশনের নতুন ছোটবাবুটির নামে মোকদ্দমা হয়েছে নাকি একটা মেয়েকে নিয়ে? জানো তুমি?"

"হ্যাঁ, জানি বইকি—আমিই তো উকীল ছিলাম রেলের পক্ষের। কিছুই নয়, একটা বাঈজী আর তার সঙ্গে এক সারেঙ্গীওলা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল—ছোটবাবুটি তাদের ধ'রে চালান দিয়েছিল। ছোকরা ভারি অনেস্ট। অপর কেউ হ'লে দু-চার পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিত।"

দত্ত আবার আয়নাটি তুলিয়া গোঁফ দেখিতে লাগিলেন।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—"দেবে নাকি টাকাটা?"

"এখুনি চাই?"

"পেলে তো ভালই—"

দত্ত তৎক্ষণাৎ কোমর হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া দেওয়ালে প্রোথিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাণ্ডনোট-ফ্যাণ্ডনোট দিতে চাও দিও—স্থদ আর দিতে হবে না

তোমাকে। বামুনের কাছ থেকে এ ক'টা টাকার কি আর সুদ নেবু এক মাসের জন্যে?"

"অনেক ধন্যবাদ।"

বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেলেন।

তিনিও পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, দত্ত আজ হঠাৎ এমন দিলদরিয়া হইয়া উঠিল কেন?

তিন

আধুনিক ছেলেদের নিন্দা করিলে দত্ত খুশী হইত; কিন্তু বিশ্বাস আজ দত্তকে খুশী করিতে পারে নাই। বাঁড়ুয্যের স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি বাড়ুয্যের উপর চটা; অথচ তাহারই উপর আজ তিনি প্রসন্ন হইয়া বিনা সুদে বিনা হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিয়া দিলেন।

কারণ ছিল।

মূল কারণ—সেই তৃতীয় পক্ষ।

স্টেশনের ছোটবাবুটিকে দেখিয়া দত্তমহাশয়ের ভাল লাগে। স্বজাতি এবং পালটি ঘর শুনিয়া তিনি ছোটবাবুর পিতার ঠিকানা সংগ্রহ করেন। পত্রযোগেই তিনি নিজ অনূঢ়া কন্যাটির সহিত ছোটবাবুর বিবাহ প্রায় পাকাপাকি করিয়া আনিয়াছেন। কুষ্ঠি মিল হইয়াছে, দেনা-পাওনাও প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। দত্তমহাশয়ের চাপা স্বভাব। গোপনেই তিনি সব করিতেছিলেন। হঠাৎ সেদিন স্টেশনে বেড়াইতে গিয়া, ওই বাঈজী মাগীকে দেখিয়া দত্তমহাশয়ের মনে দারুণ খটকা লাগিয়া যায়। ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভাল তো? আজকালকার ছেলে, বলা তো যায় না। ছেলেটিকে দেখিলে ভাল বলিয়াই তো মনে হয়।

যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পাত্রের অর্থাৎ ছোটবাবুর পিতাকে তিনি পত্র লিখিলেন যে, অবিলম্বে তিনি যেন আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া যান। উঃ, বিশ্বাসটা মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল!

পত্রখানি লিখিয়া দত্তমহাশয় আবার দর্পণটি তুলিয়া লইলেন এবং ভ্রূকুটিকুটিল

মুখে গোঁফ জোড়াটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া দর্পণটি রাখিয়া পাঁজি খুলিয়া হঠাৎ পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একটি পাতায় আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এবং সেই পাতা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আর একটি পত্র তিনি লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—"পয়সার মায়া করলে চলবে না, ভেস্তে যাবে সব—"

দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিলেন কলপের জন্য।

মিস্টার মুখার্জি

মিস্টার মুখার্জি কবে যে আমাদের আড্ডায় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাহা মনে নাই। এইটুকু শুধু মনে আছে, স্বর্গীয় মধুমামা একদিন তাঁহাকে আমাদের আড্ডায় লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে তিনি ধূমকেতুর মত আমাদের আড্ডায় আসেন যান। তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমরা কেহ জানি না।

লোকটির বিশেষত্ব আছে।

তাঁহার কথাবার্তা শুনিলে মনে হয় যেন সমস্ত দুনিয়াখানা তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি সেটা গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারেন—ফেলিয়া দিতে পারেন—পকেটেও পুরিতে পারেন। সম্প্রতি লুফিতেছেন—তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রায়ই তিনি তুড়ি মারিয়া বলিয়া থাকেন—"ওসব আমি থোড়াই কেয়ার করি, বুঝলেন!"

বুঝি তো সবই।

মুখার্জি যে একজন উঁচুদরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু আমরা কেহ কোনদিন মুখার্জির কথার প্রতিবাদ করি নাই। করি নাই, কারণ তাঁহার মিথ্যা কথাগুলি শুনিতে বেশ লাগিত। এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত আর্টিস্ট ছিলেন। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট চেহারা। ক্ষৌরির অভাব মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট। আধময়লা সাহেবী পোশাক গায়ে। শুনিয়াছি লোকটি বিলাত-ফেরত, পৃথিবীর অনেক দেশ নাকি দেখা আছে—নিজেই এসব বলিতেন। লোকটি নিতান্ত মূর্খ যে নন তাহা অবশ্য তাঁহার কথাবার্তাতেই বোঝা যাইত। তিনি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি ডবল এম-এ। তিনবার প্রফেসারি পাইয়া নাকি ত্যাগ করিয়াছেন—ইত্যাদি।

একদিন তিনি বলিতেছিলেন—

"মহাত্মাজির সঙ্গে সেদিন দেখা—গাড়িতে। থার্ড ক্লাসের একটি কোণে ব'সে ব'সে তক্‌লি ঘোরাচ্ছেন—আমাকে দেখতে পেয়ে একটু মৃদু হাসলেন। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে প'ড়ে গেল বোধ হয়। উনি যখন আফ্রিকায় যান তখন আমিও সেখানে কিনা—খুব জমাতুম দু'জনে। দেখলাম ভদ্রলোক চিনেছেন আমাকে।

এগিয়ে গেলাম। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে প'ড়ে গেল। ভাবলাম একটু ইয়ার্কি করা যাক। বললাম—মহাত্মাজি, আপনি যে দেশসুদ্ধ লোককে নিরামিষাশী হতে বলেছেন, তার আর একটা দিক ভেবে দেখেছেন? সবাই যদি আপনার কথা শোনে তা হ'লে আর একটা গুরুতর সমস্যা যে দেখা দেবে, তা ভেবে দেখেছেন?''

মহাত্মাজি বললেন—"কি সমস্যা?"

আমি বললাম—"ছাগল-সমস্যা। ওদের না খেয়ে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে এই কৃষিপ্রধান দেশের। ছাগলে একবার যে গাছে মুখ দেয় সে গাছের দফা-রফা। এক-একটা ছাগলের ক'টা বাচ্চা হয় বছরে জানেন?"

এই পর্যন্ত বলিয়াই মুখার্জি বলিয়া উঠিলেন—"এক্সকিউজ মি, আমাকে উঠতে হবে এখুনি। বাইরের ঘরের টেবিলে আমার পার্সটা ফেলে এসেছি, তাতে একটা হাজার টাকার চেক আছে—যদিও ক্রস্‌ড্, তবু—"

মিস্টার মুখার্জি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কলিকাতার কোন্ অঞ্চলে যে তিনি থাকেন তাহা কেহ জানিত না। কেহ বলিত বালিগঞ্জ, কেহ বলিত বেলেঘাটা। ভবেশ, পানু প্রভৃতির দৃঢ় বিশ্বাস বৌবাজার অঞ্চলেই কোথাও থাকেন তিনি। পরদিন তাঁহাকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনার বাসাটা কোন্‌খানে মিস্টার মুখার্জি?" হাসিয়া তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"মঙ্গলগ্রহে এখনও জমি কিনে উঠতে পারি নি। এই পুরনো পৃথিবীতেই এখনও বাস করতে হচ্ছে এই যা দুঃখ। কাশ্মীরই বলুন আর সুইজারল্যাণ্ডই বলুন—সব এক। নিউইয়র্কে, রোমে, প্রাগে, বার্লিনে, টোকিওতে, এমন কি ভল্‌গা নদীর তীরেও কাটিয়ে এসেছি বহুদিন—সর্বত্রই সেই বুড়ী পৃথিবী—একঘেয়ে। এরোপ্লেনটার আর একটু উন্নতি হ'লেই দেখবেন দলে দলে লোক অন্য প্ল্যানেটে পালাবে। ওহো, বাই জোভ্—উঠতে হ'ল এবার—মিসেস্ নাইডুর সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে—'"

সকলকে বিস্মিত করিয়া মুখার্জি প্রস্থান করিলেন।

সেদিনও আসিয়াছিলেন এবং সেদিনও বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বার্নাড শ, বলডুইন্, ব্লুম, সেক্সপীয়র, গ্যেটে সকলকে ছাতু করিতে করিতে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল যে, আমেরিকার জনৈক কোটিপতির একমাত্র কন্যার জন্য উড়িষ্যার কারিগরের কাজ-করা একজোড়া মিনা-করা দুল পাঠাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত আছেন।

পরশু দিন ভুল জোড়া উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছে—আজ এয়ার-মেল ডে; সুতরাং আমরা যেন তাঁহাকে এক্সকিউজ করি।

লোকটা বেশীক্ষণ কিছুতেই বসিত না।

ধূমকেতুর মত আসিত এবং চলিয়া যাইত।

লোকটা চালিয়াৎ, মিথ্যাবাদী—সবই বুঝিতাম।

তবু বেশ লাগিত।

আমাদের আড্ডায় সেদিন একটু আহারাদির আয়োজন ছিল। উপলক্ষ—পানুর প্রেমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। পানু তাহার প্রেমাস্পদাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। পাশের একটি রেস্তোরাঁ হইতে দেশী-বিদেশী নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনানো হইয়াছে। ভবেশ আবেগভরে "স্বর্গ হতে বিদায়" আবৃত্তি করিতেছে, বিমলদা দক্ষিণ চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশিতে 'নি' পরদায় সুর খেলাইয়া করুণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, বিকাশ টেবিলে তবলা বাজাইতেছে, জগু গ্লাসে গ্লাসে শরবত ভরিতেছে, পানু প্লেটগুলি সাজাইতেছে, আমি এক কোণে বসিয়া কড়ে আঙুলের কড়াটা কাটিতেছি—অর্থাৎ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় মিস্টার মুখার্জি আসিয়া হাজির।

পানু সোল্লাসে বলিল—"বাঃ, ভালই হয়েছে, মিস্টার মুখার্জিও এসে পড়েছেন। আপনার ঠিকানাটা ঠিক জানি না তো যে, আপনাকে খবর দেব। আজ আমদের একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন আছে। মিস্টার মুখার্জি—"

করজোড়ে মুখার্জি বলিলেন—"মাপ করবেন, খেতে পারব না কিছু। সন্ধ্যের সময় এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে মিস্ মিউলের সঙ্গে দেখা। অষ্ট্রেলিয়ায় আমার টেনিস পার্টনার ছিল। ছাড়লে না কিছুতে—ফির্পোতে ঢুকে গিলতে হ'ল ওর সঙ্গে ব'সে। ফির্পোতে অনেকদিন ঢুকি নি—ভয়ঙ্কর ডিটিরিওরেট্ করেছে আজকাল। মিস্ মিউলের পাল্লায় প'ড়ে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। কি আর করি! অনেকদিন পরে দেখা। তা ছাড়া মেয়েটার সম্বন্ধে আমার একটু সফ্‌ট্ কর্নারও ছিল সেকালে—হা—হা—হা—"

ভবেশ বলিল—"তবু খান কিছু। অন্তত এক গ্লাস শরবত—"

"খেতাম। শরবত কেন, আরও অনেক কিছু খেতাম। কিন্তু মিস্টার আচারিয়ার ওখানে আমার আবার আজ নেমন্তন্ন যে! জেপ্যানো এশিয়াটিক

সেফ্‌টিপিন কোম্পানি একটা ফ্লোট করবে নাকি! তারই একজন পাণ্ডা হবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করছে আচারিয়া—যত সব ফ্যাসাদ জোটে আমারই ঘাড়ে। আমি আইডিয়ালিস্ট মানুষ, 'না' বলতে পারি না চট্‌ ক'রে। আচ্ছা, উঠি এবার—এক্সকিউজ মি—" মুখার্জি চলিয়া গেলেন।

সেদিন আড্ডা ভাঙিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

ট্রাম নাই—পদব্রজেই বাড়ি ফিরিতেছি।

একটু দূরে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে মনে হইল একটা লোক হাতে ঝোলানো একটি ব্যাগ লইয়া মদনানন্দ মোদক ফিরি করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি মিস্টার মুখার্জি। ডান হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়া 'চাই মদনানন্দ মোদক' বলিয়া মাঝে মাঝে হাঁক দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিন্তু অপ্রতিভ হইলেন না। সপ্রতিভভাবেই বলিলেন—"জিনিসটা ভাল, আমি নিজে উপকার পেয়েছি ব'লে সাধারণ পাঁচজনের উপকারের জন্যে এই ব্রত গ্রহণ করেছি। হজমির এমন ওষুধ আর হয় না। দেখবেন একটু খেয়ে?"

আমি নির্বাক্ হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার চমক ভাঙিল যখন মিস্টার মুখার্জি তাঁহার ডান হাত দিয়া সহসা আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"একটা অনুরোধ—একথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়তো জিনিসটা ঠিক বুঝবে না। ভাববে, হয়তো অভাবে প'ড়েই—"

বহুদিন কাটিয়াছে। মিস্টার মুখার্জিকে আর দেখি নাই। আর আমাদের আড্ডায় তিনি আসেন না।

খুড়ো

খুড়োর জন্যে সকলেই চিন্তিত হইয়াছিলাম।

খুড়োর সহিত আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। কিন্তু খুড়োর মত আপনার লোকও আমাদের বড় বেশী ছিল না। খুড়ো বয়সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। চুল গোঁফ পাকিয়াছে এবং পাকিয়া নিজেরাই বেকুব বনিয়া গিয়াছে। খুড়োর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গ্রামের সকলেই খুড়ো-অন্ত প্রাণ।

একটি লোক ছাড়া।

তিনি খুড়ীমা।

আজ সকালে তিনি ঝাঁটা মারিয়া খুড়োকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। বিপন্ন খুড়ো চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

মাধব ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল—"খুড়ো, ব্যাপারটা কি বল তো ?"

খুড়ো কিছুক্ষণ নীরব।

একটু পরেই কিন্তু খুড়োর চক্ষু দুইটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন —"লেপ-তোষক ছিঁড়ে গেছে, তা আমি কি করব বল দেখি ? পুরনো জিনিস ছিঁড়বে না ?"

"বেশ তো, নতুন লেপ-তোষক করান আবার।"

"পাগল হয়েছিস্ তোরা ! ওই লেপ-তোষকে বেশ চ'লে যাবে এ বছর। তা ছাড়া টাকাই বা কোথা ?...যা যা, তোরা বাড়ি যা—ওসব আমাদের নিত্যি লেগে আছে। একটু পরেই মিটে যাবে। বাড়ি যা তোরা।"

আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাড়ি গেলাম না।

খুড়ীমার কাছে গেলাম।

খুড়ীমা যাহা বলিলেন, তাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।

গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন; লেপ-তোষক সম্বন্ধে খুড়োর ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই।

"তোমরাই দেখ না বাছা, এই লেপ গায়ে দেওয়া যায়, না, এই তোষকে মানুষ শুতে পারে? সামনে এই দুরন্ত শীত—পোড়ার-মুখো নিজেই যে নিমুনিয়া হয়ে মরবে সে খেয়াল নেই। বললেই একটি মুখ হাসি হেসে বলবে, 'ওতেই চালিয়ে নাও এ-বছরটা।' ঝাঁটা মারি অমন হাসির মুখে! কচি খোকা!"

লেপ-তোষকের অবস্থা দেখিলাম সত্যই জরাজীর্ণ।

নবাবগঞ্জের জমিদারের মৃত্যু হওয়ার পর হইতে খুড়োর অবস্থা সত্যই খারাপ হইয়াছে। নানা সদ্‌গুণের জন্য নবাবগঞ্জের জমিদার মহাশয় খুড়োকে যথেষ্ট। খাতির করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঁচ বিঘা লাখেরাজ জমি হইতে খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার জীবিতকালে খুড়োর অন্যান্য অভাবও তিনি মিটাইতেন তাঁহার পুত্র আধুনিক যুবক। এ জাতীয় বাজে খরচ তিনি পছন্দ করেন না। আত্মসম্মানী খুড়োও নবাবগঞ্জের জমিদারবাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন।

খুড়ীমা কিন্তু মেয়েমানুষ, এত সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধার ধারেন না।

তাঁহার যুক্তি সহজ—শীত পড়িয়াছে, লেপ-তোষক চাই।

খুড়ীমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম, খুড়োকে এবার শীতে কষ্ট পাইতে দেওয়া হইবে না। দুই টাকা করিয়া চাঁদা দিলে লেপ-তোষক হইয়া যাইবে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া গিয়া দেখি, খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহা-উৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।

আমাদের দেখিলেন: "কি রে—আবার ফিরলি যে তোরা?"

"শুনুন।"

খুড়ো উঠিয়া আসিলেন।

"কি?"

তাঁহার হাতে কুড়িটি টাকা দিয়া বলিলাম—"আপনি আজই শহরে চ'লে যান। লেপ-তোষক তৈরি করিয়ে আনুন।

"টাকা কোথা পেলি?"

"সে পরে বলব এখন। এগারটায় 'বাস' ছাড়বে, ওইতেই চ'লে যান আপনি—বিকেল নাগাদ হ'য়ে যাবে লেপ-তোষক তৈরি করাতে; সন্ধ্যের বাসে ফিরতে পারবেন। যান।"

"তার মানে?"

"না না, যান আপনি—ও লেপ-তোষকে এ-বছর আর চলবে না। আপনি চ'লে যান—বুঝলেন?

খুড়োর হাতে নোট দুইটা গুঁজিয়া দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। একবার পিছু ফিরিয়া দেখিলাম, বিস্মিত খুড়ো নোট দুইটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম, খুড়ো নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরিয়াছেন। দেখিয়া আসা যাক—কি রকম লেপ-তোষক হইয়াছে! খুড়োর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ির কাছাকাছি যাইতে শুনিলাম, খুড়ীমা তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন। ব্যাপার কি?

আমি বাড়ি ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—"দেখ তো ভাই, জিনিসটা ভাল হয় নি? আঠারো টাকায় এমন জিনিস কি পাওয়া যায়?"

দেখি, খুড়ো একটি সেতায় হাতে বসিয়া আছেন।

অক্ষমের আত্মকথা

সে যেদিন আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল, সে-দিনের কথা আমি ভুলি নাই। অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখখানি আমার বুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সে কি কান্না! কোন কথা নয়—খালি কান্না! অন্ধকার ঘর! সূচীভেদ্য অন্ধকার!—সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সে আর আমি একা। আর কেহ নাই। তাহার অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্ধকার থমথম করিতেছে।

আমি নির্বাক্।

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন অন্ধকার নয়—সেদিন জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যে উন্মাদনা সে প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও ভাষা নাই। তাহার বুকের স্পন্দন আমি শুনিয়াছিলাম। উন্মত্ত সে স্পন্দন। তাহার স্পন্দিত বক্ষ আমার সর্বাঙ্গে যে শিহরণ তুলিয়াছিল, তাহা তাহাকে বলি নাই। বলিলেও সে বুঝিত না! বলিলেই কি লোকে সব কথা বোঝে? তা ছাড়া আমি বলিতেই পারিতাম কি?

আর একদিনের কথা।

সে উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। আমি পাশেই ছিলাম। নির্জন দ্বিপ্রহর। সে একখানা বই পড়িতেছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম তাহাকে। কি অপূর্ব তাহার দেহখানি—যেন প্রস্ফুটিত একটি শতদল! পরিপূর্ণ যৌবন-নদী দেহের কূলে কূলে উদ্দাম হইয়াছে। বেশ-বাসের আবরণ তাহাকে অল্প যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওই তুচ্ছ শাড়িটা তাহার যৌবন-স্পর্শ পাইয়া নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। টকটকে চওড়া লালপাড়টা মর্মান্তিক রকমের লাল। অন্যমনস্ক হইয়া সে হাতটা একবার আমার উপর রাখিল। আমার সমস্ত শরীরে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, তাহা সে বুঝিল কি?

বুঝিল না।

আমারও বলিবার ভাষা ছিল না।

কোনদিন তাহাকে কিছু বলি নাই। অথচ তাহার নিত্যসঙ্গী ছিলাম। তাহার সুখ, তাহার দুঃখ, তাহার উত্তেজনা, তাহার অবসাদ—সবই অনুভব করিতাম। সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। সে কিন্তু একদিনও, এক নিমেষের জন্যও আমার কথা ভাবিত না।

ভাবিত না ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভাবিবে কেন?

মানবী ছলনাময়ী।

অবশেষে সে আসিল।

যাহার আশায় তাহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাহার বিরহে তাহার নয়ন-পল্লবে অশ্রু নামিত, যে পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহ-দোলায় এতদিন দুলিতেছিল, সে একদিন সশরীরে বরবেশে আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে অধিকার করিল।

আমি কিছু বলিলাম না। আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেম-সম্মিলন নীরবে দেখিলাম।

পৃথিবীতে এইরূপ হইয়া থাকে।

আমি দেখিতে কেমন জানি না। হয়তো খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ আছে—আমিও অনুভব করি। আমি দেখিতে খারাপই তো! আমার সারা গায়ে ময়লা। যদিও সপ্তাহ-অন্তর আমার বহিরাবরণ একবার করিয়া বদলানো হয়, তবু এ কথা লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি আমার অঙ্গ মলিন। তেল চিটচিটে ময়লা। কেন? তাহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে আমি অক্ষম। কল্পনায় আমি বিলাসী—কিন্তু কি করিব,

আসলে আমি যে বালিশ। ছোট তাকিয়া মাত্র। আমার কোন হাত নাই; তাহার দুঃখের অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিয়াছে, সুখের স্পন্দনে সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, তাহার গোপন প্রেমলিপিকা সে নির্ভয়ে আমারই তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার অন্তরের সমস্ত নিগূঢ় বার্তাই আমি জানিতাম—তবু সে আমাকে হেলায় ত্যাগ করিল এবং বরণ করিল মানুষকে!

তাহার কতটুকু সে চেনে!

ক্যানভাসার

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সেই সময়টিতেই ক্যানভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে এই স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন—"যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে, তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

"মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—"

ভৈরব ফিরিয়া দেখে, একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট সুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যানভাসার হীরালাল।

ক্যানভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার শহরে যাইবার কথা। যাইতেওছিল—কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু 'বিজ্‌নেস্‌' হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল—"আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই ?"

"মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে—"

"তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে ? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—"

"ব্যবহার ক'রে দেখুন—ভাল মাজন—"

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল—"কচু !"

হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে না, ভাল মাজন। ব্যবহার ক'রে দেখুন—"

হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল—"আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি ?"

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

"মাজন নেবেন কি এক কৌটো ?"

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল—"সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন ?"

বলিয়া সে নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল—"বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল—"তাতে আপনার কি ? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে। ওসব মাজন-ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না—"

হীরালাল ক্যানভাসার হলেও রক্ত-মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল—"আপনিই কি এই গ্রামের মালিক ?"

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব

বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যা নাই তাহা সত্য ; কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে, কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এইসব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দুষ্কর—দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ ফেলিয়া ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে।"

''গাঁ থেকে বার ক'রে দেবার কে মশাই আপনি শুনি ?''

ভীম গর্জনে ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান—"

''আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি মশাই।''

ইহার পরই কিন্তু ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল—''আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরীব মানুষ—এই ক'রেই কষ্টে-স্বষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—"

হতভম্ব নির্বাক্ ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল—"আচ্ছা, দিন এক কৌটো মাজন!"

বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি—অসম্ভব ভিড় !

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া পরম শাক্ত কালীকিঙ্কর বর্মা পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্মবিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্মার কৃষ্ণ বর্ণ, রক্ত চক্ষু, কপালে টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌরবর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ দাড়ি, চোখে নীল চশমা, খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেতচন্দনের তিলক।

মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন—"যাই বলুন আপনি, ধর্মসাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা একটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষে ও পারে না—পারা উচিতও নয়—"

অট্টহাস্য করিয়া বর্মা বলিলেন—"রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু শুনি? 'পৈশাচিক' কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনও? মুণ্ডমালিনী মহাকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?"

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট মশাই। ওর বেশী ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম—"

এমন সময় ঘচাং করিয়া ট্রেনটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

স্টেশনে শসা ফেরি করিতেছিল। বর্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া কিছু শসা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়িতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রীবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়া ছিল তাহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেন ছাড়িলে গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে মাদলের এক প্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই-একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা

সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন—"একটু যদি স'রে দাঁড়াতে বাবা দয়া ক'রে—"

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটির সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল-আন্দোলন হইতে নিজের নাসা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথার তির্যক ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্মা মহাশয় বলিলেন—"তোমরা ব'সে পড় না হে! দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু! যে যেখানে আছ ব'সে পড়।"

একটু ইতস্তত করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার শুরু করিলেন—"এই যে মাদল—অপূর্ব জিনিস এ। বৈষ্ণব ধর্মেরও অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী। আপনার ধর্মে দেখান দিকি এমন জিনিস! আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া—"

নাকের উপর ঠকাস্ করিয়া আঘাত দিয়া মাদল-বাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না।

বর্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আবার দাঁড়ালে কেন গো?"

"আজ্ঞে, পরের ইষ্টিশনেই নামব।"

"সে তো এখন দেরি আছে।"

মাদল-বাদক কিন্তু আর বসিল না। পরের স্টেশন পর্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের স্টেশন আসিল। গাড়ি ঘচাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নাকে লাগিল। একটুর জন্য চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেন থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু বর্মা আর গোস্বামী। বর্মা বলিলেন—"এ-হে-হে-হে—আপনার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল যে! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত! এ কি বিড়ম্বনা!"

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন—"আসল জিনিস কি জানেন মশাই? অর্থ। পয়সা নেই ব'লেই না এই থার্ড ক্লাসে ভিড়ে চড়েছি—তাই না এ দুর্দশা! অর্থ না থাকলে ধর্ম-টর্ম কিছু টেঁকে না—"

অট্টহাস্য করিয়া শসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্মা মহাশয় বলিলেন—"যা

বলেছেন! অর্থ নেই ব'লেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়ে শসা কেটে খেতে হচ্ছে। খাবেন নাকি শসা?"

"দিন। সবই অদৃষ্টের রহস্য!"

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শসা খাইয়া নামিয়া গেলেন, তখন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে, গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র—অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল।

অন্তর্যামীর কাণ্ড

ঘুম যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি গভীর।

বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলাম এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি করিলাম—"বাঁচা গেল।" গাড়ি একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। যখন উঠিয়াছিলাম ভীষণ ভিড় ছিল। এখন আমি তো রাজা! একলম্ফে নীচে নামিয়াই কিন্তু রাজত্ব ঘুচিয়া গেল। উপরন্তু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

বাঙ্কের ঠিক নীচেই একটি তরুণী বসিয়া।

একাকিনী।

আমার হাতে একখানা বই ছিল। বইটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া অকারণে কামরাটার অপর প্রান্তে সোজা চলিয়া গেলাম এবং জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রহিলাম।

অন্তর্যামী মন কহিল—মেয়েটি সুবিধার নহে।

রাগ হইতে লাগিল। কোথা হইতে জুটিল এ?

গাড়িটা খালি দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, গান গাহিব। যদিও আমি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী নহি, কিন্তু ট্রেনে চড়িলে এবং চেনাশোনা লোক কাছে না থাকিলে আমি গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া থাকি। মেয়েটি যদিও চেনাশোনা নয়, কিন্তু অন্তর্যামী মন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—ইহার সম্মুখে গান গাওয়া চলিবে না।

চোখে কয়লার গুঁড়া পড়িল।

মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইতে হইল। কয়লাক্রান্ত চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে দেখিলাম, মেয়েটি আমার পুস্তকটি অধিকার করিয়াছে, পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছে এবং মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

অন্তর্যামী মন ভুরু নাচাইয়া বলিল—বলিয়াছিলাম তো! পরিচয় হইতে দেখিলাম, মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। শাশুড়ীর অসুখ হওয়াতে স্বামীর টেলিগ্রাম পাইয়া যাইতেছে। সঙ্গে কোন লোক না থাকাতে ইচ্ছা করিয়াই ভিড়ওয়ালা গাড়িতে চড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সকলেই মনে করিবে কেহ-না-কেহ একজন ইহার সঙ্গে আছে। গাড়িটা একেবারে খালি হইয়া যাওয়াতে একটু মুশকিল হইয়াছে। যাক, পরের স্টেশনেই নামিবে।

পরের স্টেশন আসিল।

মেয়েটি নামিয়া গেল। একা বসিয়া আছি। মেয়েটির কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া অন্তর্যামী মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। এমন সময় চোখে পড়িল, বেঞ্চির নীচে কি যেন একটা রহিয়াছে। মেয়েটি ফেলিয়া গেল নাকি? তাড়াতাড়ি টানিয়া বাহির করিলাম। ছোট একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। ভিতরে কাপড় দিয়া কি যেন ঢাকা রহিয়াছে।

কাপড়টা খুলিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম।

ভিতরে একটা মরা শিশু।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম।

ক্রূর হাসি হাসিয়া অন্তর্যামী মন বলিল—দেখিলে তো!

পরের স্টেশনে গাড়ি থামিল।

ভাবিলাম, নামিয়া যাই। উঠিতে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম, খাকি হাফশার্ট-হাফপ্যাণ্ট-পরা একটি লোক তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিলেন, সঙ্গে একজন পুলিস কনস্টেবল। সর্বনাশ! হাফপ্যাণ্ট-পরা ভদ্রলোক রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"আরে বেকুব, কাঁহা পর রাখ্‌খা?"

"ওহি তো বা,—বিরিঞ্চি কা নীচে—" বলিয়া কনস্টেবল বেঞ্চির নীচে কেরোসিন কাঠের বাক্সটা দেখাইয়া দিয়া নামিয়া গেল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। আমার নামা হইল না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। তিনি দারোগা। ক্রমশ মৃত শিশুর ইতিহাসও শুনিলাম। দারোগা সাহেব শিশুটিকে তাঁহার এলাকায় কুড়াইয়া পাইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে একটি লোককে তিনি গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। শিশুটিকে সদরে পোস্টমর্টেম করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। এই কনস্টেবলের জিম্মায় জিনিসটা দিয়া তিনি এতক্ষণ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ঘুমাইতেছিলেন। কনস্টেবলটা এমন বেকুব যে, একটা থার্ড ক্লাস কামরায় বেঞ্চির নীচে ওটাকে রাখিয়া দিয়া নিজে বেশ ইণ্টার ক্লাসে ঘুমাইতেছিল। যদি নষ্ট হইয়া যাইত! একে তো এই রকম ভাবে লইয়া যাওয়াটাই একটু বে-আইনি। অন্তর্যামী মন দেখিলাম, মেয়েটির সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দারোগা বেচারীকে লইয়া পড়িয়াছে এবং বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—বুঝিয়াছি। ব্যাটা ঘুষখোর কোথাকার!

স্ত্রী-চরিত্র

গভীর রাত্রি।

মশারির মধ্যে শুইয়া শ্রীমতী স্থনন্দা একটি মাসিক পত্রিকায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পাশেই শ্রীযুক্ত তমালকান্তি পাশ-বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া নাক ডাকাইতেছে। বলা বাহুল্য হইলেও বলিব, উহারা স্বামী-স্ত্রী। এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। সন্তানাদি এখনও কিছু হয় নাই।

স্থনন্দা রোজই এইরূপ করে, অর্থাৎ শুইবার সময় একখানা বাংলা বই লইয়া মাথার শিয়রে আলো জ্বালাইয়া বিনিদ্র নয়নে পড়িতে থাকে। তমালকান্তিও রোজ এইরূপ করে অর্থাৎ নির্বিবাদে ঘুমায়।

মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ স্থনন্দার নজরে পড়িল, একটি গল্পের নাম "গল্প নহে"। আশ্চর্য নাম তো! লেখকের নাম নাই। স্থনন্দা পড়িতে শুরু করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমশ স্থনন্দার মন নির্মলা নাম্নী মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ছোকরাটির উপর স্থনন্দার প্রথমটা রাগ হইয়াছিল, কিন্তু সে রাগও বেশীক্ষণ টিকিল না। বিশ্বনাথ যখন বিদায়কালে নির্মলার দুইটি হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন স্থনন্দার রাগও জল হইয়া গেল। বিশ্বনাথ নির্মলাকে পাইল না—পাইল কাদম্বিনীকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—

বিশ্বনাথ নামক যুবকটি গ্রীষ্মের ছুটিতে মাতুলালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে অন্য কোন কাজ না থাকায় সে পুষ্করিণীতীরে গিয়া আড্ডা গাড়িল। উদ্দেশ্য মাছ ধরা। একদিন ফাতনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেচারা প্রায় অন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ফাতনা ডুবিল এবং বিশ্বনাথ মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড এক খ্যাচকা টান দিয়া বঁড়শি তুলিয়াই একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"ওগো—মা গো—"

সচকিত বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখে, বঁড়শি একটি কিশোরীর কাপড়ে গিয়া আটকাইয়াছে। বলা বাহুল্য, কিশোরী আর কেহ নহে—নির্মলা।

এই শুরু।

তাহার পর ভদ্রভাবে যত প্রকারে প্রেমালাপ করা সম্ভব তাহা ইহারা করিয়াছে

এবং করিত, যদি না বিশ্বনাথের মাতুল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধক-স্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ প্রথমটা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বেচারা একা কি করিবে! সে বড় জোর মাতুলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু সমস্ত সমাজকে ঠেকানো তাহার সাধ্যাতীত। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ এবং নির্মলা কায়স্থ। সুতরাং নির্মলার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিল না।

বেশ লিখিয়াছে গল্পটি। নির্মলার জন্য সুনন্দার ভারি কষ্ট হইতে লাগিল। আলো নিবাইয়া সুনন্দা যখন শয়ন করিল, তখন নির্মলার দুঃখে একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়নে টলমল করিতেছে। কী নিষ্ঠুর সমাজ!

দুই

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে তমালকান্তি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তুমুল কাণ্ড। বেচারা ডেলি-প্যাসেঞ্জার; সকালে উঠিয়াই স্নানাহার করিয়া আটটা সাতান্নর লোকাল ট্রেনে আপিস চলিয়া যায় এবং সাতটা বিয়াল্লিশের লোকাল-যোগে ফিরিয়া আসে।

সুনন্দার এমন ভাবান্তর ইতিপূর্বে সে লক্ষ্য করে নাই। মুখখানি তোলো হাঁড়ির মত করিয়া সুনন্দা বসিয়া আছে। তমাল আসিয়া ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল।

মুখে একটিও কথা নাই। জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে তমাল ভাবিতে লাগিল, ব্যাপার কি!

মিনিট পাঁচেক পরে এক পেয়ালা গরম চা হস্তে সুনন্দা প্রবেশ করিল। মুখ তখনও তোলো হাঁড়ি।

তমাল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল—"দেখ, আজ গাড়িতে 'পুষ্পসুরভিসার' ব'লে একটা মাথার তেল বিক্রি করছিল। রোজই করে। কাল

মনে করছি কিনে আনব এক শিশি। গন্ধটাও ভাল, আমাদের মল্লিক মশাই বলছিলেন যে মাথাও নাকি বেশ ঠাণ্ডা রাখে।"

সুনন্দা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

তমাল বুঝিল, গতিক সুবিধার নহে। হঠাৎ হইল কি! চা নিঃশেষ করিয়া তমাল বাহিরে গিয়া দেখে, সুনন্দা তাহার অর্ধসমাপ্ত উলের মাফলারটা লইয়া বুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তমাল হাসিয়া বলিল—"আজ এত গম্ভীর যে! সমস্ত মুখখানা আজ এমন থমথম করছে কেন? ব্যাপার কি?"

সুনন্দা আর আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। বোমার মত ফাটিয়া পড়িল।

"আমার কাছে সোহাগ জানাবার দরকার কি? যাও না তোমার নির্মলার কাছে, যার হাত ধ'রে বিয়ের আগে কেঁদে বলেছিলে—'আমার মন তোমায় দিয়ে গেলাম নির্মলা। বিয়ে করতে চলল এই দেহটা। সমাজের নিষ্ঠুর হাড়িকাঠে বলি দিতে চললাম নিজেকে'।"

বিস্মিত তমাল কহিল—"নির্মলা কে! পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি!"

সুনন্দা কিছু না বলিয়া 'গল্প-প্রভাকর' নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিখানি স্তম্ভিত তমালের হস্তে তুলিয়া দিল।

সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার "গল্প নহে" নামক গল্পটি এই মাসে প্রকাশিত হইল। এক সংখ্যা 'গল্প-প্রভাকর'ও আপনার নামে অদ্য পাঠাইলাম। গল্পটি প্রকাশ করিতে নানা কারণে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আর একটি গল্প চাই। ইতি—

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ তালুকদার

বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তমালের মনে পড়িয়া গেল যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে উক্ত গল্পটি সে 'গল্প-প্রভাকরে' পাঠাইয়া ছিল বটে। তাহার পর তমালের বিবাহ হইয়াছে, চাকরি হইয়াছে, সাহিত্য-চর্চা সে বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই গল্পটির কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ হঠাৎ এ কি আকস্মিক বিপদ!

আমতা আমতা করিয়া তমাল বলিল—"ওটা একটা গল্প লিখেছিলাম বটে অনেকদিন আগে। তাতে হয়েছে কি?"

"গল্প ? তুমি তো নিজেই লিখে দিয়েছ 'গল্প নহে' !"

তমাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ওটা একটা—ইয়ে—স্টাইল—বুঝলে কিনা—"

সুনন্দা কিছুই বুঝিল না। বুঝিতে সে চায়ও না। নির্মলার ঠিকানাটা জানিতে পারিলে একবার গিয়া দেখিত, মেয়েটি কেমন রূপসী। স্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন ঠিক সেইরূপ কি না!

ঈর্ষায় তাঁহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল। অথচ এই কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও নির্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিল।

থিওরি অব্ রিলেটিভিটি

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিলাম। আমার ধার আছে, গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরানীগিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব করিয়া বেড়াই, কলেজে আমার অপেক্ষা যে-সব সহপাঠী নিম্নস্তরের ছিল কর্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বির জোরে উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে—এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমার সর্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ হইয়াছে এই বুড়ীটা। এই বুড়ী তাহার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি, সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই বুড়ীটা না সরিলে···আঃ, কি মুশকিল!

পীড়িতা মাসীমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থরগতি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এই জাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে অর্ধমলিন-পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন—"রাস্তাটা থেকে স'রে দাঁড়ান একটু। বাথরুমে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া ক'রে।"

যথাসাধ্য দেহ-সঙ্কোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক বাথরুম হইতে প্রত্যাবর্তনের মুখে বলিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ওধারে চলুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওদিকে কি জায়গা আছে?"

"আহা, চলুনই না—"

বুড়ীর সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—"বসুন, আমার এই তোরঙ্গটার ওপরই বসুন। আসল স্টিল—আপনার মত দশজন বসলেও এর কিছু হবে না।" তোরঙ্গটির চেহারা ভালই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার

কিছু ছিল না। বস্তুত আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন —"আমার জিনিস ভাল না দিলে নিস্তার আছে ছগগনলালের? তার মনিব হ'ল গিয়ে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়া ছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—"তাই নাকি?"

"তাই নাকি মানে? ছগগনলালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিস দেয়? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হ'ল গিয়ে আমার খাতক।"

ভদ্রলোককে খুশী করিবার জন্য আমি আবার বলিলাম—"হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।"

ভ্রূযুগল উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি!"

নিরীহভাবে বলিলাম—"টাকা কুড়ির তো কম নয়ই। কত?"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা-হা করিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—"আপনার দোষ নেই, হয়তো আসল দাম ওই রকমই হবে। আমি গণ্ডা বারো পয়সা দিয়েছিলাম।"

সত্যই অবাক্ হইয়া গেলাম।

"বলেন কি? বারো আনা?"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"তাও নিতে চায় না। ছগগনকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে একটা টাকা দিয়েছিলাম, তার থেকেও চার গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগগনলালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইঁহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"যদিও আমি সাধারণ মানুষ কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না—" বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চির নীচে হইতে এক জোড়া ব্রাউন রঙের ভাল ডার্বি শু বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—"এর দাম কত হবে বলুন তো?"

"পাঁচ-ছ টাকা তো মনে হয়।"—ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

"রায় মশায় কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশী কিছুতে নিলেন না

কারণও অবশ্য আছে। রায় মহাশয়ের ছেলের চাকরিটা এক কথায় ক'রে দিলাম কিনা। টমসন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

চকিতের মধ্যে বুঝিলাম, এই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক সামান্য নহেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ির বাতিটা জলিয়া উঠিল। আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ির অপর প্রান্তে দেখিলাম, সেই বুড়ীটা বেঞ্চিটার উপর জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়ীটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দুই

"ওটা কি পড়ছেন ?"

"ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।"

ভদ্রলোক কোণে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছিলাম।

ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুস্‌কি দিতে দিতে বলিলেন—"কার লেখা ?"

"পান্নালাল চক্রবর্তীর।"

"মেয়েটি লেখে ভালই। কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—"

"পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ নাকি ?"

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মেয়েমানুষ শুধু নয়, একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী !"

আমি সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যুতের মত একটা পুলকিত শিহরণে সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা আমার ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে বলিলেই পর্যাপ্ত হয় না, তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা দেখিতে পাই, সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ—তন্বী—গৌরী—যুবতী !

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"টুনি তো এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্যন্ত ফ্রক প'রে বেণী দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বেশ চালাক-চতুর। এক কথায় ও-রকম মেয়ে আমি এদেশে বড় একটা দেখি নি—"

বলা বাহুল্য, কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম ?

"ওর মত ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম, স্বাধীন দেশে জন্মালে ও-মেয়ে একটা রিজিয়া এলিজাবেথ হ'ত। অন্তত-পক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা-স্টার। ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্যে অস্থির হ'ল—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভূষণ কে ?"

"ভূষণ হ'ল গিয়ে টুনির বাপ। বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে। বিয়ের পর ও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন।"

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন।

মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—"টুনি—পান্নালাল চক্রবর্তী—হেঁ!"

একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল।

আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়া ছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাহার মুখ দেখা গেল না। অনুমান করিলাম, কোন মাড়োয়ারী হইবেন।

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারংবার একটি কথাই মনে হইতেছে, পান্নালাল চক্রবর্তী তন্বী—গৌরী—যুবতী!

তিন

ধপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয়—বাঙালীই। খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থূলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামলাইয়া লইয়া একজোড়া বড় বড় সদ্য-ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম, তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'স্টেট্স্‌ম্যান' লইয়া "ওয়ান্টেড" পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেন আসিয়া ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া মাটির ভাঁড়ে খানিকটা চা যোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাতলা ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে এ কি, পান্নালালবাবু যে! কোথা যাচ্ছেন?"

খোঁচা গোঁফের মালিক হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কোন্নগর।"

"দেখা হয়ে গেছে যখন, তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ও-বেলা যাবেন। এ-বেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্য-চর্চা করা হয় নি। এ মাসের 'কাহিনী-কুঙ্কুম' কাগজে আপনার "চল্‌তি চাকা" পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা!"

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?

কিন্তু না, থার্ড ক্লাস গাড়িতে উবু হইয়া বসিয়া এক ভাঁড় বিশ্রী চা হস্তে স্বপ্ন দেখাও তো সম্ভব নয়। "চল্‌তি চাকা" গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং 'কাহিনী-কুঙ্কুম' এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শুনিলাম, ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—"আপনিই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী?"

ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্বে বলিলেন—"হ্যাঁ, ইনিই।"

ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—"নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা হ'ল! এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তা হ'লে? আচ্ছা, নমস্কার।"

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন। ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

● প্রথম শতক ●

মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্রাঙ্কের মালিকের দিকে রুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম।

সংক্ষেপেই বলিলাম—"এটা কি রকম হ'ল?"

"কোন্টা?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করিলেন।

"বাঃ, কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন, পান্নালাল চক্রবর্তী একজন মেয়েমানুষ, তাকে আপনি চেনেন—অথচ—"

নির্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"আর কি কি বলেছিলাম?"

"আর বলেছিলেন আপনার ওই ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা, জুতোর দাম চার আনা—"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"যিনি বলেছিলেন তিনি চ'লে গেছেন। আমি অন্য লোক।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

"অন্য লোক মানে?"

"অর্থাৎ আমার 'অ্যাঙ্গল অব ভিশন্' মানে কিনা দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্য প্রকার।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না—"

সহসা ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এক মুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বলুন? কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল হয়তো পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ—ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি, পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়ছে এই ট্রাঙ্ক ও জুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তেরো ও পৌনে সাত টাকা দিয়েছিলাম। 'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'—বুঝলেন না?"

বুঝিলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ গাড়ির অপর প্রান্ত হইতে শুনিলাম—

"আরে বাবুয়া, তু কাঁহা?"

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়ীটা আমাকে ডাকিতেছে।

রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই এখন চিনিলাম, মাসীমার বাড়ির পুরাতন দাই রুক্‌মিনিয়া! মাসীমারা যখন বেহারে ছিলেন তখন হইতে রুক্‌মিনিয়া মাসীমার বাড়িতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসীমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ীর কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ী 'মহাবীরজী'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসীমা যাহাতে ভাল হইয়া যান। মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজীর 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম।

'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'ই বটে!

মুহূর্তের মহিমা

দেখা যাক, এইবার কি করে!

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরগন খাঁ হাতের গুলি পাকাইতে লাগিলেন আসল নাম অবশ্য গুরগন খাঁ নয়, আসল নাম কালীকান্ত। কিন্তু গুরগন খাঁ নামেই প্রসিদ্ধি। কারণ তিনি পুরাকালে 'চন্দ্রশেখরে' গুরগন খাঁর চরিত্র অভিনয় করিয়া বহু নরনারীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছিলেন।

বর্তমানে গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।

মুখে স্থচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তদুপযুক্ত গোঁফ।

রঙ বাদামী।

চক্ষু তীক্ষ্ণ।

বুকময় চুল।

—ইহা কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।

আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান শিক্ষিত।

জমিদার।

অপত্নীক।

মাংসাশী।

দুই

শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী।

তাহার একটি রোগা গরিব-গোছের ছোকরাকে পছন্দ।

গুরগনের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি থাকিতে ওই পিলে-রোগা ছেলেটা!

ঘৃণায় তাঁহার সর্বাঙ্গের পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিত

এক চড় মারিলে তাহার মুণ্ডটা যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু মুণ্ড উড়াইবার চেষ্টা গুরগন করেন নাই।

বরং ভদ্রভাবেই নানাপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

অর্থাৎ ভাঙা মোটা গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধিয়াছেন।

জরিদার নাগরা পরিয়াছেন।

স্নো ঘষিয়াছেন।

জুলফি পর্যন্ত রাখিয়াছেন।

কিন্তু অবিচলিতা শ্রীমতীর দৃষ্টি রোগা ছোকরাটির উপরই স্থির-নিবদ্ধ।

গুরগন আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।

তিন

আজ বৈকালে শ্রীমতী আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ছিলও। কিন্তু সে থাকা না-থাকারই সমান।

গুরগন বেশ বুঝিতেছিলেন, তাহার মন পড়িয়া আছে সেই রোগাটার কাছে গুরগন ডাকিয়াছেন বলিয়া সে আসিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে গুরগনের অবাধ্যতা করিয়া এ গ্রামে টেকা মুশকিল।

হঠাৎ গুরগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া গোবিন্দ-লালী ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই ;

তাহা না হইলে—এই রিভলভার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্যদীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিল—"অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি ?"

ভীমগর্জনে গুরগন কহিলেন—"তিনুকে খুন করব।"

তিনু মানে সেই রোগা ছোকরাটি।

শ্রীমতী বলিল—"আচ্ছা, তা হ'লে আমাকে ভাববার সময় দিন একটু। একা ভেবে দেখতে চাই। আপনি একটু ও-ঘরে যান। যাবার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।"

আবেগ কম্পিতকণ্ঠে গুরগন কহিলেন—"কতক্ষণ ভাবতে চাও?"

"দশ মিনিট।"

"বেশ।"

স্খলিতচরণে গুরগন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চার

দেখা যাক, এইবার কি করে!

স্ফীতপেশী গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট চিন্তার পর শ্রীমতী বলিয়া গিয়াছে যে, আজ রাত্রে সে আসিবে। ঠিক দশটার সময় যেন গাড়ি পাঠানো হয়।

ঘড়ির দিকে গুরগন চাহিয়া দেখিলেন, মাত্র নটা বাজিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।

উঃ!

পিপীলিকায় দংশন করে নাই।

অধীর গুরগনের প্রণয়ীসুলভ অনুচ্চ কাতরোক্তি।

হঠাৎ গুরগনের হাসি পাইল—ভয়ঙ্কর হাসি পাইল।

রোগাটার কি দশা হইবে? আহা বেচারী!

বেচারী?

দারুণ ক্রোধে গুরগনের দন্তগুলি কড়মড় করিয়া উঠিল।

স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল বাঁদরটার!

আবার দর্পণে গুরগন নিজের পেশীবহুল দেহটার পানে চাহিলেন।

মুখে স্মিতহাস্য।

পাঁচ

দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

গাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে গুরগন সাগ্রহে প্রতীক্ষমান।

মনের অবস্থা ?

উপমা দিতে হইলে বলিতে হয়, যেন কেতলিতে জল ফুটিতেছে।

সহসা গলির মোড়ে গাড়ির শব্দ হইল।

দুইটা ঘোড়ার আটটা খুর যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

থামিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে।

পর্দার কাছে আসিয়া একটু থামিল, তাহার পর পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শ্রীমতী !

শ্রীমতীর মুখ দেখিয়া গুরগনের উদ্যত প্রেম স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সজলকণ্ঠে শ্রীমতী বলিল—"আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে এলাম।"

"কি কথা ?"

"তিনুকে আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো ?"

"না।"

দুইজনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত।

সেই কয় মুহূর্তে কি ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরগন বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি যাও।"

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরগনের মনে হইল, এ কি করলাম ? হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম ?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল ? কে এ ?

আশ্চর্য !

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার খুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেনে অসম্ভব:ভিড়।

তিলধারণের স্থান হয়তো আছে, মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি, এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবী-পোশাক-পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ান নহেন। সামন্ত মহাশয় তো নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বার কয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিন রাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারেন নাই।

কাল তো অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে, না, ঘুমাইবে!

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন—"ওরে দাঁড়া!"

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ান নহেন, তাহা ঠিক, কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

"টেরেনে তো আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর। যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চ'ড়ে পড়ি—"

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—মূর্খলোক হয়তো বুঝিতে পারে নাই—তাই।

বলিলেন—"ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো—"

'ফাস্‌টো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন—"আজ্ঞে, ওটাতে নয়, এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে তো গদি-মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়ো মানুষ—গরীব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ—বিশ্বাস করুন, হুজুর, তিন রাত্তির ঘুম হয় নাই—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়ে মুখ বাহির করিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নাই, সেদিকে সূতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ, চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোমচর্ম নির্লোম মুখখানি বিনয়-গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতিফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন—"এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্যে ও-কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রিটি সাহেবী-পোশাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

"ছ্যাট কান্‌ট্ বি। আই কান্‌ট্ অ্যালাউ।"

সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন—"আমিও তো হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি! অনুমতি যদি করেন দয়া ক'রে—"

এই বৃদ্ধের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দানে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ—

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

"শুনলেন হুজুর, এইটাতেই চড়লাম আমি। 'কুক'কে পাঠিয়ে দেন—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওরে, আন্ আন্—এইটাতেই আন্ সব—ওহে কালীকিঙ্কর—শ্যামাপদ কোথায়—বাঞ্ছা, ও বাঞ্ছা—এই দিকে—এইখানেই চড়াও সব—"

হৈ-হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা, কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বঁটি, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট-বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি এবং এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঞ্ছাকে বলিলেন—"তুই তা হ'লে ওই পাশের কামরায় থাক্ গিয়ে। তোরই মজা হ'ল রে! তামাক-টিকে সব গুছিয়ে রাখ্।"

বাঞ্ছা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

খেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর। কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার কেনা-বেচা করতে হবে।"

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবী ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু'র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু'র নির্দেশমত নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবদ্ধ করিলেন।

যদি কেহ গণিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবী ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইওর টিকেট প্লীজ।"

"মাউ টিকেট ইজ ইন মাই স্যুটকেস। প্লীজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।"

"আই কাণ্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড? মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেট্‌স্।"

অবশেষে দেখা গেল, বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বেশীক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি!

ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায়!

দুর্গা—শ্রীহরি—

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'ক্রু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে যে, বাঙালী বাবুদের সে ভাল করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুলহীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

"ও কুরু মহাশয়,—বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি! কটা টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন—"

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি!

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন—"আপনিও তো হুজুর কলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামত।"

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রু'র দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন—"কটা বাঙালী আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন্ দিশি ভদ্রতা রে বাপু! দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—"

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

শরশয্যা

শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণ-কারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

…ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন…দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি?…সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি…কলেজের স্পোর্টে সকলের সেরা ছিলাম…কিন্তু শরীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ, যদি নারীত্বের মর্যাদা না রক্ষা করিতে পারি?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে—উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলা আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলা তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি!…দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে —সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। একজন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে…ছি-ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায় বহু সন্তরণশীল, ব্যায়ামশীল, লম্ফনশীল বীরপুরুষের ছবি দেখি—ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেশের যৌবন চঞ্চল হইয়া

উঠে ; অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত, না, মৃত! অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম। ...ঝাঁৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর একটা গাড়ি আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, যে স্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্তী হইয়াছে। স্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এদেশে আর কখনও আসি নাই। চাকুরির চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরি জুটিতে পারে।

দুই

এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। স্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম, শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম, হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌছানো গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, দ্বিতলে একটি কুঠরি দিলেন, এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়াও দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন

আবার কুরুক্ষেত্র-সমর বাধিয়াছে।

নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট, সুতরাং আমার পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কি রকম পাকে-চক্রে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রৌপদীধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবি করিতে হইতেছে। একটি ঘুষিতে মোহান্ধ

ধৃতরাষ্ট্রের নাসিকা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে অপূর্ব কৌশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্যচ্যুতিকর ব্যাপার। ...সহসা সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আর দুর্যোধনকে দেখিয়া দেঁতো হাসি হাসিতে হইবে না—দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না —ধৃতরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছি। শরশয্যা ফুলশয্যা নহে। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি রোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছে। সহসা মনে হইল, আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না! কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা। স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট।...তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টর্চটা জ্বালিয়া দেখি, সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছানো রহিয়াছে! অগুনতি ছারপোকা! দেওয়াল বাহিয়া সারি সারি আরও নামিতেছে। সর্বনাশ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া যাইব কি না ভাবিতে লাগিলাম।...অদ্ভুত স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল। আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।...একেবারে অক্ষৌহিণী!

চার

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলাম। বাহিরে চাহিবামাত্র কর্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম, ঠিক নীচের গলিটাতে চেক্-কাটা লুঙ্গি-পরা একটি গাঁট্টা-গোট্টা-গোছের লোক একটি বাড়ির জানালায় উঁকি দিয়াই চোরের মত সরিয়া গেল, যে-জানালায় লোকটা উঁকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার দ্বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম, একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে—পরনে একটি আধ-ময়লা কাপড়—কোলের কাছে একটি শিশু। ঘরে আর কেহ নাই।...চকিতের মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে—সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহা জীবনে সে

আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতি পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে। রাস্‌কেল্‌! সর্বাঙ্গ জলিয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বৎসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব। আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড! কিন্তু উপায় কি! ইনিই আমার শ্বশুরের পরিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল—"আপনার কাছেই এসেছি—বিমলবাবুর জামাই আমি।"

ভদ্রলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ও, বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি?"

"ওই হোটেলে—"

"আচ্ছা, কাল সকালে দেখা ক'রো।"

ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা, যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশী করিয়া মিশে নাই।

স্কুলে পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিঙে, আর তকু থাকিত বাড়িতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই-দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইয়াছিলাম, একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওই তকুকে যেমন করে হোক হটাতে হবে। পারবে তো?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না, তকু কি বস্তু!

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন—"ওই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে ভাল ছেলে, কিন্তু হাজার ভাল হলেও পাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরিজীতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না!"

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ। তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই। সেইজন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তকু ছিল কবি—সে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ করা ভাল ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্স্ট হওয়ার গৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমি রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্স্ট বয়, আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের একজন উদীয়মান কবি। তফাতটা যে কি এবং কত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে, তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

দুই

ক্রমশ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইল যে, স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহ-কোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর একজন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। 'অসাধারণ রূপ' বলিতেছি, কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমন সুন্দরী সত্যই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোখ মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রঙ—সেও অতিশয় অপূর্ব। চাঁপাফুলে গোলাপী আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর-দশেকের মেয়ে—অবাক্ হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া। আমার সহিত কথাই বলিল না। আচারে ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল যে, আমাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কি-ই বা ছিল! সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল! তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম—লিখিয়াছে, মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক, সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি ভাল পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম—"ভাল পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানাশোনা একটি ভাল পাত্র আছে; কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল তো সম্বন্ধ করি।"

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

পাঁচ

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম. এ. পড়িতেছি। আশ্চর্য মানুষের মন! হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর একজন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস মিত্র। আমার সহপাঠিনী।...আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরীতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিস মিত্র আমার সমীপবর্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণতঃ যেভাবে ঘনিষ্ঠতর হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। মিস মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখে মুখে এমন একটা মার্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিলাম যে, মনে রঙ ধরিয়া গেল।...ক্রমশ দেখিলাম তাহার অনুপস্থিতিতেও আমি তাহার কথা চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলাফেরা লক্ষ্য করিতেছি, কোন্ কোন্ রঙের শাড়ি পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

ছয়

যখন মিস মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে—আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ হইবে—এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

বলিলাম—"সে কি সম্ভব?"

তকু বলিল—"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই, সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল? অসাবধানে স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে—ছি-ছি, কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল! মা বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতেও সাহস পাই না যে!" বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম—"না ভাই, এখন আর সে হয় না। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। চল্, মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—"

মানপুর গেলাম।

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি—"কক্ষনো তুমি আমায় ভালবাস না—কক্ষনো না। একদিনও বাস নি, বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ। কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ—কেন—কেন—কেন—কেন—"

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

"শোন—একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—"

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে তাহার এ মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া কদাকার! অসাবধানে স্টোভ জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই তাহার পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

তকুর বাড়ি প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারেই। সুতরাং ক্রমশ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়াছিল—"দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফার্স্ট হয়?"

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম—"হ্যাঁ।"

উত্তরে সে কি বলিল, শুনিবেন?

"বই মুখস্থ ক'রে ফার্স্ট সবাই হতে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি?"

মনে পড়িতেছে একটু সলজ্জ গলা-খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম—"আমি তোমার দাদার মত নই তো। হতেও চাই নি—"

"পারবেনই না।"

দশ বছরের মেয়ে!

তিন

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম, দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়িটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—না হয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত, যেন সে প্রণয়ীর মুখপানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল—মাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সেই সদ্যজাগ্রত যৌবনে—বেশী বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত, যে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গীতে

কথায় বার্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য প্রেমের নিয়ম! আমি ঠিক তাহাদের পালটি ঘর ছিলাম, আমার ভাল ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত—বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে, তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল—"আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলবেন না! নিজের চেহারাটা কখনও দেখেছেন আয়নায়?"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।...সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে, অত বড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব করিবার মত রূপ আছে সে তাহা লইয়া গর্ব করিবে বইকি! রূপসী মাত্রেই গরবিণী। গর্বটা সৌন্দর্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর মনের নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি!

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেট ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশোনায় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—তাহার পর পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

চার

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া আরও ঝড়ঝাপটা গেল—বাবা মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আর আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করিতে

ঘটনাচক্র

শ্রীমতী উষা সেন আধুনিক মহিলা।

অর্থাৎ বি. এ. পাস করিয়াছেন, ট্রামে বাসে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই নানা দোকান ঘুরিয়া পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক বেহায়াপনা বা লজ্জা কোনটাই নাই। সাহিত্যে অনুরাগ আছে। কোন্ লেখক ভাল, কোন্ লেখক মন্দ সে বিষয়ে নিজের একটা স্পষ্ট মতামত আছে। চেহারা? সুন্দরী না হইলেও মোটের উপর সুশ্রী বলা চলে। আধুনিক বেশবাসে সজ্জিতা হইয়া তিনি যখন পথেঘাটে বিচরণ করেন, তখন অধিকাংশ দর্শকই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সংক্ষেপে, শ্রীমতী উষা—বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।

একটি বিষয়ে শ্রীমতী কিন্তু সাবেক-পন্থী। তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং সে বিবাহও আধুনিক রীতি ও রুচি অনুযায়ী হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য অন্নদা সেন—উষা সেনের বাবা অন্নদাবাবু। ভদ্রলোক সনাতন-মতাবলম্বী। তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার কন্যা মণীন্দ্রমোহন নামক সহপাঠী কৈবর্ত-যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তখন তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া, শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছর তিনেক হইল ডাক্তারী পাস করিয়া কলিকাতায় রোগীসমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল—কার্যে পরিণত হইল না। একটি প্রতিজ্ঞা কিন্তু উষা সেন মনে মনে করিয়াছিলেন তাহা এই—"জর্জেট শাড়ি জীবনে আর কখনও পরিব না।" মণীন্দ্রমোহন জর্জেট শাড়ি অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ভবিষ্যতে উষাকে ঐরূপ একটি শাড়ি কিনিয়াও দিবেন কথা ছিল—কিন্তু ব্রজবিহারীর অভ্যাগমে তাহা আর হইল না। সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল ; সুতরাং উষা সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, জর্জেট শাড়ি জীবনে আর ছুঁইবেন না।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি, দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। শেষকালে এ প্রতিজ্ঞাও টিকে নাই। কি করিয়া ইহা ঘটিল, তাহা লইয়াই এই গল্প।

দুই

পারুলদিদি বেড়াইতে আসিয়াছেন।

পারুল মৈত্র ঊষা সেনের এক বছরের 'সিনিয়র', অথচ এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ-বিন্যাস প্রসাধন সম্বন্ধে তিনি উদাসীনা নহেন। এই বেশ-বিন্যাসের কল্যাণে তাঁহাকে ঊষার অপেক্ষা ছোটই দেখায়। নানা কথার পর তিনি বলিলেন—"এইবার উঠি ভাই, একটু মার্কেটে যেতে হবে।"

"মার্কেটে কেন?"

পারুলদিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন—"একখানা শাড়ি কেনার ইচ্ছে আছে। শুনেছি নাকি জর্জেট শাড়িগুলো আজকাল খুব সুন্দর উঠেছে!"

"তাই নাকি?"

পারুলদিদি চলিয়া গেলেন।

জর্জেট শাড়ির কথায় ঊষার মণীন্দ্রমোহনকে মনে পড়িল। একটু দুঃখ বোধও হইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই দুঃখ হইল যে, মণিকে না-পাওয়ার দুঃখের তীব্রতাটা যেন কমিয়া গিয়াছে। কই, মণির কথা আর তো সে তেমন করিয়া ভাবে না। দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, মণির কোন খবরই সে তো রাখে না আর! এখন সে মিসেস গুপ্ত এবং এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ব্রজবিহারীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সে একান্তভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মন অতীতের স্মৃতির ধ্যান করিতেছে না। স্পন্দনশীল বর্তমানকে লইয়া সে ব্যস্ত। ব্রজবিহারী খারাপ লোক নয়, ঊষাকে খুশী করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই, তদুপরি সে ঊষার স্বামী। সুতরাং তিলে তিলে সে ঊষার হৃদয় জয় করিয়াছে।

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া ঊষা একটু আনমনা হইয়া পড়িল। মনে মনে অনর্থক একবার আবৃত্তি করিল—'তাকে আমি ভালবাসি। এখনও বাসি। জর্জেট আমি জীবনে কখনও পরব না—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।'

এই প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার সহোদরা ভগিনী সন্ধ্যা সেন। এখন অবশ্য সন্ধ্যা দাস। সন্ধ্যার স্বামী মিস্টার দাস ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বলা বাহুল্য, ডেপুটিবাবুটি সদ্য-পাস-করা ডাক্তার ব্রজবিহারী অপেক্ষা অধিক উপার্জনক্ষম। এই জন্যও বটে এবং পিঠাপিঠি বলিয়াও বটে ঊষার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। এখন অবশ্য দুজনেই বড় হইয়াছে, চুলাচুলি খাম্‌চাখাম্‌চি করিয়া ঝগড়া চলে না। বরঞ্চ মুখে দুই জনেই দুই জনের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। ইহাদের পাল্লা চলে এখন নীরবে—গহনা-কাপড়ের মারফৎ। ঊষা যদি শৌখিন দুল ক্রয় করিয়া কর্ণযুগল অলঙ্কৃত করিলেন, সন্ধ্যা অমনি শৌখিনতর দুল দুলাইয়া ঊষাকে শৌখিনতমের সন্ধানে উতলা করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা যদি কোন ছলে ঊষাকে জানাইলেন যে, তাঁহার স্যাণ্ডাল জোড়াটার পাঁচ টাকা দাম, ঊষাকে অমনি জানাতেই হইল—"হ্যাঁ, ও-রকম স্যাণ্ডালগুলো বেশ,—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু ওঁর কিছুতেই ও-রকম স্ট্র্যাপ-দেওয়া পছন্দ হয় না। নিজে পছন্দ ক'রে এনেছেন দেখ না—সাড়ে ছ' টাকা দিয়ে! আঙুলগুলো এমন চেপে ধরে—বিচ্ছিরি!"

সুতরাং এই সন্ধ্যাই যখন উপর্যুপরি দুই দিন দুই বিভিন্নপ্রকার জর্জেট পরিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া গেল, তখন ঊষা দেবী বেশ একটু বিচলিত হইলেন। জর্জেট কিন্তু তিনি পরিবেন না। মনে মনে কহিলেন—"আহা, ভারি তো জর্জেটের দাম! প্রতিজ্ঞা না করলে এতদিন আমি কবে কিনতাম!"

তৃতীয় বোমা হানিলেন বান্ধবী ছায়া।

ছায়া সিনেমায় যাইবে—ঊষাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পরিয়া আসিয়াছে একখানা জর্জেট শাড়ি। সুন্দর সাদা রঙের জর্জেটখানা—সুন্দর কাজ-করা। ঊষা দেবী তাঁহার মুর্শিদাবাদীখানি সযত্নে পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেই ছায়া প্রশ্ন করিলেন—"ওটা পরলি কেন এই গরমে? জর্জেট নেই তোর?"

"না।"

"আজকাল জর্জেটটার খুব চলন হয়েছে—কিনলেই পারিস একখানা। দামও তো বেশী নয়—আমার এইখানার দাম এগার টাকা—"

"মোটে?" অতর্কিত উষার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মণীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটের সম্মুখে নানা বর্ণের কয়েকখানা জর্জেট শাড়ি আসিয়া পড়াতে পটখানা বেশ একটু আবছা হইয়া গেল। উষা কেমন যেন আনমনেই সিনেমাটা দেখিতে লাগিলেন। সিনেমার গল্পও একটা করুণ ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী। এই গল্পের নায়িকাও যাঁহাকে প্রথম জীবনে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাকে পান নাই এবং যাঁহাকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভালবাসিতেছিলেন। ইহাই জীবনের অদ্ভুত ট্রাজেডি। 'ইনটারভাল' হইল—ইনটারভালে উষা লক্ষ্য করিলেন যে, মহিলা দর্শকের মধ্যে আরও দুই-একজন জর্জেট শাড়ি পরিধান করিয়া আসিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিজের মনেই তিনি নিজেকে বলিলেন—"আর একজনকে বিয়েই যখন করতে পেরেছি তখন আর জর্জেট শাড়ি পরতে—কি! জীবনে কতবার কত প্রতিজ্ঞাই তো করেছি—সব কি আর পালন করেছি—না, পালন করা সম্ভব! যাক, তবু জর্জেট আমি কিনছি না—"

কয়েকটি দারুণ বোমার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়াও উষা দেবীর প্রতিজ্ঞা-দুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই। কোনরূপে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সেদিন 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিতে গিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল। চতুর্দিকেই জর্জেট শাড়ি। উষাকে জব্দ করিবার জন্যই যেন সকলে দল বাঁধিয়া জর্জেট পরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি বোধ হয় একাই কাশ্মীরী শাড়ি পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলে তাঁহার এই জর্জেট-বিহীন আবির্ভাব লইয়া মনে মনে হাসাহাসি করিতেছে।

শেষ বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইল একটি মোটর হইতে।

হঠাৎ সেদিন বিকালে উষা দেবী লক্ষ্য করিলেন যে, একটি মোটর আসিয়া বাড়ির সামনে দাঁড়াইল। মোটরে বসিয়া একটি জর্জেট-পরিহিতা তরুণী। সুন্দরী। দ্বিতলের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া উষা লক্ষ্য করিলেন যে, মোটরটি দাঁড়াইতেই একমুখ হাসি লইয়া স্বামী ডিস্‌পেন্সারি হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া যুবতীর পাশে বসিলেন।

জর্জেট শাড়ি আর সে কিনিবে না। স্বামী আসিলেই বারণ করিয়া দিতে হইবে।…মণিবাবুর সহিত একবার দেখা করিতে হইবে বই কি! হরিশ মুখার্জি রোড কতটুকুই বা দূর!

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই উষা দেবী বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়িটা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু ভিতরে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই।

"আপনি আমাকে খবর দিলেন না কেন?"

"আপনার ঠিকানা তো আমার জানা ছিল না। সেই যে আপনি কলেজ থেকে চ'লে গেলেন, আর তো কোন খবর দেন নি আমাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলাম—আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায়, কার সঙ্গে—কিছুই তো জানি না।" বলিয়া মণিবাবু একটু হাসিলেন। এমন সময়ে—"কেমন আছেন আজকে আপনি?" বলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার ব্রজবিহারী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"এ কি, তুমি এখানে?"

উষা দেবীও কম বিস্মিত হন নাই।

"আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তুমিই এঁর চিকিৎসা করছ নাকি?"

একটু পরেই ব্রজবিহারী বাহিরে আসিয়া গাড়িতে একটা কাগজের বাক্স দেখাইয়া বলিলেন—"ওই নাও তোমার শাড়ি। এই ভদ্রলোকের কাছেই টাকা বাকি ছিল। ভাগ্যে আজ দিয়ে দিলেন, তাই তোমার কাছে মানটা থাকল। দেখ তো রঙটা পছন্দ হয় কি না?" বলিয়া ব্রজবিহারী নিজেই প্যাকেটটা খুলিতে লাগিলেন।

উষার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না।

কে এ মেয়েটি? রোগিণী? চেহারা দেখিয়া মনে তো হয় না! উষা দেবীর দোষ দেওয়া যায় না—এ অবস্থায় কৌতূহল অদম্য হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক।

স্বামী ফিরিতেই উষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকেলে যে-মেয়েটি তোমাকে এসে নিয়ে গেল—কে ও?"

"হাসপাতালের একজন নার্স। ডক্টর বিশ্বাস আমাদের আজ একটা টি-পার্টি দিলেন কিনা! সুষি অর্থাৎ ওই নার্স বেশটি মেয়ে!"

"মেয়েটি দেখতে বেশ! জর্জেট প'রে বেশ মানিয়েছিল। কিনে দাও না আমাকে একখানা জর্জেট।"—উষা বলিয়া ফেলিল।

"বেশ তো! দাম কত?"

"কত আর হবে! আজকাল সস্তাই হয়েছে শুনেছি। দশ-পনর টাকা হলেই হয়। ছায়া সেদিন প'রে এসেছিল একখানা, বললে—এগার টাকা দাম। তাড়াতাড়ি নেই এখন—"

"আচ্ছা, দেখি। আমার এক রোগীর কাছে ষোলটা টাকা বাকি আছে। কাল 'বিল' পাঠাব। টাকাটা যদি পাই কিনে দেব।"

তিন

ঠিক তাহার পরদিন সকালে বান্ধবী ছায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। গোপনীয় কিছু বলিবার ছিল। মুখচোখ রহস্যময় করিয়া কানে কানে কহিলেন—"মণিবাবু কলকাতায় এসেছেন আজ ক'দিন হ'ল। আমি জানতাম না। মালতী তার এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছে। দেখা করবি নাকি? ঠিকানা যোগাড় করেছি—এই নে। আমার কাজ আছে ভাই,—বসতে পারব না। যা না, দেখা ক'রে আয়। দেখা করতে আর দোষ কি?"

ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মণি আসিয়াছে! কলেজের অর্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভীতু মানুষটি—শান্ত নিরীহ নিরহঙ্কার। মণীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।—নাঃ,

কালো

ভয়ানক বদরাগী ছিল কালো।

এ লইয়া কত গল্পই যে প্রচলিত আছে!

সেবার স্কুলে সামান্য একটা পেন্সিল লইয়া সে কি কাণ্ড!

ঝগড়ার কারণ এত তুচ্ছ যে, শুনিলে হাসি পাইবে।

মিত্তিরদের ছেলেটা নাকি কালোকে প্রশ্ন করে—

"তোর পেন্সিলের রঙটা কেমন জানিস?"

"কেমন?"

"আমাদের বাঘা কুকুরের ল্যাজের যা রঙ, অবিকল সেই রকম।"

সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘুষি খাইয়া মিত্তিরদের ছেলেটা অজ্ঞান হইয়া যায়। স্কুলে মহা হৈ-চৈ—

হেডমাস্টার বলিলেন—"এমন গোঁয়ার ছেলেকে স্কুলে রাখা 'সেফ' নয়।" অনেক বলিয়া কহিয়া তবে হেডমাস্টার মহাশয় সেবারকার মত তাহাকে ক্ষমা করিতে রাজী হইলেন। নামটা রহিয়া গেল।

কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার এক কাণ্ড!

এ ব্যাপারটাও হাস্যকর।

কিন্তু কালোর ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক।

ছেলেরা খাতায় শব্দরূপ লিখিতেছিল।

পণ্ডিত মশায় ঘুমাইতেছিলেন,—চেয়ারে ঠেস দিয়া এবং টেবিলের ওপর পা তুলিয়া দিয়া—অর্থাৎ রোজই যেমন করেন।

হঠাৎ পণ্ডিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ-বোজা অবস্থাতেই তাঁহার কানে আসিতেছিল পিছনের বেঞ্চি হইতে যে জাতীয় শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা ঠিক শব্দরূপ লেখার শব্দ নয়।

'খিক্—খিক্—খিক্—'

পণ্ডিত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার সেই শব্দ—খিক্—খিক্—

কারণ কি অনুসন্ধান করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই কারণটি হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহার টিকিটি কে দড়ি দিয়া জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে।

পণ্ডিতের সন্দেহ হইল—এ কালোর কাজ।

কালো শপথ করিয়া বলিল যে, সে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না।

পণ্ডিতের বিশ্বাস হইল না।

গেলেন তিনি হেডমাস্টারের কাছে।

হেডমাস্টার একটু পরেই বেত্র-হস্তে দর্শন দিলেন।

ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে বেত খাইল, কিন্তু অপরাধীর নাম বলিল না। তখন প্রত্যেক ছেলেকে আলাদা ডাকিয়া ডাকিয়া হেডমাস্টার মহাশয় আপিস-ঘরে জেরা শুরু করিলেন।

এই জেরার মুখে পড়িয়া ফটিক নামক ছেলেটি ভয়ে ভয়ে যে উক্তিটি করিল, হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত সেটি বিশ্বাস কারলেন। ইহাই তাঁহারা চাহিতেছিলেন।

কালোর 'রাস্‌টিকিট' হইয়া গেল।

কালোর মত গুণ্ডা ছেলেকে ইস্কুল হইতে দূর করিয়া দিয়া সমস্ত শিক্ষকের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু অন্ধকারে বোঁ করিয়া একখানা লাঠি আসিয়া লাগিল হেডমাস্টারের পায়ে। ভদ্রলোক খোঁড়া হইয়া গেলেন।

নিষ্ঠাবান-হিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা লক্ষ্য করিয়া কে একদিন একটা পচা মুরগীর ডিম ছুঁড়িয়া মারিল। সেই দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পণ্ডিতের নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা লইয়া আজিও অনেকে হাসাহাসি করে।

ফটিকের গালেও অন্ধকারে কে একদিন ঠাস করিয়া একটি চড় মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলের সন্দেহ হইল—কালো।

কালোর বাড়িতে খোঁজ করা হইল। কালোর মা বলিলেন—"কালো তো মামার বাড়ি গেছে—এখানে সে নেই তো!"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা।

মরাইয়ের পিছনে বসিয়া বসিয়া মাতৃমুখনিঃসৃত এই মিথ্যা ভাষণটি কালো পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।

● প্রথম শতক ●

এইরূপে লেখাপড়া তাহার ইতি হইয়া গেল

বাড়িতেও সে কি কম দৌরাত্ম্য করিত!

বিধবা মায়ের একটি মাত্র ছেলে।

পান হইতে চুন খসিবার জো ছিল না।

একদিন তরকারিতে নুনই বুঝি একটু কম হইয়াছিল। ছেলের সে কি রাগ! লাথি মারিয়া ভাতের থালাটাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অমন সুন্দর কাঁসার থালাটার কানাটা ফাটিয়া গেল। আর একবার—জলে বুঝি একটু ময়লা ছিল—আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল গেলাসটাকে। সেটাও ভাঙিয়া পড়িয়া আছে কাঠের সিন্দুকটার ভিতর।

তারপর আর একদিন।

কি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কি তুমুল কাণ্ড!

পশ্চিম দিকের সিঁদুরে গাছটায় সেবার আম আসিয়াছিল প্রচুর। টুকটুকে লাল লাল আমগুলি—যেন আবীর-মাখা।

কিন্তু ওই দেখিতেই।

টক—বিষ!

কালোই বলিত—"কাগ-দেশান্তরি—বাঁদর-বোবা—"

অর্থাৎ কাক যদি খায় দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে তাহাকে। বাঁদরের মত অম্ল-রসিকও যদি এ আম খাইতে সাহস করে বোবা হইয়া যাইবে। এমন আমের গুণ!

সেই আমগাছে একদিন কে একটা ছোঁড়া ঢিল মারিয়াছিল। কালোর নজরে পড়িয়া গেল।

কালো হাঁকিল—"কে রে?"

ছোঁড়া তো দে ছুট!

কালোও ছুটিল।

বৈশাখ মাসের দুপুরবেলাকার কাঠ-ফাটা রোদ।

গ্রাহ্য নাই—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে কালো—ছোঁড়াটার পিছনে।

ধরিয়াই মার।

নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল ছোঁড়াটার।

তাহা লইয়া সে কি কাণ্ড! থানা-পুলিশ হইবার উপক্রম। গোটা দশেক টাকা খরচ করিয়া কালোর মা শেষে মিটাইয়া ফেলিল গোপনে।

তারপর কালোর বিবাহ।

এই তো সেদিনের কথা।

সুন্দরী একটি ডাগর-ডোগর মেয়ে দেখিয়া কালোর মা কালোর বিবাহ দিলেন। বেশ বড়সড় সুন্দরী বউ।

ভাবিলেন, ছেলের সংসারে মন হইবে, আর দস্যিপনা করিবে না। ছেলের মন কিন্তু গেল অন্যদিকে।

শ্বশুর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ একটি হার্মোনিয়াম দিয়াছিলেন। ওই হার্মোনিয়ামই হইল কাল।

দুনিয়ার যত বেকার ছোকরা ওই হার্মোনিয়ামকে কেন্দ্র করিয়া আসিয়া জুটিল এবং গলা সাধিতে লাগিল।

ক্রমশ একটা শখের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিল।

কালোর নাওয়া-খাওয়ার অবসর নাই।

থিয়েটারের মহলা দিয়া কালো বাড়ি ফিরিতে লাগিল কোনদিন বারোটায়, কোনদিন একটায়, কোনদিন তারও পরে। ছেলেমানুষ বউ বেচারী ভাত আগলাইয়া বসিয়া ঢোলে।

একদিন বুঝি সে বলিয়াছিল—"একটু সকাল সকাল ফিরতে পার না তুমি? একলা রাত্রে জেগে ব'সে থাকতে ভয় করে না আমার বুঝি!"

উত্তরে কালো তাহার চুলের ঝুঁটিটা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিয়াছিল—"ইস্, ভারি মনিব এসেছেন আমার!" বউটার কি সে কম নাকাল করিত!

এমনই কত ঘটনা।

গ্রামের প্রত্যেকেই একটা দুইটা জানে।

কালোর বিরুদ্ধে সকলেরই একটা-না-একটা নালিশ ছিল। সকলকেই জ্বালাইত সে।

আজ কিন্তু সকলে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে।

খোঁড়া হেডমাস্টার, পণ্ডিত মশায়, এমন কি ফটিক পর্যন্ত।

বিধবা মা কালোর সমস্ত দুষ্কৃতিগুলি পরম স্নেহভরে আজ স্মরণ করিতেছেন।

বউটি তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানার স্মৃতিটিকে অশ্রুসিঞ্চনে পরম মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

আর তো সে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে আসিবে না।

কাল রাত্রে সে মারা গিয়াছে—

হঠাৎ একদিনের জ্বরে।

বংশগৌরব

"জমিদার সূর্য চৌধুরীর কথা এখনও লোকে ভোলে নি, বুঝলে? শোন তবে একটা গল্প বলি। গল্প নয়—সত্যি কথা। নিজের চোখে দেখি নি—বাবার মুখে শুনেছি।"

সবে তখন সিঙ্গাপুর জমিদারিটা কেনা হয়েছে। আসল জমিদার যিনি ছিলেন তিনি তো টাকাকড়ি নিয়ে চম্পট দিলেন বিলেতে। তিনি ছিলেন নীলকর সাহেব। তখন নীলকর সাহেবরা চাঁটি-বাটি গুটিয়ে সব স'রে পড়ছেন। আসল জমিদার টম সাহেব চ'লে গেলেন। কিন্তু তাঁর ম্যানেজার লং সাহেব আর নড়তে চায় না। সে ব্যাটা কুঠি দখল ক'রে ব'সে রইল। তাকে খবর পাঠানো হ'ল।

ব্যাটা কি বললে জান?

বললে, 'আমার ছ' মাসের মাইনে ছ' হাজার টাকা বাকি আছে। আমার মালিক টাকাটা তোমাদের কাছে নিয়ে নিতে বলেছে। টাকাটা পেলেই আমি চ'লে যাব। জমিদারি কেনার সময় একটা শর্ত ছিল যে, ম্যানেজারের বাকি মাইনেটাও দিয়ে দিতে হবে।'

সর্বৈব মিথ্যে কথা, বুঝলে?

ব্যাটা এক জাল ডকুমেণ্টও বার করলে।

সকলের চক্ষুস্থির!

সূর্য চৌধুরী কিন্তু দমবার ছেলে নন, তাঁর তখন চারটে হাতী, চোদ্দটা ঘোড়া, শতখানেক পালোয়ান বরকন্দাজ। প্রবল প্রতাপ—বুঝলে?

তিনি ইচ্ছে করলে সেই দিনই ব্যাটাকে মেরে গ্রামছাড়া করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সেদিন মেজাজটা খুব ভাল ছিল। সেদিনই তাঁর নাতি হয়েছে, অর্থাৎ শর্মা সেদিন জন্মগ্রহণ করেছে—"

বলিয়া বক্তা নিজের বক্ষস্থলে আঙুল দিয়া টোকা দিলেন।

"তাই সেদিন তিনি আর মারধোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে গেলেন না। ম্যানেজার বেহারীবাবুকে ডেকে বললেন—'ওহে, একটা কোন ফন্দি ক'রে লোকটাকে তাড়াতে হবে। এক কাজ কর, ব্যাটারা শুনেছি চা না খেলে টিকতে পারে না। এক কাজ

কর—চা যাতে না খেতে পায় তার একটা ব্যবস্থা কর। বেশী কিছু করতে হবে না—গ্রামের সব গয়লাকে আজকে ডাকিয়ে আনাও, সকলকে—'

ম্যানেজারবাবু গয়লাদের ডাকবার বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজারবাবু চ'লে গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শঙ্কর সিংকে ডেকে পাঠালেন। শঙ্কর সিং—দুর্ধর্ষ জোয়ান, লম্বা প্রায় সাত ফিট—ইয়া বুকের ছাতি—ইয়া গালপাট্টা।

শঙ্কর সিং এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই তার উপর হুকুম হয়ে গেল, লং সাহেবের যত গরু মহিষ আছে—সব রাতারাতি হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশ ক্রোশ দূরে আমদাবাদ খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো। কাল সকালে সায়েবের গোয়ালে যেন একটি গরু মহিষ না থাকে—

শঙ্কর সিং সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

বিকেল নাগাদ সব গয়লারা এসে পৌঁছে গেল। আশপাশের দশখানা গ্রামের যত গোয়ালা ছিল—সব হাজির। ঠাকুরদা তাদের উপর কড়া হুকুম জারি করলেন যে, তাদের যত দুধ হয়, সব তিনি কিনবেন—লং সায়েব যেন এক ফোঁটা দুধ না পায়; যদি কেউ লং সায়েবকে এক ফোঁটা দুধ বিক্রি করে তা হ'লে তাকে আর আস্ত রাখা হবে না। ঘরবাড়ি জালিয়ে জুতো মেরে তাকে জমিদারি ছাড়া করা হবে।

গোয়ালারা সমস্বরে বললে—'যো হুকুম!'

গোয়ালার দল চ'লে গেল।

ঠাকুরদা ঘাড় নেড়ে বললেন—'চা খাওয়া বার করছি ব্যাটার!'

তার পরদিন লং সায়েবের কুঠিতে হুলস্থূল ব্যাপার!

খানসামা এসে সেলাম ক'রে জানালে—'হুজুর দুধ কাঁহু নেই মিলত'—শুনে লং সায়েবের মুখখানা লং হয়ে গেল।

মেমসায়েব স্তম্ভিত।

মেমসায়েব ভীতু লোক ছিলেন। তিনি সায়েবকে অনুরোধ করতে লাগলেন—'মিস্টার চৌধুরী শুনেছি ভয়ানক লোক। ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ঠিক নয়—'

লং সায়েবের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ।

বললেন—'ইউ কিপ কোয়ায়েট!'

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গেলেন থানায়।

জমিদার সূর্য চৌধুরীর নামে গরু-চুরির নালিশ করতে। গিয়ে দেখেন থানায় দারোগা নেই—সেই দিন ভোরেই দারোগা সায়েব মফস্বলে 'টুরে' বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা জমাদার সায়েব বলতে পারলেন না।

দারোগা সায়েব ঠাকুরদার মহাভক্ত ছিলেন।

না হবেনই বা কেন?

তখনকার দিনে এমন কোন অফিসার ও-অঞ্চলে ছিলেন না, যিনি ঠাকুরদার জমিদারির দই দুধ ক্ষীর ঘি মাছ না খেয়েছেন। আর তাও কি একটু-আধটু! মণ মণ।

যাক, লং সায়েব তো ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিনা দুধেই খানিকটা চা গলাধঃকরণ করলেন। বেচারা!

তার পরদিন কিন্তু এক কাণ্ড ঘটল!

কে একজন এসে ঠাকুরদাকে খবর দিলে যে, সায়েব দুধ পেয়েছে।

সে কি? কে দুধ দিলে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে!

তখ্‌খুনি চর ছুটল সঠিক সংবাদ আনবার জন্যে। কিছুক্ষণ পরে চর এসে খবর দিলে—সে খানসামার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে—সায়েব শহর থেকে টিনের দুধ আনিয়েছে। টিন ছ্যাঁদা ক'রে তার থেকে দুধ বের ক'রে চায়ের সঙ্গে গুলে খাচ্ছে।

ঠাকুরদা বললেন—'টিনের দুধ? সে কি?'

তখনও কনডেন্সড্ মিল্কের চলন হয়নি—বুঝলে?

ঠাকুরদা তো আকাশ থেকে পড়লেন।

টিনের দুধ! বলে কি!

যাই হোক সূর্য চৌধুরী দমবার ছেলে নন।

বজ্র-নির্ঘোষে হাঁক ছাড়লেন—'শঙ্কর সিং—'

শঙ্কর সিং এসে হাজির হ'ল।

ঠাকুরদা হুকুম দিলেন, 'লং সায়েব কুঠিতে ব'সে কি এক টিনের দুধ দিয়ে চা খাচ্ছে—এক্ষুনি গিয়ে সেই টিন কেড়ে নিয়ে এসো। যাও—'

শঙ্কর সিং বেরিয়ে গেল।

পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা সায়েব ভাল করে চা খেতে পায়নি। অবস্থাটা বোঝ একবার—প্রাণ একেবারে খাঁ-খাঁ করছিল। টিনের দুধ শহর থেকে আনিয়ে বেশ বাগিয়ে স্বামী-স্ত্রী ব'সে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। সকাল বেলা।

চায়ের টেবিলের ঠিক সামনেই—কাচের দরজা বন্ধ। চা খাওয়া চলছে, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ঘোড়ায় চ'ড়ে টগবগ করতে করতে শঙ্কর সিং এসে হাজির—হাতে প্রকাণ্ড এক বর্শা। তড়াক করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে শঙ্কর সিং সোজা সেই কাচের দরজার সামনে এসে হাজির হ'ল।

এসেই এক লাথি।

ঝনঝন ক'রে দরজা ভেঙে পড়ল।

বিদ্যুদ্বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুধের টিন নিয়ে আবার বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গিয়ে শঙ্কর সিং ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সায়েব হতভম্ব।

মেম সায়েব মূর্ছিত।

সেই দিনই সায়েব তল্পি-তল্পা গুটিয়ে—"

এমন সময় বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

"ঘণ্টা বেজে গেল নাকি? আর নয় ভাই, আমাদের সায়েব ব্যাটা ভয়ানক স্ট্রীক্ট্? একটু দেরি হলেই ফাইন করে—"

এই বলিয়া বক্তা ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আপিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের পৌত্র চরণবাবু—বর্তমানে সদাগরী আপিসে কেরানীগিরি করেন।

খাসা গল্প বলিতে পারেন ভদ্রলোক।

ভুত

জনশ্রুতি, দেবরাজ ইন্দ্রই বজ্রধর। কিন্তু জরাজীর্ণ বুড়া পিঁওনটাও যে বজ্র হানিতে সমর্থ তাহা সেদিন সকালে বোঝা গেল। সুষমার মস্তকে অনায়াসে সে একটি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নির্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে করিয়া নির্বাক্ সুষমা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রশান্ত লিখিতেছে—

"আমার চিঠি পেয়ে তুমি কষ্ট পাবে জানি ;—কিন্তু তবু না লিখেও তো উপায় নাই। বিশ্বাস কর, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—কিন্তু বাবা, মা, ইণ্টারকাস্ট বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। এ অবস্থায় তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করা অসম্ভব। যাঁরা আমাকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন তাঁদের মনে এতবড় একটা আঘাত দিতে পারব না। তাঁদের আশীর্বাদবঞ্চিত দাম্পত্য-জীবনও কি সুখের হবে? কি করব বল? এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভবপর হ'ল না। যদি পরজন্ম থাকে এবং সেই পরজন্মে যদি আমরা এক জাত হয়ে জন্মাই এবং এই জন্মের স্মৃতি যদি পরজন্মে জাগরূক থাকে তা হ'লে হয়তো আবার মিলন হবে।

তুমি রাগ ক'রো না। আমার মনে যে কি হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার দুঃখের ভাষা নেই। এইটুকু শুধু সান্ত্বনা যে, তোমার জন্যেই আমি দুঃখ ভোগ করছি। দুঃখই প্রেমকে মহিমান্বিত করে। যদি সম্ভব হয় অল্প কয়েকদিন পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

ইন্দ্রের বজ্র কি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ?

দুই

কিন্তু নিদারুণতর আর একটি বজ্র উদ্যত হইয়া ছিল।

সেটি পড়িল দুই দিন পরে।

সেই জরাজীর্ণ রোগা পিওনই সেটি ছাড়িয়া গেল।

ক্ষুদ্র পত্র, কিন্তু সাংঘাতিক সংবাদ।

প্রশান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে।

সূর্য-সমেত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।

তিন

সুষমা মফস্বলের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী।

বিস্তৃত স্কুল-কম্পাউণ্ডের এক ধারে তাহার ফ্রী কোয়ার্টার্স। সেই কোয়ার্টার্সে সুষমা ও আর একজন প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী মিসেস বোস থাকেন। পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইজন শয়ন করেন। মাঝে একটি পরদাবৃত দরজা।

গভীর রাত্রি।

হঠাৎ সুষমা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আলুথালুবসনা মিসেস বোস পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

ব্যাপার কি?

জানালায় কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিসেস বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারিবাবুর বখাটে ভাইপোটা। ছোকরার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার বহুদিন হইতে মিসেস বোসের বিরক্তির কারণ হইয়া আছে। অথচ হাতে-নাতে ছোকরাকে ধরিবার উপায় নাই। সঙ্গিন ধূর্ত!

সুষমা মিসেস বোসকে কিছু বলিল না।

সে কিন্তু স্পষ্ট দেখিয়াছিল।

প্রশান্তর ছায়ামূর্তি।

অবিকল।

তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

চার

সুষমা খাট টানিয়া মিসেস বোসের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই।

মিসেস বোসের শয়নঘর হইতে স্কুলের পিছন দিককার অশ্বত্থগাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রে কি ভীষণ ঝাঁকড়া দেখায় গাছটা! সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুষমা সভয়ে দেখিল, ওই গাছটার নীচু ডালটাতে বসিয়া কে যেন পা দোলাইতেছে! অস্তমান চন্দ্র-কিরণে ওই যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

প্রশান্ত!

সুষমা শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

আর একদিন মনে হইল, বাগানের বেড়াটায় হেলান দিয়া কে যেন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

তাহার চক্ষুতে ক্ষুধার্ত সে কি দৃষ্টি!

চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার।

পাশের খাটে শুইয়া মিসেস বোস নাক ডাকাইতেছেন। সুষমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রশান্তের প্রেত-দৃষ্টি যেন টর্চের আলোর মত তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে।

সে সভয়ে চক্ষু বুজিয়া মনে মনে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর সে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

গেটে ঢুকিতে যাইবে—মনে হইল, তাহার পাশ দিয়া সাঁৎ করিয়া সে চলিয়া গেল। হঠাৎ যেন গেটের পাশের ঝোপটায় মিলাইয়া গেল।

জীবিতাবস্থায় যে প্রিয়তম ছিল, মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলেই সুষমার গা ছমছম করে।

পাঁচ

সেদিন ছুটি ছিল।

মিসেস বোস ছিলেন না—ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন। রাত্রে সুষমা ভাবিল করুণা-

দিদিকে (আর একজন শিক্ষয়িত্রী) পাশের কোয়ার্টার্স হইতে ডাকিয়া আনিবে। ডাকিতে গিয়া দেখিল, করুণাদিদির আপত্তি নাই ; কিন্তু মেন্তুদির ঘোর আপত্তি। তিনি একা শুইতে পারিবেন না।

নিরুপায় সুষমাকে চাকরটার উপর ভরসা করিয়া একাই শুইতে হইল।

গভীর নিশীথে ললাটে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সচকিতা সুষমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হিমশীতল স্পর্শ!

ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, একেবারে শিয়রে বসিয়া আছে।

চীৎকার···ফিট্!

কিছুক্ষণ পরে সুষমা চক্ষু মেলিল।

স্বয়ং ভূত জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহার মূর্ছা ভাঙাইতেছে।

সুষমার গলায় কেমন যেন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। পেটের মধ্যে কি যেন একটা পাকাইয়া উঠিতেছে। ভূত কিন্তু নাছোড়!

ক্রমাগত জলের ঝাপ্টা দিয়া চলিয়াছে।

ছয়

পরদিনই সুষমা কাজে ইস্তফা দিয়া দিল।

গত্যন্তর ছিল না।

জিনিসপত্র গুছাইয়া অপেক্ষমান ট্যাক্সিটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তাহার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।

"ছি-ছি, কি লজ্জা—"

"বাবা-মার মত যখন পেয়েছি তখন আর কাকে ভয়? ট্রেনটা পেলে হয় এখন! তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম আর কি!"

ট্যাক্সি স্টার্ট দিল!

জগমোহন

বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।

জগমোহন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "বাইরে শোন্।"

বাহিরে উঠিয়া আসিলাম।

"কি ?"

"কিছু নয়। একটা বিড়ি দে।"

বিড়ি দিলাম।

জগমোহন কখনও বিড়ি কিনিয়া খায় না। চিরকাল সে পরস্মৈপদী ধূমপান করিয়া আসিতেছে। বন্ধুবান্ধব মহলে জগমোহনকে বিড়ি দেওয়াটা একটা রেওয়াজের মত হইয়া গিয়াছে।

নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জগমোহন বলিল—"বিপনের আদিখ্যেতার কথা শুনেছিস্ ? সে গোঁফ কামাতে রাজী নয়।"

সংবাদটা উড়াইয়া দিবার মত নহে।

কারণ বিহার বন্যায় অর্থ সাহায্য করা যে নাট্যাভিনয়ের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই নাটকের প্রধান নায়িকা বিপিন।

বলিলাম—"আগে তো কিছু বলে নি সে।"

"গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া বার করছি, থাম্ না, ওর—"

রোষকষায়িত লোচনে জগমোহন বিড়িতে টান দিতে লাগিল।

বিপিন সমাদ্দার গত বৎসর পূজার সময়ও 'সীতা' সাজিয়াছিল। সম্প্রতি অর্থাৎ বউ আসিবার পর হইতে সে পৌরুষকামী হইয়াছে।

শুনিয়াছি ডাম্বেল-মুদ্গর-সহযোগে পেশীসমূহের উন্নতিবিধান করিতেছে, গোঁফও আর কামায় না। অধিকন্তু কস্‌মেটিক সাহায্যে গুম্ফপ্রান্তদ্বয়কে সূচালো করাই বর্তমানে তাহার সাধনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মণিকাঞ্চন জাতীয় একটা শোভা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়েই সম্ভবত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে জমকালো একজোড়া জুলফিও সে রাখিয়াছে।

রাখুক।

কিন্তু জগমোহনের যুক্তি ও উক্তি সাধুভাষায় ব্যক্ত করিলে এই দাঁড়ায়—

গ্রামের মুখরক্ষা করা প্রত্যেক গ্রামবাসীরই কর্তব্য। যে করে না সে শূকর। দেশের এই দুর্দিনে থিয়েটার করিয়া কিছু অর্থ সাহায্যই যদি না করিতে পারা যায় তাহা হইলে আর্ট-চর্চা করার কোন অর্থ হয় না। 'আর্ট ফর আর্টস সেক'—ইহা নিতান্ত উজবুকের কথা। বাজে কথা ও—।

জগমোহনের মুখে এসব কথা সাজে।

কারণ গ্রামের জন্য জগমোহন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। তাহার গ্রাম-প্রীতি এতই প্রবল যে, গ্রামের মাইনর ইস্কুলটা হাই ইস্কুল হইল না বলিয়া সে মাইনর পর্যন্ত পড়িয়াই পড়াশুনা খতম করিয়া দিল। তাহারই লেখালেখি ও চেষ্টায় গ্রামে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাটি হইয়াছে। সে চাঁদা সাধিয়া না বেড়াইলে বারোয়ারী মণ্ডপটি হইত কিনা সন্দেহ। গ্রামের সমস্ত বিবাহে জগমোহন বাঁধা বরযাত্রী। সে যাইবেই এবং কন্যাপক্ষের বাড়িতে গিয়া গ্রাম-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-জিহ্ব হইয়া থাকিবে। এ লইয়া বহুবার বহুস্থানে সে হাতাহাতি করিয়াছে। একবার নিকটবর্তী শহরে সমাগত এক সার্কাস দেখিতে গিয়া জগমোহনের সার্কাসে ঢুকিবার বাসনা হয়। সুতরাং সার্কাসের একটি ছোকরার সহিত ভাব করিয়া সে সেই আশায় তাহার সহিত একটু মাখামাখি করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই ছোকরা নাক তুলিয়া তাহাকে বলিয়া বসিল—"সার্কাসে ঢোকা কি সোজা কথা হে! আমাদের মত শহুরে ছেলেই হিমসিম খেয়ে গেছি। অজ পাড়াগাঁয়ে তো কাটালে এতদিন—মুখের কথা খসালেই অমনি নিয়ে নেবে তোমাকে! এ কি চাট্টিখানি কথা—"

জগমোহন ঘৃণায় সেই দিনই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—"ধড় থেকে মুণ্ডুটি তক্ষুনি বাছাধনের নামিয়ে দিতুম, যদি না—"

বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে সে চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর সক্ষোভে বলিল—"ডিসপেপ্‌সিয়া একেবারে মনুষ্যত্বের মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করেছে, বুঝছ না? দাও, একটা বিড়ি দাও। দেখি যদি মিত্তির মশাইকে পগিয়ে একটা দরখাস্ত করাতে পারি। গ্রামে একটা চ্যারিটেবল

ডাক্তারখানা নইলে আর চলছে না। কিনে আর কাঁহাতক ওষুধ খাওয়া যায়!”

পরদিনই সার্কাসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়া গেল।

মিত্র মহাশয়কে দিয়া দরখাস্ত লিখাইয়া, চাঁদা সাধিয়া সে বহু চেষ্টায় ছোটখাটো সরকারী ডিস্পেন্সারিও একটি খাড়া করিয়াছে। চাঁদার পরিমাণ প্রথমে আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু জগমোহন নিজেই দুইশত টাকা দান করিয়া বসিল। দান করিবার অব্যবহিত পূর্বেই কিন্তু জমিদারদের বাড়ির একটি ছোট মেয়ের গলা হইতে একটি সোনার হার চুরি হইয়া গেল।

জগমোহন শুনিয়া বলিল—“ওদের চুরি যাবে না তো যাবে কার! চাঁদা চাইতে গেলুম, কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে। ভগবান ব’লে একজন আছেন তো!”

গ্রামের যাবতীয় কুৎসা সংগ্রহ করা জগমোহনের দৈনন্দিন কর্তব্য। কিন্তু গ্রামের কুৎসা লইয়া গ্রামান্তরের কেহ আলোচনা করুক দেখি! ছলে বলে কৌশলে জগমোহন তাহাকে বিপর্যস্ত করিবেই।

সুতরাং গ্রামে জগমোহনের অনুরাগী একটি দল ছিল।

জগমোহন নিজে থিয়েটার করে না।

কিন্তু থিয়েটারের সে-ই প্রধান পাণ্ডা। স্টেজ বাঁধা, চাঁদা তোলা, টিকিট বিক্রি করা, ড্রেস আনানো, রিহার্সেলের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক অভিনেতাকে উৎসাহ দেওয়া—সব জগমোহন।

নবাগত ডাক্তারবাবুটিও থিয়েটার-ভক্ত।

তিনিও জগমোহনের বন্ধু ছিলেন।

আমি তো ছিলামই।

তিন

গভীর রাত্রে জগমোহনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া নামিয়া আসিলাম।

যাহা শুনিলাম তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল।

জগমোহন বলিল—"শিগ্‌গির চল্—বিপ্‌নের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। একটা বিড়ি দে চট্ ক'রে!"

জগমোহনের সঙ্গে দেখিলাম নিতাই করালী ও হাবুল রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে ভীতচকিত ভাব।

জগমোহন বলিল—"তুই এদের নিয়ে এগো—আমি থানায় চললাম।"

বিপিনের বাড়ি গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

অজ্ঞান বিপিনের গোঁফ ও জুলফি অন্তর্হিত হইয়াছে।

পরিষ্কার কামানো।

বউ পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে।

গ্রামের প্রান্তে বিপিনের বাড়ি। জগমোহনের বাড়ির পাশেই। বিপিনের বৃদ্ধ পিতামাতা সম্প্রতি তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। কাছে-পিঠে এক জগমোহন ছাড়া আর কেহ নাই। সুতরাং ডাকাতির সুবিধা আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাকাতে গোঁফ ও জুলফি ব্যতীত আর কিছুই অপহরণ করে নাই। বিপিনের স্ত্রীর সহিতও তাহারা সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে। ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ—

গভীর রাত্রে হঠাৎ কয়েকজন মুখোশপরা লোক প্রাচীর টপকাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং বিপিনকে ডাকিতে থাকে। বিপিন বাহির হইবামাত্র তাহারা তাহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া ফেলে এবং একটা ঠোঙার মত জিনিসে কি একটা ঔষধ ঢালিয়া শুঁকাইয়া থাকে।

বিপিনের স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশী জগমোহন যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, তখন দস্যুগণ বিপিনের গোঁফ ও জুলফি কামাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিবরণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

একটু পরেই স-দারোগা জগমোহন আসিয়া হাজির হইল।

গম্ভীরভাবে সব শুনিয়া দারোগাবাবু কি সব টুকিয়া লইলেন।

তাহার পর হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"অদ্ভুত কাণ্ড! যাক, আর কোন ভয় নেই।"

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

দারোগাবাবু লোক ভাল।

জগমোহনের বন্ধু। নাট্যামোদী।
যে নাটকটি অভিনয় হইবে তাহাতে তিনিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।
জগমোহন আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিল এবং বলিল
—"দে একটা বিড়ি দে।"

● প্রথম শতক ●

চৌধুরী

পুরা নাম কংসারি চৌধুরী।

লোকে সংক্ষেপে বলে, চৌধুরী।

বহুকাল পূর্বে কংস চৌধুরীকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই একবার দর্শনের ফলেই মনের মধ্যে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল তাহা আজও মুছে নাই। মনে হইয়াছিল, যেন একটা সিংহ অথবা শার্দুল মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছে।

ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখখানা।

আরক্ত চক্ষু দুইটি জাজ্বল্যমান।

ভ্রূযুগল-মধ্যে রক্ত সিন্দূরবিন্দু।

একমাথা কোঁকড়ানো বাবরি চুল—মাঝখানে সিঁথা।

শক্তিব্যঞ্জক মাংসল ওষ্ঠাধরে স্পর্ধা-ক্রূর নীরব হাস্য।

হাসিলে অথবা কথা কহিলে উগ্র সাদা শ্বাদন্তগুলি চকচক করিয়া উঠে, নাসিকা কম্পিত হইতে থাকে।

ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল।

দুই

একবার মাত্র দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াছি অনেক। বস্তুত এই স্বল্পভাষী দুর্ধর্ষ লোকটির সম্বন্ধে নানা কাহিনী না শুনিয়াছেন এমন লোক এ অঞ্চলে বিরল।

সমস্ত কাহিনীরই মূল কথা এক।

চৌধুরীকে কেহ কখনও কোন বিষয়ে হটাইতে পারে নাই।

চৌধুরী গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি প্রবল প্রতাপশালী জমিদার।

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী"—শিরোনামাসম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাঁহার দরবারে পৌছিতেছে।

দুর্দান্ত কর্মী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সর্বপ্রধান কথা এই যে, তিনি অপরাজেয়।

কখনও কাহারও কাছে হার মানেন নাই।

জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ, খোসামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল—কার্যসিদ্ধির জন্য যখন যেটার প্রয়োজন কাজে লাগাইয়াছেন।

কিছুতেই চৌধুরী পশ্চাদ্‌পদ হইবার পাত্র নহেন।

দারোগা, উকিল, ডাক্তার, হাকিম সকলেই চৌধুরীর নামে তটস্থ—সকলেই তাঁহার করায়ত্ত।

চৌধুরী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাস্য করিয়া বলিতেন—

"জুতো মারব আর কাজ আদায় ক'রে নেব। চামড়ার জুতোয় না কুলোয় চাঁদির জুতো লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে সব।"

এবং সত্যই সব ঠিক হইয়া যাইতেছিল!

চৌধুরী করেন নাই কি?

গ্রামে পিতার নামে স্কুল-স্থাপন, মাতার নামে অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ—এমন কি শিশুহত্যা পর্যন্ত।

যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

এ-দেশে এরূপ অদম্য চরিত্র সত্যই বিস্ময়কর।

একটা গরুর গাড়ি যেন মন্ত্রবলে মোটরের গতি লাভ করিয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সকলেই আমরা আশ্চর্য হইতাম।

লোকটা কখনও কোন বিষয়ে হার মানিল না!

হাতীর মুখে লাগাম লাগানো যায় না বলিয়া চৌধুরী হাতীই চড়িতেন না।

তিন

হঠাৎ কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল।

চৌধুরী সহসা অন্ধ হইয়া গেলেন।

অকস্মাৎ।

চতুর্দিক হইতে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য আসিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন—দৃষ্টিশক্তি আর ফিরবে না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন—"কিছুতেই না?"

"না।"

"লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও না?"

"না।"

একটা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে চৌধুরী তাঁহার বিশ্বাসী দেওয়ানকে বলিলেন—"বল কি হে, পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্যন্ত হার মানতে হ'ল!"

দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরী আবার বলিলেন—"আচ্ছা যাও। তুমি ওষুধটা নিয়ে এস—"

দেওয়নাজী চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই ফিরিয়া দেখেন, বাড়িতে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চৌধুরীর রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটাইতেছে।

রিভলভার দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

গুলি করিয়াছেন চোখেই!

ভোম্বলদা

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

দেখা হলেই মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠে। হাতে এক টিপ নস্য লইয়া এবং নাকের আশপাশে নস্য লাগাইয়া ভোম্বলদা সকাল হইতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরিচিত পথিকমাত্রকেই সহাস্য মুখে সম্ভাষণ করেন।

ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য।

"মাতুল যে, মাছ কত ক'রে কিনলে? গ্র্যাণ্ড মাছ তো! ছ আনা সের? বল কি!"

"বাজার-দর অবশ্য আট আনা, আমি পেয়েছি ছ আনাতে।"

ভোম্বলদা সবিস্ময়ে বলিলেন—"ড্যাম চীপ্!"

সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন বলিয়া মাতুলের অহঙ্কার আছে। কেহ সে কথার উল্লেখ করিলে তিনি খুশী হন। মাতুলের কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ছিল না—আপিস আছে। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

"ভূতো যে রে, মাছ কিনেছিস দেখছি—কত ক'রে পেলি? ছ আনা সের? ড্যাম—"

ভোম্বলদার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ভূতো সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—"আর বল কেন ভোম্বলদা! আমাদের মত লোকের লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়াই উচিত হয়েছে এবার। ছ আনা সের মাছ? কিনে খেতে পারি আমরা!"

ভোম্বলদার চক্ষু কপালে উঠিল।

"ছ আনা সের! বলিস্ কি রে! গলা কাটছে বল্!"

ভূতো বলিতে লাগিল—"আধ সের কিনেছি—এই দেখ না—বড় জোর চার-পাঁচ পিস্ হবে—তিন গণ্ডা পয়সা অর্থাৎ টুয়েল্ভ্ পাইস কিন্তু সাফ হয়ে গেল।"

"দিনকাল বড় খারাপ পড়ল—সত্যি।"

বলিয়া ভোম্বলদা সশব্দে নস্যটা টানিয়া লইয়া নস্যাভিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

"এক টিপ আমাকে দাও ভোম্বলদা। আমার নাকেই ঢুকিয়ে দাও—দুটো দুটো হাতই জোড়া আমার—"

"এই যে, টান ভাল ক'রে—"

ভোম্বলদা এক টিপ নস্য ভূতোর নাসারন্ধ্রে ধরিলেন।

ভূতো যথাসম্ভব টানিয়া চলিয়া গেল।

অদূরে অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।

অক্ষয়বাবু কংগ্রেস-সেবক এবং উগ্র খদ্দরধারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডা এবং সেই সূত্রে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

কাছে আসিতেই করতল হইতে নস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভোম্বলদা সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

"অক্ষয়বাবু, কাল আপনার বক্তৃতাটা সত্যিই চমৎকার হয়েছিল—যাকে বলে হৃদয়গ্রাহী। আরে এ যে গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি করিয়েছেন—খদ্দর নাকি? দেখি, দেখি —বাঃ—"

পাঞ্জাবির কাপড়টা হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ভোম্বলদা বলিলেন—"বাঃ! এ যে প্রায় সার্জের মতন। চমৎকার জিনিস তো!"

চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া মোটা গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করার মতন ধরনে অক্ষয়বাবু বলিলেন—"সার্জই হোক আর চটই হোক, খদ্দরই এখন আমাদের একমাত্র গতি—উপায় নেই এ ছাড়া—"

বলিয়া চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছোট করিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব কায়দা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা বলিলেন—"সে কথা আবার বলতে! দেশের জন্যে আপনারা যে প্রাণপাত করছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশের বুকে। স্যাক্রিফাইস্ না হলে কিছু হয়? খদ্দরটা কিন্তু বেশ চমৎকার। খাপির ওপর বেশ ইয়ে—কত ক'রে গজ?"

"দেড় টাকা বোধ হয়। ঠিক মনে নেই।"

"দামও তো এমন কিছু বেশী নয়—বাঃ!"

"ছাড়, একবার নিবারণ ঘোষালের ওখানে যেতে হবে। লোকটা শুনছি অ্যান্টি-কংগ্রেস প্রোপাগাণ্ডা করছে!"

ভোম্বলদা পাঞ্জাবির কাপড়টা দেখিতেছিলেন, ছাড়িয়া দিলেন।

দেখা দিলেন দয়াময় খুড়ো। খুড়ো রাস্তার ও-পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভোম্বলদা হাঁকিলেন—"খুড়ো, পাশ কাটাচ্ছ যে! খবর সব ভাল তো?"

খর্বকায় বালাপোশ-আবৃত খুড়ো রাস্তাটা পার হইয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—"খবর আর কি! সূর্য চন্দ্র এখনও উঠছে, ভালর মধ্যে এই। সারা বাজারটা ঢুঁড়ে বিলিতি গরম মোজা একজোড়া পেলাম না হে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ হে। আগে সেই যে সাদা—একটু হল্‌দেটে-গোছের একরকম মোজা আসত! একজোড়া কিনলেই নিশ্চিন্দি! প'রেও আরাম—টেঁকেও অসম্ভব। গত বছরের আগের বছর কিনেছিলাম একজোড়া। ঠেসে-মেড়ে দুটি বছর পায়ে দিয়েছি। এ বছর কিন্তু আর পাচ্ছি না। ঐ যে মোড়ে এক ডেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান করেছে—সে তো লম্বা এক লেকচারই ঝেড়ে দিলে—বিলিতি কেনা উচিত নয়। সে কি আমাকে শেখাবি তুই? কিন্তু ওরকম মোজা বার করুক দিকি দিশি—দেখাক দিকি আমাকে!"

বলিয়া রোগা দয়াময় খুড়ো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তটি চক্রাকারে নাড়িয়া দিলেন।

ভোম্বলদা সহাস্যমুখে কিছুক্ষণ দয়াময় খুড়োর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কৌটা হইতে এক টিপ নস্য লইতে লইতে চাপা কণ্ঠে চুপি-চুপি বলিলেন—"সব কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই আজকাল খুড়ো—এইমাত্র অক্ষয়বাবু গেলেন। বিলিতি জিনিসের তুলনা আছে? যাকে বলে, মার নেই। কাকে বলি বলুন! আজকাল অক্ষয়বাবুদেরই পোয়া বারো। দিনকাল যা পড়ল ভাল জিনিস মেলাই দুর্ঘট!"

ভোম্বলদা এমন একটা মুখভাব করিলেন যেন মনের গোপন কথাটি দয়াময় খুড়োর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিয়া তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

খুড়ো বলিলেন—"ঐ যে বললাম, আজকাল ভালর মধ্যে এই যে চন্দ্র সূর্য এখনও উঠছে। যাই, দেখি, মাড়োয়ারীদের দোকানগুলো খুঁজি একবার। থাকলে ঐ ব্যাটাদেরই ওখানে থাকবে। শীতও বেজায় পড়েছে হে। চাকরির কিছু হ'ল?"

"কই আর কিছু হ'ল!"

খুড়ো গেলেন।

আসিল ফণী।

চতুর্দশবর্ষীয় একটি বালক—স্থানীয় স্কুলে পড়ে।

তাহার সহিতও ভোম্বলদা ফুটবল খেলা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন, তাহাকেও এক টিপ নস্য দিলেন। তাহাদের স্কুলের টীম সেদিন ম্যাচে ছয় গোলে হারিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ যে রেফারির পক্ষপাতিত্ব, সে বিষয়েও তাহার সহিত একমত হইলেন।

ফণী চলিয়া গেলে আসিলেন টেকো ভট্চায।

ভট্টাচার্য মহাশয় আধুনিক ছেলেছোকরাদের নিন্দাবাদে সর্বদাই শতমুখ। তিনি আসিয়াই আধুনিক ছেলেমেয়েদের ধর্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচার প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং ভোম্বলদার আন্তরিক অনুমোদন পাইলেন।

একটু পরেই অতি আধুনিক ছোকরা বিমল আসিল এবং ধর্মই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং সস্তার মধ্যে মুর্গীর ডিমই যে নির্ভেজাল শ্রেষ্ঠ খাদ্য ইহা লইয়া আলোচনা করিল এবং সেও ভোম্বলদার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল।

এইরূপ অনেকেই আসিল এবং গেল।

নস্যের টিপ হাতে ভোম্বলদা সারা সকালটা মোড়ে দাঁড়াইয়া সকলের সাহত সকল বিষয়েই একমত হইলেন।

ভোম্বলদার মনটি যেন জলবৎ—যখন যে পাত্রে রাখা যায় তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার চাকুরিটি গিয়াছে। আপিসে বড়বাবুর কাছে ছোটবাবুর সম্বন্ধে এবং ছোটবাবুর কাছে বড়বাবুর সম্বন্ধে এমন সব কথা সারল্যভরে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে, উভয়েই তাঁহার উপর মর্মান্তিক চটিয়া যান—ফলে চাকুরিটি যায়।

ভোম্বলদা সকলের মন রাখিয়া কথা বলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কখনও কাহারও মন পান না। সকলেরই সকল কথায় সায় দেন, কিন্তু কেহই যেন তাঁহাকে আমল দেয় না। এমন কি, নিজের গৃহিণীও নয়। বাড়িতে সকল প্রকার আচরণের সহিত সায় দিতে গিয়া এবং পরস্পরবিরোধী কথা বলিয়া ফেলিয়া ভোম্বলদা গৃহিণীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ইহা লইয়া এত অশান্তির সৃষ্টি হয় যে, ভোম্বলদা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

তখন ভোম্বলদার মুখখানি দেখিলে সত্যই বড় কষ্ট হয়।
তাঁহার তরল মনটি কিছুতেই যেন কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।
অসহায় বিপন্ন মুখচ্ছবি !
দূরে গঙ্গার ওপারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।
সরল গোলগাল মুখখানি বিমর্ষ।
হাসি নাই।

মানুষ

অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলাম।

গঙ্গা-বক্ষে সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণনাতীত বর্ণসমারোহ। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্নসায়রে নিমগ্ন। সাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্তত উড্ডীয়মান মাছরাঙা পাখীগুলি সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত। টলমল নদীজল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।

প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শোভা।

তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়।

দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধর-দেহ একটি গাভী।

আর একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার।

দেবালয়ে করুণ সুরে নহবৎ বাজিতেছে।

পূরবীর অপরূপ আলাপ।

চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিলাম।

ভাবিতেছিলাম—কি সুন্দর এই পৃথিবী!

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

আমার পিছনে কে যেন জড়িতকণ্ঠে কথা কহিল।

ফিরিয়া দেখি, একটি ভিখারী এবং তাহার সহিত একটি মেয়ে।

ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।

নাসিকার স্থানে একটি গহ্বর।

বিকৃত বীভৎস মুখখানায় মিনতি ফুটাইয়া আনুনাসিক কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে।

"একটি পয়সা বাবু—"

সঙ্গের মেয়েটিও সে কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

মেয়েটির বয়স ষোল-সতরো।

শরীরে কোন ব্যাধি আছে বলিয়া মনে হইল না।

পরনে একটি মাত্র বসন—শতচ্ছিন্ন।

বসনের শত ছিদ্রপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।

দারিদ্র্যের মলিনতায় তাহা লাঞ্ছিত।

তবু তাহা যৌবনশ্রী।

মেয়েটিও সে সম্বন্ধে সচেতন।

তাহার মুখ-চোখ ভাবভঙ্গী ইঙ্গিতময়।

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিনী ইতিপূর্বে আরও দেখিয়াছি।

কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।

ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্য।

ক্ষুধার অন্ন চাই।

ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।

সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে—আর একজন যৌবনকে।

দুজনকেই দুটি পয়সা দিলাম।

চলিয়া গেল।

কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে।

মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছুদূর গিয়া সে আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।

মুখে মুচকি হাসি।

নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

তাহার ছিন্ন বসনের শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার।

সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, বিড়ালটা একটা ইঁদুর ধরিয়াছে।

ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল।

গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম, দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।

তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।

আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষ মেলিয়া সারি সারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পাল-তোলা নৌকাগুলি দেখিলাম জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পশ্চিম দিগন্ত চাহিয়া দেখিলাম।

আলোক-সমারোহ আর নাই।

অস্তমিত রবির বর্ণ-সমারোহ চক্রবালরেখায় ম্রিয়মাণ।

অন্ধকার নামিতেছে।

উঠিয়া পড়িলাম।

পথে দেখিলাম, সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিনী একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাস্য-পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বাড়ি ফিরিয়া শুনিলাম, পাশের বাড়ির বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আনন্দ-শঙ্খধ্বনি সে শুভবার্তা ঘোষণা করিতেছে। সদ্য-পুত্রশোকাতুরা আমার গৃহিণী সজলচক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান বাঁচাইয়া রাখ।

অন্যমনস্কভাবে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজগুলো উল্টাইতে লাগিলাম।

বহু বাধাসত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

বহু বিফলতাসত্ত্বেও আর একদল দুঃসাহসী এভারেস্ট অভিযানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

চীন-জাপান-যুদ্ধ।

স্পেন।

বাঙালীর দুর্গতি ও তাহার নানা প্রকাশ।

কংগ্রেস—

দুয়ারে কড়া নড়িয়া উঠিল।

পিওন তার আনিয়াছে। সুসংবাদ। আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এই চাকুরিটির জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকুরিটি পাইয়াছে।

এত বড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না।

উপরন্তু খুশী হইলাম।

ছাদে উঠিলাম।

কালো মেঘের স্তর-ভেদ করিয়া অপরূপ শোভায় চাঁদ উঠিতেছে।

পূর্বদিগন্ত জ্যোৎস্না-পুলকিত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার জন্য একটি সিগারেট ধরানো প্রয়োজন।

পকেটে হাত দিয়া দেখি, সিগারেট-কেস খালি।

সিগারেট আনিতে ভুলিয়াছি।

আবার মনটা বিগড়াইয়া গেল।

উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আমি আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।

চিত্রচতুষ্টয়

সকাল সাতটা। বেচুবাবু ত্বরিতপদে পথ অতিবাহন করিতেছেন। অনেক দুর তাঁহাকে যাইতে হইবে। শুধু যাইতে হইবে নয়—ফিরিয়া আসিতে হইবে। এবং আহারাদি করিয়া আপিসের জন্য নয়টার মধ্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। বেচুবাবুর পরনে ফতুয়া এবং থান। পায়ে মলিন কেড্‌স্। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ। চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা—তাহার একটি ডাঁটি শ্লথ হইয়া যাওয়াতে সূতা দিয়া বাঁধা। হস্তে একটি ছোট থলি। কৃশ দেহটা একটু কুব্জভাবে সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই নাতিসমর্থ শরীর লইয়াও বেচুবাবু বেশ হাঁটিতে পারেন। দ্রুত-পদেই চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য বাজার করা। পাড়ার নিকটে যে বাজার আছে সেখানে তিনি যাইতেছেন না। তিনি একটু দূরের বাজারে চলিয়াছেন। কাল আপিসে শুনিয়াছেন সেখানে নাকি আলুর দাম সের-পেছু দুই পয়সা করিয়া কম। বেচুবাবুর প্রত্যহ আধ সের করিয়া আলুর খরচ। আলুর জন্য প্রত্যহ এক পয়সা অধিক ব্যয় করা বেচুবাবুর পকেটের পক্ষে অসম্ভব নহে—মনের পক্ষে অসম্ভব। সস্তায় জিনিস কেনা বেচুবাবুর ব্যসন—উহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র গর্বের বস্তু। আপনি যে জিনিস চার আনায় খরিদ করিবেন, বেচুবাবু যেমন করিয়া হোক তাহা সাড়ে তিন আনায় অথবা খুব বেশী হইলে পৌনে চার আনায় কিনিয়া আনিবেনই। ইহার জন্য তাঁহাকে যদি সমস্ত কলিকাতা শহরটা চষিয়া ফেলিতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত।

দুই

সতীশবাবুও চলিয়াছেন। তাঁহারও গতি বেশ দ্রুত। বগলে একখানি খাতা, লংক্লথের পাঞ্জাবির বুক-পকেটে ফাউন্টেনপেন গোঁজা। বেশবাসে অসাধারণত্ব কিছু নাই। চকিতে একবার হাতঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। সতীশবাবুর গতিবেগ আর একটু বাড়িল। ঠিক সাতটার সময় অখিলবাবুর সহিত তাঁহার এনগেজমেণ্ট আছে। ভদ্রলোক বাহির হইয়া না যান। সতীশবাবু বাঁ দিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। সে গলিটা উর্ধ্বশ্বাসে

পার হইয়া আর একটা গলিতে ঢুকিলেন। অখিলবাবুকে যেমন করিয়া হোক ধরিয়া আজই বইখানা হস্তগত করিতে হইবে।

সতীশবাবু ইতিহাসের গবেষক। অখিলবাবুর নিকট একটি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন। এই বইখানি পাইলে গবেষণা-ঘটিত একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তারিখ লইয়াই যত গোলমাল। তারিখ নির্ভুল হওয়া চাই।

তীরবেগে সতীশবাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গভীর নাসারন্ধ্রে প্রচুর নস্য প্রবেশ করাইয়া আরক্ত সজল নয়ন দুইটি তুলিয়া যোগীনবাবু পাশের দোকানের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সওয়া সাতটা।

সুতরাং আর দেরি করা অনুচিত।

স্থূল বপুটিকে সঞ্চালিত করিয়া তিনি থপ্ থপ্ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেক দূর যাইতে হইবে। ট্রামে অথবা বাসে যাইবার মত পয়সা সঙ্গে নাই। যোগীনবাবুর দেহটি যদিও অত্যন্ত স্থূল—মন কিন্তু সূক্ষ্মমর্মী। অত্যন্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক তিনি। নিরামিষাশী। প্রত্যহ বহু স্তোত্র ও বহু মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তবে জলগ্রহণ করেন। হিমালয় হইতে জনৈক ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসী কলিকাতা শহরে কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারই সন্দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় যোগীনবাবু চলিয়াছেন। প্রত্যহ সকাল সাতটা হইতে আটটা পর্যন্ত তিনি দর্শন দিয়া থাকেন। কাল যোগীন-বাবু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন। আজও বোধ হয় হতাশ হইতে হইবে। সওয়া সাতটা তো বাজিয়া গিয়াছে। গোয়াবাগান কি এখানে!

যোগীনবাবুর সূক্ষ্মমর্মী মন আড়াই মণ ওজনের মেদস্তূপটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া গোয়াবাগানের উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল।

চার

"দুশ্ শালা তোর জন্যেই তো দেরি হ'ল।"

শ্যালক দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিলেন।

দুইজনেই অবিবাহিত।

শ্যালক বলিলেন—"রাগ করিস নি ভাই অতুল, বউদির কাছ থেকে পয়সা বার

করা কি সোজা কথা! তুই ভাই কিনে রাখিস, আমি ঠিক পাঁচটার সময় তোর বাড়ি যাব। কেমন? আমাকে আজ আবার বাজার করতে হবে—ঝি মাগী আসে নি।" অতুলের হস্তে একটি টাকা দিয়া শ্যালক একটি গলিতে অন্তর্হিত হইল। অতুল পাশের পানের দোকানটায় দেখিল, প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। এতক্ষণ হয়তো ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

অতুলও দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। পরনে হাফ প্যাণ্ট—গায়ে গেঞ্জি—পায়ে কিছু নাই।

সিনেমার টিকিট কিনিতেই হইবে।

যে অভিনেত্রীর অর্ধনগ্নরূপ এক মাস ধরিয়া দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজে কাগজে আবির্ভূত হইয়া অতুলকে উন্মাদপ্রায় করিয়া তুলিতেছে, তিনি আজ ছায়ালোকে অবতীর্ণ হইবেন।

ক্ষিপ্রপদে অতুল চলিয়াছে।

পাঁচ

বেচুবাবু, সতীশবাবু, যোগীনবাবু এবং অতুল—কয়েক মিনিট আগে পরে একই বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, ইঁহারা সহোদর।

একই মাতৃদুগ্ধে পুষ্ট।

পিতা হরিচরণবাবু চিত্রকর ছিলেন।

বাঘা

বাঘা তেঁতুল নয়, কুকুর। নিতান্তই দেশী কুকুর। নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কর্ণ, রোম বা পুচ্ছে বৈদেশিক কোন প্রকার ভব্যতা বা বৈচিত্র্য নাই। সাধারণ দেশী কুকুর—তবে চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পর্যাপ্ত আহারপুষ্ট। বাঘাকে সহসা দেখিলে অপরিচিত কোন ব্যক্তির মনে ত্রাস সঞ্চার হয়তো হইতে পারে, কিন্তু যে বাঘার একবার পরিচয় পাইয়াছে সে বাঘাকে দেখিয়া বিচলিত হইবে না। কারণ বাঘার মত অমন একটি ভীতু কুকুর সচরাচর দেখা যায় না। পট্‌কা ছুঁড়িলে বাঘা হুড়মুড় করিয়া তক্তাপোশের তলায় ঢুকিয়া পড়ে, মাথা চুলকাইলে ছুটিয়া পালায়, ভাবে ঢিল ছুঁড়িল বুঝি! কারণে অকারণে তাহার লাঙ্গুলটি সর্বদাই প্রায় পিছনের পদদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অপাতদৃষ্টিতে ইহাই বাঘার পরিচয়। বেচারা বাঘা নিজের নাম সার্থক করিতে পারে নাই।

কিন্তু শিরোমণির মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও জ্ঞান থাকিলে অন্য পরিচয় পাওয়াও সম্ভব। শিরোমণি মহাশয়ের মারফত তারিণীচরণ সে পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে চলিতেছিলেন। তারিণীচরণই বাঘার মনিব। মনিব না বলিয়াই ভৃত্য বলাই অবশ্য সঙ্গত। কারণ ভৃত্যের মতই তিনি বাঘার সেবাপরায়ণ ছিলেন। আমি ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিলাম। শিরোমণি প্রমুখাৎ আমিও বাঘার সত্য পরিচয়টি জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

দুই

ঘটনাটি এই।

বাঘা যখন শিশু, তখন তাহার গোল-গাল নাদুস-নুদুস চেহারাটি দেখিয়াই সম্ভবত তারিণীচরণ তাহাকে পুষিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। অধিকাংশ দেশী জিনিসের মত শৈশবে বাঘারও বেশ একটা জৌলুস ছিল। তারিণীচরণ মুগ্ধ হইলেন এবং বাঘাকে আনিয়া গৃহে স্থান দিলেন। কুকুরছানা পুষিলেই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা সকলেরই মনে বোধ হয় জাগরূক হয়। তারিণীচরণেরও হইয়াছিল।

একটি পাতলা শিকল সহযোগে তারিণীচরণ বাঘাকে উঠানে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাঘা তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। এমন সময় শিরোমণি আসিয়া দেখা দিলেন। যথাবিধি খানিকক্ষণ বসিলেন, তামাক খাইলেন এবং রোরুদ্যমান কুকুর-শাবকের প্রতি দুই-একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেলেন। সেদিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাহার পরদিন ভোরে আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তারিণীচরণকে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হইল। প্রথমে আসিয়াই শিরোমণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুকুরশাবকটিকে বেশ খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর তারিণীচরণকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, সরোজের মৃত্যু এক বছর হ'ল না?" তারিণীচরণের অগ্রজ সরোজকুমার এক বৎসর পূর্বেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা।

সুতরাং তারিণী বলিলেন—"হ্যাঁ, তা হবে বইকি। কেন বলুন তো?"

"সরোজের কুষ্ঠি আছে? সেখানা দিতে পার একবার আমাকে?"

"কেন বলুন তো?"

"কুষ্ঠিটা দেখি আগে, তারপর বলছি।"

তারিণীচরণ ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং খানিকক্ষণ খুঁজিয়া মৃত সরোজের কোষ্ঠি-খানি আবিষ্কার করিয়া শিরোমণি মহাশয়কে সেটি আনিয়া দিলেন। শিরোমণি সেটি প্রসারিত করিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসুক তারিণীর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি বলিলেন —"কুকুরবাচ্চাটিকে খুলে দাও।"

"কেন বলুন তো?"

"ও সরোজ। কুকুরযোনি-প্রাপ্ত হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। যত্ন-আত্তি ক'রো ওকে। আর একটা স্বস্ত্যয়ন করানোও দরকার। পরজন্মটায় যাতে সদ্গতি হয়। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!"

শিরোমণি উঠিয়া পড়িলেন।

বিহ্বল তারিণী তাড়াতাড়ি গিয়া বাঘাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাঘার বন্দিত্ব ঘুচিল।

বাঘা যদি মানুষ হইত তাহা হইলে অবিশ্বাসী লোকে সন্দেহ করিত যে, বাঘা বোধ হয় শিরোমণিকে ঘুষ দিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিরোমণির আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় যথাকালে স্বস্ত্যয়নও হইয়া গেল। সেই হইতেই বাঘা বন্ধনমুক্ত।

বস্তুত সেই বাঘার সুখের দশা পড়িল। তারিণীচরণ কুকুরযোনি-প্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। সরোজ অকৃতদার ছিলেন। সুতরাং সরোজের বিধবার আদর-যত্ন লাভে বাঘাকে যদিও বঞ্চিত হইতে হইল, কিন্তু তারিণীচরণ ভ্রাতৃভক্তির যেরূপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন তাহাই বাঘার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপর বিধবা থাকিলেও বাঘা স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর হইত কিনা সন্দেহ।

সুতরাং বাঘা সুখে ছিল।

তারিণীচরণ এবং শিরোমণিও সুখে ছিলেন।

পরস্পর দেখা হইলে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন প্রায়ই হইত।

"সরোজ ভাল আছে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কর্তব্য ক'রে যাও—ফলাফল ভগবানের হাতে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—যথাসাধ্য ক'রেই যাচ্ছি।"

করিতেওছিল।

এই ভাবেই চলিতেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বোধ হয় চলিতও। কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। রিট্রেঞ্চমেন্টের ধাক্কায় বেচারী তারিণীচরণের চাকরিটি টিকিল না। যদিও অন্নবস্ত্রের জন্য তারিণীচরণকে কোনদিন চাকরির উপর নির্ভর করিতে হয় না, তবু বেচারার একটু কষ্ট হইল বইকি। যদিও তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই, জমিজমা কিছু আছে, তথাপি আজকালকার বাজারে মাসিক চল্লিশ টাকা আয় নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত নহে। তারিণীচরণ একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে তাঁহার এই বিমর্ষভাবটা হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু বাঘা কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে অন্নজল ত্যাগ করাতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তারিণীচরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

শিরোমণি শুনিয়া বলিলেন—"ও অন্নজল ত্যাগ করবে না? হাজার হোক দাদা তো! তা ছাড়া তুমি যে ওর প্রাণ ছিলে ভায়া! তোমার চাকরি গেছে শুনে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না তো কে করবে?"

শিরোমণির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তারিণীচরণ আগে হইতেই কাঁদিতেছিলেন।

শিরোমণি চক্ষু-মার্জনা করিয়া বলিলেন—"যাই হোক, খাওয়াবার চেষ্টা কর তুমি। তুমি অনুরোধ করলে ঠিক খাবে।"

শুনিলাম, বাঘা একটা অন্ধকার ঘরের কোণ আশ্রয় করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহা দেখিবার সুযোগ তখন আর ঘটিল না। আপিস খুলিতেই শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইল।

চার

কয়েকদিন পরে হঠাৎ এক জরুরি তার পাইলাম—"অবিলম্বে চলিয়া এস।"

তার করিতেছেন আমার গৃহিণী অর্থাৎ শিরোমণির ভগিনী।

যাইতে হইল। গিয়া শুনিলাম, বাঘা তারিণীকে কামড়াইয়াছে।

সে কি! আরও শুনিলাম, বাঘা তারিণীকে কামড়াইয়া মারা গিয়াছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ডাক্তার ডাকিলাম।

ডাক্তারটি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।

সুতরাং বলিলেন—"দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই।"

এখন সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে হরিসংকীর্তন হইতেছে।

জৈবিক নিয়ম

বেচারার দোষ ছিল না। এমন অবস্থায় সব যুবকই এমনই করিয়া থাকে। জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্মই এই। মনে হয় বুকটা একটু ফুলাইয়া চলি, মাথাটা একটু উঁচাইয়া রাখি। হাব-ভাবে চলনে-বলনে পৌরুষের মাহাত্মটা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক। মেয়েটি তাহা দেখুক, অনুভব করুক, একবারও অন্তত মনে মনে ভাবুক—বাঃ, বেশ ছেলেটি তো! অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে, পেশীগুলির মধ্যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়, শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে, বাহুল্যে ও আতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে-অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাহা নিজস্ব ধরনে, নিজস্ব ভঙ্গীতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।

সেদিন প্ল্যাটফর্মে রোগা-গোছের ছোকরাটি তাহার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও যাহা করিতেছিল, তাহা এই সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতেই করিতেছিল। নিরপেক্ষ-ভাবে নিরীক্ষণ করিলে ছোকরাটির মধ্যে তেমন অসাধারণ কিছু ছিল না। সাদা টুইলশার্ট-পরা উনিশ-কুড়ি বছরের একটি রোগা ছোকরা। গোঁফ উঠি-উঠি করিতেছে, পায়ে সস্তা চটকদার একজোড়া স্যাণ্ডাল।

অদূরে বেঞ্চে একটি কমবয়সী মেয়ে বসিয়া আছে।

স্টেশনটি ছোট।

প্ল্যাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জনচারেক যাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে জন দুই সাঁওতাল। তাহারা মোট-ঘাট লইয়া একটু দূরে বসিয়া ছিল। বাকি দুইজনের মধ্যে একজন ওই রোগা-গোছের ছোকরা এবং আর একজন ওই তরুণীটি। এদিকে ওদিকে দুই-একটি কুলি ও ফেরিওয়ালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রেলের বাবুরা নিজ নিজ কামরায় কাজ করিতেছেন। এই নিরীহ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ছোকরাটির অন্তরে কেমন যেন একটা উদ্দীপনা অকারণে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোকরাটি অবশ্য মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

উত্তেজনার আধিক্য সম্ভবত সেই জন্যই।

ছোকরা কণ্ঠস্বরকে অকারণে অসম্ভব রকম পরুষ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "কুলি, কুলি—এই কুলি—"

একটি কুলি আসিল।

"কি বাবু?"

"আমার মোটটা ট্রেনে উঠিয়ে দিবি। বুঝলি?"

"আচ্ছা বাবু।"

"কত নিবি?"

"চার পয়সা বাবু।"

"চার পয়সা কেন, চার আনা দেব তোকে! ভাল দেখে একটা গাড়িতে চড়িয়ে দিস—কেমন?"

বিস্মিত কুলি বলিল—"আচ্ছা বাবু।"

"ঠিক পারবি তো?"

"ঠিক পারব বাবু।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

ছোকরা কুলির পিঠটা চাপড়াইয়া দিল।

"কোন্‌টা আপনার মোট বাবু?"

একটি ছোট স্যুটকেস ছাড়া অবশ্য অন্য কোন গুরুতর মোট ছিল না। ছোকরা তাহাই দেখাইয়া দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—"ট্রেন আজ লেট্‌ আসছে নাকি?"

"আধ ঘণ্টা লেট্‌ বাবু।"

"রিপোর্ট করব আমি।"

কাহার কাছে এবং কাহার নামে রিপোর্ট করিবে তাহা অবশ্য অনুক্তই রহিল।

কুলি চলিয়া গেল।

ছোকরা দৃপ্তভাবে রোষকষায়িত লোচনে তরুণীর সম্মুখে খানিকক্ষণ পদচারণা করিল এবং কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া রুষ্টভাবটা একটু প্রশমিত হইলে মুখটি সূচালো করিয়া শিস দিতে লাগিল। খানিকক্ষণ শিস দিবার পর আবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আদেশের ভঙ্গীতে ডাকিতেছে—"সোডা—সোডা—এই সোডা—ইধার আও।"

সোডা-বিক্রেতা সমীপবর্তী হইল।

"একঠো সোডা দেও। জল্‌দি করো—"

"দাম দু আনা বাবু—"

"কুছ্ পরোয়া নেহি। দেও তুম।"

এই বলিয়া যেন দেখিতেছে না এইভাবে সে মেয়েটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। বলা বাহুল্য, মেয়েটিও ছেলেটিকে লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ চোখাচোখি হইয়া যাওয়াতে মেয়েটি তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

"লিজিয়ে বাবু—"

ফেনায়িত সোডার বোতলটা ধরিয়া কৃশ যুবকটি সগর্বে পা ফাঁক করিয়া ঊর্ধ্বমুখে সোডা পান করিতে লাগিল। সোডা পান করাটাও যেন মস্ত একটা বীরত্ব!

ইতিমধ্যে একটা চানাচুরওয়ালা আসিয়া জুটিল।

মেয়েটি ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া চানাচুর খরিদ করিতেছে দেখিয়া যুবকটিও সেই দিকে আগাইয়া গেল।

"কি দর তোমার চানাচুরের হে?"

"এক পয়সা ঠোঙা বাবু।"

"ওইটুকু ঠোঙা এক পয়সা! যে রকম সাইজ, পয়সায় চারটে ক'রে হওয়া উচিত। সিম্‌প্লি এ কাটথ্রোট! পয়সায় চার ঠোঙা ক'রে দিবি?"

"পারব না বাবু।"

"পারব না মানে?"

চানাচুরওয়ালা বলিল—"ছোলার দর আজকাল বাবু—"

ছোলার দর আজকাল কত? বেশ তো খতিয়েই দেখা যাক—"

রুখিয়া ছোকরা আগাইয়া গেল।

"ওসব কথা ছেড়ে দিন বাবু। বেকার বাত বানিয়ে ফয়দা কি! লেবেন আপনি চানাচুর? ক ঠোঙা চাই?"

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ছোকরা একবার আপাদমস্তক চানাচুরওয়ালাটাকে দেখিয়া লইল। তাহার পর বলিল—"ক ঠোঙা? তোর যত চানাচুর আছে সব নিতে পারি আমি জানিস্? কি ঠাউরেছিস তুই আমাকে!"

উত্তরে চানাচুরওয়ালা দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল।

"হাসছিস যে বড় ? কত চানাচুর আছে তোর ? দাম কত হবে ?"

"এক টাকা বাবু—"

ছোকরা তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। চানাচুর-বিক্রেতা এতটা প্রত্যাশা করে নাই। কি গভীর মনোবৃত্তি যে ছোকরাকে নাচাইতেছে তাহা মূর্খ বেচারা কি করিয়া বুঝিবে! টাকা লইয়া সে চলিয়া গেল।

এত চানাচুর লইয়া ছোকরা কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া মেয়েটিকে বলিল—"আপনি আরও কিছু নিন।"

"না—না—আমার আর চাই না।"

কুণ্ঠিতা তরুণী সলজ্জভাবে মাথা নাড়িল।

"এতগুলো নিয়ে আমি কি করব ? রেখে দিন কিছু আপনি।"—অনেকগুলি ঠোঙা সে তরুণীটির পাশে বেঞ্চিটার উপর একরকম জোর করিয়াই রাখিয়া দিল। ইহার পর দৃষ্টিকটুতা তরুণীটিকে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে বেচারা কি আর করিবে! লজ্জায় আনতনয়নে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোন ভদ্র উপায় তাহার মাথায় আসিল না।

বাকি ঠোঙাগুলি সুটকেসের উপর রাখিয়া আসিয়া ছোকরা সহাস্যমুখে বলিল—"ওগুলো ট্রেনে যেতে যেতে ধীরে-সুস্থে শেষ করবেন। কোথা যাচ্ছেন আপনি ? এই ট্রেনেই যাচ্ছেন তো ?"

মেয়েটি লজ্জা পাইয়াছিল।

মৃদুস্বরে বলিল—"আমি এর পরের ট্রেনটায় যাব।"

"ও, তাই নাকি !"

ছোকরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার পায়চারি শুরু করিল। বুক চিতাইয়া উন্নত-মস্তকে অকারণ পুলকে বেশ খানিকক্ষণ সে পদচারণ করিল।

আবার থামিল।

তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া হাতের পেশীগুলি ফুলাইয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল। পেশী অবশ্য বেশী ছিল না। কিন্তু যতটুকু ছিল ততটুকুই বা ফুলাইতে ক্ষতি কি!

একটু শিস্ দিল।

যৎসামান্য গোঁফটুকুতে দুই-একবার তাও দিল।

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল, প্ল্যাটফর্মের ওধারটায় একটা কৃষ্ণচূড়া-গাছের পুষ্পিত ডাল প্ল্যাটফর্মের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সে তখন সেই দিকে গেল এবং লাফাইয়া লাফাইয়া ডালটাকে ধরিয়া ফুল পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া কিছু ফুল পাড়িলও।

শ্রান্তদেহে একগোছা কৃষ্ণচূড়া ফুল লইয়া আবার সে মেয়েটির কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন আসিয়াছে।

কুলিটা স্যুটকেস ও চানাচুরের ঠোঙাগুলি একটা ফাঁকা গাড়িতে তুলিয়া দিয়া চার আনা পয়সাই পাইল।

ছোকরা গাড়িতে উঠিয়া জিনিসপত্রগুলি ঠিকমত রাখিয়া আবার নামিয়া আসিল।

উপবিষ্ট তরুণীটির পানে একবার চাহিয়া দেখিল।

দেখিল, তরুণীটিও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

গার্ড বাঁশী বাজাইয়া বিধিমত সবুজ নিশান নাড়িলেন।

ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল।

তখনও ছোকরা ট্রেনে উঠে না।

ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশ বাড়িয়াছে তখন সে শেষ বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য সহাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নিচে, চাকার নিচে পড়িয়া গেল।

আর কিছু করিবার সুযোগ সে পাইল না।

জ্যোৎস্না

সুন্দর জ্যোৎস্না।

পৃথিবীটাই অপার্থিব বলিয়া মনে হইতেছে। সমস্ত মনখানি স্বপ্নলোকে মেঘের মত সঞ্চরমান। লঘুভাবে সবকিছু স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে; কোথাও থামিতেছে না, কোথাও যাইবার তাড়া নাই। সময়ের স্রোত মন্থর-গতিশীল, আবিষ্ট ধীর মন্থরগতিতে সমস্ত সত্বাও ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাত্রি গভীর। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে বাতায়ন-পথে চাহিয়া আছি। সহসা স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া সশব্দে কপাটটা খুলিয়া গেল। টলিতে টলিতে একটি লোক প্রবেশ করিল। বগলে বোতল। বলিল—"এক্স্‌কিউজ মি—আমার নাম খৃষ্টচরণ খর্মখার! ভাজি দেখাব। আমি হাতি ঘোরাতে পারি। ইউ সি দিস ইজ এলিফ্যাণ্ট—নাউ সি বন্ বন্ বন্ বন্—" দুই হাতে বোতলটা ধরিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল। দারোয়ান ডাকিতে হইল।

অর্ধচন্দ্রীকৃত হইয়া কৃষ্ণচরণ কর্মকার চলিয়া গেলেন। স্বপ্নটি কিন্তু ভাঙিয়া গেল। কিছুতেই আর জোড়া লাগাইতে পারিলাম না। জ্যোৎস্নাকে জ্যোৎস্না ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিলাম না। মন লঘুতা হারাইয়া গুরু-গম্ভীর হইয়া পড়িল। অলক্ষ্যে বিধাতা বোধ হয় হাসিলেন।

দুই

তাহার পরদিন।

সেদিনও জ্যোৎস্না। আগের মতই মনোরম জ্যোৎস্না। আজ দ্বিতলের ঘরে বসিয়া ছিলাম এবং পূর্ববৎ বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া স্বপ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। দূর-দিগন্ত-রেখায় দিশাহারা মন কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। বাস্তব ও স্বপ্নের সীমারেখা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইতেছিল।

"বাবু—"

নিচে কে যেন ডাকিল। খৃষ্টচরণ নয় তো!

আজ যদি আসে, ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে লোকটাকে।

"বাবু সায়েব—"

জড়িত কণ্ঠ !

জ্যোৎস্না চুলায় গেল এবং আপাদমস্তক জ্বলিতে লাগিল।

"দারোয়ান—"

অপর একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দারোয়ান বাজারে গিয়াছে।

তাহাকে বলিলাম—"দেখে আয় তো নিচে কে ডাকছে !"

সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণ পরে আসিয়া হিন্দিতে যাহা বলিল তাহা এই : "একটা লোক বোতল বগলে দাঁড়িয়ে আছে।"

"টলছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ধাক্কা মেরে ফেলে দে ব্যাটাকে।"

যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম একটু পরে তাহাই ঘটিল। গুরুভার পতনের শব্দ ও একটা আর্তনাদ। খৃষ্টচরণের শিক্ষা হইল ভাবিয়া শান্তিলাভ করিলাম। স্বপ্ন কিন্তু টুটিয়া গেল। আজও বিধাতা হাসিলেন।

তিন

তৃতীয় রাত্রি।

আজও জ্যোৎস্না আকাশ-প্লাবিনী। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে মাঝে মাঝে তাহা লক্ষ্য করিতেছি। হাজত-ঘরের জানালাটি অত্যন্ত ছোট—ভাল করিয়া দেখাও যাইতেছে না। স্বপ্নও একটা আছে। কিন্তু তাহা উকিলের। গুঁফো পরেশবাবু। পরেশবাবু সুদক্ষ আইনজীবী। ভাবিতেছিলাম, তিনি আমাকে খালাস করিতে পারিবেন কি ? দ্বিতীয় রাত্রে আমার ভোজপুরী ভৃত্য যাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, সে খৃষ্টচরণ নহে। একটি ম্যালেরিয়া-রোগী। তাহার বগলে যে বোতল ছিল তাহা এডওয়ার্ডস্ টনিকের। বিদেশী লোক। সম্ভবত রাত্রে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল! ভোজপুরী-ধাক্কায় ক্ষুণ্ণচিত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখন পরেশবাবুই একমাত্র ভরসা। শরীর মন কিছুই ভাল নাই। মনে হইতেছে, জ্বর হইয়াছে। বিধাতার মুখে মৃদু হাসি।

চার

খালাস পাইয়াছি।

অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এডওয়ার্ডস্ টনিকের বোতলে এডওয়ার্ডস্ টনিক ছিল না—মদই ছিল। পরেশবাবুও প্রমাণ করিয়াছেন যে, লোকটা মদ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মদ জিনিসটাকে চিরকাল ঘৃণা করি। লোকটার মৃত্যুতে একটুও দুঃখ হইতেছে না। শরীরটা কিন্তু বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত হাজত-বাস করিয়া। হাকিম কড়া লোক—কিছুতেই জামিন দিলেন না।

যে ডাক্তারটির চিকিৎসাধীন আছি, তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আজও আকাশে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

সোচ্ছ্বাসে বলিলাম—"দেখুন ডাক্তারবাবু, কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ!"

বিস্মিত ডাক্তার বলিলেন—"কই, তেমন জ্যোৎস্না তো এখনও ওঠে নি!"

বলিলাম—"এইতেই কিন্তু আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।"

ডাক্তার বলিলেন—"ক'দাগ ওষুধ খেয়েছেন আপনি?"

"সবটা খেয়ে ফেলেছি।"

"সবটা? সবটা কেন খেলেন? একটু বেশী ডোজে ব্রাণ্ডি ছিল।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না!

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম, চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় থৈ-থৈ করিতেছে।

বিধাতা অট্টহাস্য করিতেছেন।

পাঁচ

দশ বৎসর পরে।

সর্বস্বান্ত হইয়াছি—যকৃতের দোষ এবং পেটে জল হইয়াছে।

অনুভূতিও আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

এখন দিবালোকেও জ্যোৎস্না দেখি।

বিধাতা গম্ভীর।

আকাশ-পাতাল

কল্পনার লুতাতন্তু বাহিয়া মাঝে মাঝে আমরা এমন এক উর্ধ্বলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হই, যেখানে সর্বপ্রকার অসম্ভবই সম্ভব এবং যাবতীয় মিথ্যাই সত্য। লুতাতন্তু কিন্তু ক্ষণ-ভঙ্গুর। সুতরাং অক্ষয় কল্পলোকবাস ঘটিয়া উঠে না। বাস্তবের মৃদুতম স্পর্শে লুতা ছিন্ন হয় এবং রূঢ় মৃত্তিকার স্পর্শ লাভ করিয়া কল্পনাবিলাসীর স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়ন সচকিত হইয়া উঠে। হইলও তাই। সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন রঙীন হইয়া উঠিল। স্বপ্ন ভাঙিয়াও গেল।

দুই

সুরমার সহিত তাহার মাত্র বছর দুই বিবাহ হইয়াছিল। অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে বিবাহ যে পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, তাহার বেলাতেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল—কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অর্থাৎ লেখা-পড়া শেষ হইতে না হইতেই পিতা-মাতা বিবাহের জন্য যথারীতি ব্যগ্র হইলেন। সেও যথারীতি একটু-আধটু আপত্তি করিল এবং আপত্তিও যথারীতি টিকিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ নানা স্থান হইতে নানারূপ মেয়ের ফটো ও কোষ্ঠি লইয়া হাজির হইতে লাগিলেন। পণ লইয়া ভদ্রভাবে খানিকটা দর-কষাকষি চলিল। অবশেষে পণ, কোষ্ঠি, রূপ, বংশ প্রভৃতির মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য করিয়া একদিন সুরমার সহিত তাহার শুভ-বিবাহ সংঘটিত হইয়া গেল। প্রীতি-উপহার ছাপানো হইল, শালপাতা পাতিয়া খাওয়ান হইল। দুই পক্ষের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব দিন-কতক হৈ-চৈ করিলেন, গোলমালে কিছু জিনিসপত্রও হারাইল। দানসামগ্রী, বধূর রূপ, কন্যাপক্ষের ব্যবহার ও নজর প্রভৃতি লইয়া মামুলি মিঠেকড়া সমালোচনা দুই-চারিদিন চলিল। অর্থাৎ যেমন হইয়া থাকে সব হইল।

তিন

সুরমাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। যে তরুণীটির হাসিতে মানিক এবং

কান্নায় মুক্তা ঝরিতেছে সে যে একান্তভাবে তাহারই—এ কথা বিশ্বাস করিতে ভয় করে, কিন্তু লোভ হয়। প্রলুব্ধ মন প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই সুরমার রঙ লইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সে সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—রঙটাই কি সব ? সুরমার রঙটা ফরসা নহে—তাহা সত্য কিন্তু লজ্জিত নয়নের স্নিগ্ধ চাহনি, আকম্পিত অধরের আলজ্জিত আকৃতি, অলক্তক-রঞ্জিত চরণ দুইখানির সরম-মন্থর গমন-ভঙ্গিমা—এসব কি কিছুই নয় ? রঙটাই সব ? সে চক্ষু বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, যদি সুরমার রঙটা আর এক পোঁচ সাদা হইত কিংবা যদি সে উজ্জ্বল গৌরবর্ণই হইত, কি এমন তফাতটা হইত তাহা হইলে ? কিছুই না। শ্যামাঙ্গিনী সুরমাই তাহার নিকট অধিকতর মনোহারিণী। সুতরাং সে ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়া দিবসে ঢুলিতে লাগিল। তাহার পর বধূ যখন বাপের বাড়ি চলিয়া গেল, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সে কিছু রঙীন খাম ও চিঠির কাগজও কিনিয়া ফেলিল। অর্থাৎ সমস্তই যথারীতি পর পর ঘটিতে লাগিল।

চার

অবশেষে সেই অনিবার্য ঘটনাটিও ঘটিল। অকস্মাৎ একদিন তাহাকে উপলব্ধি করিতেই হইল যে, অবিলম্বে উপার্জন না করিলে আর চলে না। জীবন-শকটের চক্রগুলি তৈলাভাবে আর্তনাদ করিতেছে—অনতিবিলম্বে তৈল নিষেক করা প্রয়োজন, তা সে যে তৈলই হউক। পিতামাতারূপ যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেমলিপি রচনা করিতেছিল, মহাকাল অতর্কিত-ভাবে সেই পর্বত দুইটিকে অপসারিত করিয়া লইলেন। অবারিতভাবে ঝড়-ঝাপটা ধূলি-ধোঁয়া আসিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রেমলিপি রচনায় কুশলতা প্রকাশ করিবার মত আবহাওয়া আর মিলিল না। দরখাস্ত রচনার কৌশল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে সচেষ্ট হইল এবং নানাভাবে বিনয় প্রকাশ করিয়া চতুর্দিকে আবেদন করিতে শুরু করিল।

চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে বেচারা নিশ্চয়ই পথ-ভ্রান্ত হইত যদি ভগবান চাটুজ্যে মহাশয়ের মারফত কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ না করিতেন! দূর-সম্পর্কের আত্মীয় চাটুজ্যে মহাশয় কলিকাতার কোন সদাগরী

আপিসের বড়বাবুর পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তিনিই দয়াপরবশ হইয়া তাহার চাকুরিটি জুটাইয়া দিলেন। বেতন মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা। কলিকাতায় গিয়া থাকিতে হইবে।

পাঁচ

অন্ন-সংস্থান হইল বটে, কিন্তু কাব্যসংস্থান হইল না। সুরমাকে লইয়া কাব্যলোক সৃজন করিতে হইলে যে পরিমাণ সাজসজ্জা আয়োজন উপকরণ দরকার তাহা পঁয়ত্রিশ টাকা আয়ে জোটানো অসম্ভব। বিশেষত খোলার ঘরে নিজের বিবাহিত পত্নীকে লইয়া কাব্য যেন কিছুতেই জমিতে চায় না। সুরমার যে হাসিতে মানিক ঝরিত, সেই হাসি এখন যেন ফুটিতেই চায় না, যদিও বা ক্বচিৎ ফোটে তাহাও এমন বক্রভাবে যে তাহার সহিত মানিকের উপমা দেওয়া অত্যন্ত সহৃদয় কবির পক্ষেও কঠিন। উপমা দিতে হইলে ছুরির সহিত দিতে হয়। সব দিক দেখিয়া শুনিয়া বেচারা হতাশ হইয়া পড়িল। চেষ্টার অবশ্য সে ত্রুটি করিল না। সাবান কিনিয়া দিল, ছিট কিনিয়া দিল, রঙীন শাড়িও দুই-একখানা কিনিয়া আনিল। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল কিছুই হইল না। উপরন্তু সস্তা সাবান মাখিয়া সুরমার সর্বাঙ্গ খস-খস করিতে লাগিল এবং নয়নকোণে যে অশ্রু জমিয়া উঠিল তাহার সহিত মুক্তার সাদৃশ্য হয়তো থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কবিত্ব জাগে না এটা ঠিক। এক ধোপ দিবার পর সস্তা ছিট ও শাড়ির রঙও উঠিয়া গেল এবং সুরমা একটু শ্লেষভরেই তাহাকে সে কথা জানাইয়া দিল।

মোট কথা রঙীন বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়া গেল।

ছয়

সর্বাপেক্ষা মুশকিল হইল প্রতিবেশীটিকে লইয়া। তিনি বড়লোক, তাঁহার তিনতলা বাড়ি। শুধু তাই নয়, তিনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন সেই তরুণীটি সুরমার বাল্যসখী। এই নিদারুণ যোগাযোগ ঘটাতে যে সকল নিরীহ অথচ মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিতে লাগিল তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। সুরমা অনিবার্যভাবে সখীর ঐশ্বর্যের নানা পরিচয় পাইতে লাগিল। তাহার তিন সেট গহনা, বিচিত্র রঙের বহুপ্রকার

কাপড়, মেহগিনি কাঠের ডবল বেড্‌, সুন্দর দেরাজ, আয়না-দেওয়া আলমারি। ক্রমাগত স্বামীর কাছে সে সেই ঐশ্বর্যেরই গল্প করিত। স্বামী বেচারা মনে মনে অতিষ্ঠ হইলেও মুখে বিশেষ কিছু বলিত না। কি বলিবে? তাহা ছাড়া চিরকালই সে স্বল্পভাষী।

সাত

একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, সুরমা নাই। ঠিকা ঝি বলিল যে, সুরমা পাশের বাড়ির বাবুদের সহিত তাহাদের নূতন-কেনা মোটরে চড়িয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন। দেখিল একটি বাটিতে খানিকটা হালুয়া ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। ঠাণ্ডা হালুয়াটুকু গলাধঃকরণ করিয়া দুই গ্লাস জল খাইয়া ফেলিল। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ শিস দিল এবং অবশেষে সান্ধ্যভ্রমণ করিবার ছলে গোলদীঘির জনতার মধ্যে গিয়া খানিকটা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিল। বাড়ি ফিরিয়া আসিল যখন, তখন সুরমাও ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সুরমা সিনেমা এবং সদ্য-ক্রীত মোটর প্রসঙ্গে যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহাতে সে বেচারা আর কিছু বলিতে পারিল না—বলিতে ইচ্ছাই করিল না। তাছাড়া বলিবারই বা ছিল কি!

আট

এই মোটরই শেষকালে কাল হইল। নূতন মোটর কিনিয়া মোটরের মালিকেরা স্বভাবতই একটু বেশী ঘোরাঘুরি করিতে ভালবাসেন। এই পরিভ্রমণে সুরমাও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে লাগিল। গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি নিকটের দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে তাঁহারা তো গেলেনই—সুরমাও গেল। ক্রমশ সখীর মোটরে চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়াটা সুরমার দৈনন্দিন কার্যতালিকাভুক্ত হইয়া পড়িল। দরিদ্র স্বামী বেচারা পত্নীর এই সুখে বাধা দিতে পারিল না। চাহিলও না। সে দিন দিন আরও কেমন যেন নীরব হইয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ একদিন সুরমা আসিয়া সোৎসাহে বলিল—"ওগো শুনছ, সইরা মোটর

ক'রে মধুপুর যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে। যাব ওদের সঙ্গে? যাই, কেমন?"

"মধুপুর? সে যে অনেক দূর!"

ইহার বেশী আর সে বলিতে সাহস করিল না।

সুরমা বলিল—"সইদের বাড়ির যে ঠাকুরটা আছে সে-ই তোমায় আপিসের ভাত রেঁধে দেবে ক'দিন। সই বলেছে—সে ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপিসের ভাতের ভাবনা ভাবছি না। সে তো হোটেল থেকেও হতে পারে। ভাবছি—"

সুরমা তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

বলিল—"নিজেদের পয়সায় মধুপুর যাওয়া তো কোনদিনই হবে না। সইদের সঙ্গে তবু গিয়ে দেখে আসতাম!"

"সইদের মোটরে তো রোজই চড়ছ। ভাল লাগে রোজ রোজ চড়তে?"

"ভাল লাগবে না কেন? মোটর চড়তে খারাপ লাগে নাকি কারো? খুব ভাল লাগে আমার।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সে বলিল—"আচ্ছা, যেয়ো তা হ'লে।"

নয়

দিন সাতেক পরে সুরমা যখন মধুপুর হইতে ফিরিল তখন সে হাসপাতালে। শোনা গেল রাস্তায় অন্যমনস্কভাবে চলিতে গিয়া মোটরচাপা পড়িয়াছে। বাড়িতে সুরমা একটি ক্ষুদ্র পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই:—

"আমি তোমার অনুপযুক্ত। তোমাকে লুকাইয়া একটি আড়াই হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করিয়াছিলাম। টাকাটা তুমিই পাইবে। তাহা দিয়া একখানা মোটর কিনিও—ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।"

অনুরোধ কিন্তু রক্ষিত হইল না।

কারণ সে মরিল না, হাসপাতাল হইতে সারিয়া ফিরিয়া আসিল। নাকটা কিন্তু চুরমার হইয়া গিয়াছিল। নাকের স্থানে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর ছাড়া আর কিছু রহিল না।

● প্রথম শতক ●

সুরমা আত্মহত্যা করিল।

সে এখন পাগল।

একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে 'সুরমা' লিখিয়া সেটা গলায় ঝুলাইয়া সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছে। ওই যে!

কল্পনা-লূতাতন্তু এইবার ছিন্ন হইল।

বিগতনাসা লোকটি নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—" 'সুরমা' লিখে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?"

"ও একরকম নূতন শাড়ি বেরিয়েছে বাবু, এ তারই বিজ্ঞাপন। খুব ভাল শাড়ি বাবু—সিল্কের অথচ খুব সস্তা—নানারকম রঙের পাওয়া যায়—চমৎকার জিনিস—"

খোনা স্বরে সে শাড়ির গুণবর্ণনা করিতে লাগিল।

প্রশ্ন করিলাম—"তোমার নাকে কি হয়েছিল?"

"ঘা হয়েছিল বাবু।"

বলিয়া সে একটা বীভৎস হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

স্বপ্নলোকচ্যুত আমি অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

চিঠি পাওয়ার পর

সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না।

তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব এই আশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। যাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার যে তাহাকে দেখিতে পাইব এ কল্পনাও করি নাই। সে যে এ-পথে আবার আসিতে পারে তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। সে আসিতেছে এবং আমি তাহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমার বিগতস্বপ্ন জীবন পুনরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য, যদিও তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে, তথাপি এই ঘটনাকে আমার জীবনের বৃহত্তম ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। যত কম সময়ের জন্যই হউক এবং যে-ভাবেই হউক তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব তো। তাহাই যে পরম লাভ। চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িলাম।—

শ্রীচরণেষু,

উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ি পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌঁছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেকদিন আপনাকে দেখি নি। দেখতে ইচ্ছে করে। আসবেন তো? আশা করি, আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।

—অমিতা

দুই

কিছুই ভুলি নাই।

অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি তাহাদের সমস্ত বর্ণসুষমা লইয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই দিনটির কথা, যে-দিন অনেক ইতস্তত করিয়া আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে প্রথম প্রণয়-নিবেদন করিয়াছিলাম। মনে ভয় ছিল, যদি সে ভুল বোঝে—যদি সে রাগ করে। কিন্তু সে কিছুই করে নাই, স্মিতমুখে সহজভাবে সে আমার নিবেদন শুনিয়াছিল। তাহার লজ্জারুণ কপোল,

আকম্পিত অধর, আনন্দিত নয়ন—তাহার সেদিনকার সম্পূর্ণ আলেখ্যখানি আমার মনের পরতে পরতে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। কখনও বিলুপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ সুখ মানুষের জীবনে বহুবার আসে না। আমার জীবনে একবার মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিবে না তাহাও জানি। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইবে। ভুলিলে চলিবে কেন! ভুলি নাই, একদণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না। তোমাকে এ জীবনে বহিলোকে পাই নাই তাহা সত্য, কিন্তু আমার অন্তরলোকে যে-আসন তুমি অলঙ্কৃত করিতেছ, সে আসন এখনও অবিচলিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে। তুমি তো আমাকে চাহিয়াছিলে—সমস্ত প্রাণ দিয়াই চাহিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে লইতে পারিলাম কই? তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে হইল। আমার দুর্ভাগ্য দিয়া তোমাকে লাঞ্ছিত করিতে আমি কিছুতে পারিলাম না। আমার দুর্ভাগ্য আমি একাই বহন করিব। ইহাই আমার ললাটলিপি। তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন? তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

তিন

ভগবান বলিয়া কেহ আছেন হয়তো। এই নিখিল-বিশ্বের কার্যকলাপ তাঁহারই অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—এই ধারণা করিয়া নির্মম নির্যাতনের মধ্যেও কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি! তাহা না হইলে অসহায় মানব অকারণ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিত না। কে একজন মনীষী নাকি বলিয়াছেন যে, ভগবান যদি না-ও থাকেন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একটা ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। মানুষের পক্ষে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক। আমিও আমার এই দুর্ভাগ্যটাকে অমোঘ বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। মানিয়া লইয়াছিলাম যে, যিনি আমার স্বপ্ন-সৌধশীর্ষে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৃষিত-অধর-সমীপবর্তী সুধাপাত্রকে যিনি অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতে বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি করুণাময় পরমেশ্বরই। যাহা করিয়াছেন তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে আমরা যে শুধু অপারগ তাহাই নয়—অনধিকারী

নিরুপায় মন এই যুক্তি মানিয়াছিল। অমিতাকে ভালবাসিয়াছিলাম। অমিতাও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। অমিতার পিতা-মাতার আপত্তি ছিল না। আমার দিকে পিতা-মাতাই ছিল না। তবু বিবাহ হইল না। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, একদিন কাশিতে কাশিতে এক ঝলক রক্ত আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত শুনিয়াও অমিতা কিন্তু আমাকে চাহিয়াছিল। আমি কিন্তু পারিলাম না।

বিবেকে বাধিল।

চার

অমিতার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল।

অমিতার মত পাত্রী পড়িয়া থাকে না। সুন্দর স্বভাব, সুন্দর চেহারা, সুন্দর শিক্ষা। অমিতার মত মেয়ে বাংলা দেশে বেশী নাই। আমার চোখে তো আর একটাও পড়িল না। রূপসী শিক্ষিতা মেয়ে হয়তো অনেক আছে; কিন্তু অমন মৃদু, অমন স্নিগ্ধ, অমন সুরভিত সুমিষ্ট স্বভাব তো আর কোথাও দেখিলাম না। অমিতার পিতামাতা অমিতার জন্য যে পাত্রটিকে নির্বাচিত করিলেন তিনিও অমিতার উপযুক্ত। বড় বংশের ছেলে, বড় চাকুরি করেন। স্বাস্থ্যবান সুরূপ ভদ্রলোক। কোন দিক দিয়াই কোন খুঁত নাই। আইনত অমিতার সুখে থাকিবার কথা। হয়তো সুখেই আছে। কিন্তু কেন জানি না, আমার অন্তরনিবাসী অবুঝ ব্যক্তিটির বিশ্বাস, অমিতা সুখে নাই। আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলেই বেশী সুখী হইত। যদিও আমি অমিতার স্বামীর অপেক্ষা সব দিক দিয়াই নিকৃষ্ট, তথাপি মনে হয় অমিতা এখনও মনে মনে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত যুক্তিহীন এই স্বপ্নটিকে আমি মনে মনে আঁকড়াইয়া আছি যে, তাহার স্বামীর বড় বংশ, ভাল চাকুরি, সুন্দর রূপ, অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে ততটা সুখী নয়, যতটা সুখী সে হইতে পারিত যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম। হয়তো ইহা আমার অহমিকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অহমিকাটুকুকে আশ্রয় করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। সর্বগ্রাসী জলপ্লাবনে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকার ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু শুধু জাগিয়া আছে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিয়া আছি।...

আবার তাহার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম।

পাঁচ

দেখা হইলে কি বলিব তাহাকে!

এত দিন পরে দেখা—পাঁচ মিনিটের জন্য! স্টেশনের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি তাহাকে বলিব! অথচ বলিবার কত কথাই মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিব কেমন করিয়া! হয়তো কিছুই বলা হইবে না, হয়তো অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্নের ভিতর দিয়াই এই অতিশয় মূল্যবান পাঁচটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবে। জীবনে হয়তো তাহার সহিত আর দেখাই হইবে না। হয়তো...। সহসা মনে হইল, তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম।

ছয়

সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের ডালমুট অমিতার বড় প্রিয়বস্তু ছিল। নানা স্থানে ঘুরিয়াও ঠিক সে রকম ডালমুট যোগাড় করিতে পারিলাম না। হয়তো এখানকার জিনিস তাহার পছন্দ হইবে না। একজনকে ফরমাশ দিয়াছি। সে আশ্বাস দিয়াছে সন্ধ্যা নাগাদ ভাল ডালমুট প্রস্তুত করিয়া দিবে। ডালমুট ছাড়া অমিতার জন্য আর যে কি লইয়া যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না।

জামা কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে।

মেসের চাকরটাও ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছে। নিজেই একটা জামা ও কাপড়ে সাবান দিতে বসিলাম। ময়লা জামা কাপড় পরিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মনে পড়িল, কিছু গোলাপফুল যোগাড় করিয়া লইয়া গেলে হয়। লাল নয় —সাদা গোলাপ। নরেনদের বাড়িতে আছে—গেলেই পাইব। হাতঘড়িটার দিকে

চাহিয়া দেখিলাম, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও দেরি আছে। নরেনের বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নরেনদের বাড়ি হইতে যখন বাহির হইলাম তখন চতুর্দিক অন্ধকার। বড় বড় সাদা গোলাপগুলি অতি সুন্দর। অমিতা নিশ্চয়ই খুশী হইবে। ফুলগুলি পাইতে কিন্তু দেরি হইয়া গেল। নরেন বাড়ি ছিল না, মালীটাও বাহিরে গিয়াছিল। রাস্তায় নামিয়া হাতঘড়িটা আর একবার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। যে লোকটাকে ডালমুটের ফরমাশ দিয়াছিলাম, সে এখান হইতে কিছুদূরে একটা গলির মধ্যে থাকে। গেলাম সেখানে।

আট

স্টেশন।

নানা ধরনের যাত্রী নানা ধরনের জিনিসপত্র লইয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছে। ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্যমনস্কভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা বেদনাময় অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? একজন রেলওয়ে-কর্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসিবার আর কত দেরি আছে?

তিনি নির্বিকারভাবে বলিলেন—"সে ট্রেন তো আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে।"

সে কি!

নিজের হাতঘড়িটা দেখিলাম।

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে।

সহসা মনে হইল, আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই। অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দিবা দ্বিপ্রহরে

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

দারুণ দ্বিপ্রহর। খর-রৌদ্র চতুর্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। সাধারণতঃ এ সময়ে লোকে ঘরের বাহির হয় না। আজ কিন্তু একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এত লোকের ভিড়! আজ সকালে হারু ঘোষের পুত্রকে দংশন করিয়া যে সাপটা নিকটস্থ ইটের গাদার ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিল, সেটা মারা না পড়িলেও ধরা পড়িয়াছে। বিশু বাগ্দী সাবধানে ইট সরাইয়া সাপের লেজের দিকটা শুধু যে দেখিতে পাইয়াছে তাহা নয়, বল্লম দিয়া গাঁথিয়া সাপটাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন গর্জন করিতেছে। দেখিবার মত দৃশ্য বটে! গ্রামের সমস্ত লোক সভয়বিস্ময়ে দেখিতেছে। সিদ্ধমনস্কাম বিশু বাগ্দী সগর্বে জাহির করিতেছে যে, এমন মোটা এমন লম্বা ফণা ও গর্জন-বিশিষ্ট গোক্ষুর সর্প সে আর কখনও দেখে নাই। সত্যই সর্পটি ভয়ঙ্কর।

দুই

একটু দূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জনৈক ব্যক্তি খানিকটা ছাতু খাইতেছিল। ভিড়ে যোগদান করে নাই। লোকটির চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি, তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন। পরিধানে একটা ময়লা হাফ-প্যাণ্ট এবং একটা ময়লাগোছের ফতুয়া। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়িতে ছাতু লাগিয়া চেহারাটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়াছে। নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে আপন মনে সে ভোজন করিতেছিল। এমন সময়ে ভিড়ের ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া জনতার দিকে সে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর কি মনে করিয়া একটু হাসিল এবং অবশেষে উঠিয়া ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবখানা—ব্যাপারটা কি দেখাই যাক না! ভিড়ের নিকটে গিয়া একজন লোককে প্রশ্ন করিল—"এখানে এত ভিড় কিসের?"

"গোখরো-সাপ ধরা পড়েছে—"

"কোন্ গোখরো-সাপ?"

"যে গোখরো-সাপটা ন্যাপলাকে আজ সকালে কামড়েছিল।"

"ন্যাপলা কে?"

"হারু ঘোষের মেজছেলে।"

"তাই নাকি? বেঁচে আছে এখনও?"

"বেঁচে আছে এখনও। ডাক্তারবাবু এসে তিন-চারটে বাঁধন দিয়ে কেটেকুটে কি সব ওষুধপত্তর লাগিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা কিন্তু খারাপ।"

"ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না, কিৎসু হবে না।"—বলিয়া আগন্তুক সহাস্যে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল।

ভিড়ের লোকটি বলিল—"না হ'লেই বা উপায় কি?"

বিস্ফারিত নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া আগন্তুক বলিল—"উপায় কি? আলবৎ উপায় আছে। মন্তর ঝাড়ব আর উঠে বসবে। চালাকি নাকি? কই দেখি, সাপটা কোথায়? ডাক ন্যাপলাকে।"

তিন

দেখিতে দেখিতে জনতা সাপ ছাড়িয়া আগন্তুক লইয়া পড়িল। দ্রুতবেগে রটিয়া গেল, একজন মস্ত গুণী ওঝা আসিয়াছেন। হারু ঘোষকে খবর দিতে লোক ছুটিল, এবং খবর পাইবামাত্র তিনি সর্পাহত পুত্রটিকে লইয়া ব্যস্তসমস্ত-ভাবে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌছিলেন।

বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল—"পায়ের বাঁধন খুলে দাও।"

তৎক্ষণাৎ পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল।

"এইবার সাপটাকে ছেড়ে দাও।"

বিশু বাগ্‌দী বলিল—"ছেড়ে দিলে ফের যদি ছুটে গিয়ে কামড়ায় কাউকে?"

"কামড়াবে? আচ্ছা, আমি ধরছি, খুলে নাও তুমি বল্লম। কামড়াবে, চালাকি নাকি?"

নির্ভয়ে আগাইয়া গিয়া আগন্তুক সাপটাকে ধরিল। ধরিবামাত্র সাপটা সগর্জনে

তাহার ডান হাতে একটা ছোবল বসাইয়া দিল। ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আগন্তুক বাম হাতে সাপটাকে ধরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল—"খুলে নাও বল্লম।"

একটু ইতস্তত করিয়া বিশু বাগ্‌দী অবশেষে বল্লমটা খুলিয়াই লইল। সাপটা আগন্তুকের বাম হাতে দংশন করিল এবং বহু পাকে সমস্ত হাতখানা বেষ্টন করিয়া ধরিল। আগন্তুকের সমস্ত মুখে অদ্ভুত হাসি। ছাতু-মাখা খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি ভেদ করিয়া বিকট একটা অট্টহাস্য চতুর্দিক কাঁপাইয়া তুলিল।

"রাগ করছ কেন চাঁদ? দাও, চুমু দাও একটা আমাকে।"

ক্রুদ্ধ বিষধর তাহার এ অনুরোধ রক্ষা করিল।

তৎক্ষণাৎ গণ্ডদেশে একটা করাল চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

চার

সন্ধ্যার আর বেশী বিলম্ব নাই। উত্তেজিত জনতা কলরব করিতেছে। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।

দারোগা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু ঝুঁকিয়া আগন্তুকের মুখটা ভাল করিয়া অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"একেই তো আমরা খুঁজছি।"

"শোকার্ত হারু ঘোষ বলিলেন—"এ কে বলুন তো?"

"এ একটা পাগল। পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। একে ধরবার জন্যে চারিদিকে ফটো পাঠিয়ে হুলিয়া করা হয়েছে।"

বিশু বাগ্‌দী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। তিক্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"পাগল নয় কে? সব্বাইকে ধ'রে পাগলা-গারদে পুরুন আপনি হুজুর। ছি ছি ছি ছি! কি কাণ্ড!"

অন্ধকার ঘনীভূত হইতে জনতা ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

পরিবর্তন

খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খাইয়া সমস্ত মুখটা তিক্ত হইয়া গেল। অথচ সন্দেশগুলা ভালই ছিল।

গোড়া হইতে শুনুন তাহা হইলে।

হরিমোহন বড়লোক ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে না, ইহা জানিতাম। অর্থদ্বারা যতটা চিকিৎসা ক্রয় করা সম্ভব তাহা ক্রয় করা হইবে, হইতেওছিল। দুইজ কৃতবিদ্য নামকরা ডাক্তার প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া হরিমোহনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দুইজন নার্স আসিয়া হয়তো তাহার শুশ্রূষার ভারও লইতেন, কিন্তু সরমা—হরিমোহনের স্ত্রী, তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজেই সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেবানিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সেবার কোন ত্রুটি হইতেছে না। বেতনভোগী নার্স এতটা করিত কিনা সন্দেহ।

রোগটি কিন্তু সাংঘাতিক,—যক্ষ্মা। মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, প্রত্যহ জ্বর হইতেছে। কফ পরীক্ষা করানো হইয়াছিল—যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পয়সার জোরে সুচিকিৎসা হয়তো হইবে, কিন্তু সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বরং তাহার জীবননাট্যের যবনিকা-পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই কথাই বারংবার মনে হইতেছিল।

হরিমোহন আমার বাল্যবন্ধু। ক্লাসে উভয়ে পাশাপাশি বসিতাম এবং সেইসূত্রে যে ঘনিষ্ঠতাটুকু বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, কেন জানি না, এখনও তাহা অটুট আছে। না থাকিবারই কথা। ধনী ও দরিদ্রের প্রেম বড় ভঙ্গুর। আমাদের কপালে কেন যে তাহা টিকিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। যাই হোক, রোজ তাহার খবরটা লইতে যাইতাম। আরও বিশেষ করিয়া যাইতে হইত এই জন্য যে, অর্থ এবং পত্নী ব্যতীত হরিমোহনের আপন বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। গুড় থাকিলে অবশ্য পিপীলিকার অসদ্ভাব হয় না, বহু পিপীলিকা আনাগোনাও করিতেছিল, কিন্তু যেই ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গেল যে হরিমোহনের ব্যাধিটি যক্ষ্মা, অমনি

পিপীলিকার দল ক্রমশ অন্তর্ধান করিল। সম্ভবত অন্য গুড়ের গুদামের সন্ধানে গেল। আমি একা পড়িলাম। সরমার সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে যে লৌকিক আলাপটুকু ছিল, এই সূত্রে তাহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, না হইলেই ভাল ছিল।

দুই

হরিমোহন বসিয়া কাশিতেছিল।

যক্ষ্মার বুক-ফাটা কাশি।

কাশিটা থামিলে বলিল—"থ্রোটটা বড্ড খারাপ হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে লাগিয়ে আর গার্গল ক'রে ক'রে তো হয়রান হয়ে উঠলাম। কাশিটা কিছুতে কমছে না কেন বল্ দেখি!"

বলিলাম—"কমবে কমবে, এত ঘাবড়াস্ কেন?"

"ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই। তবে কি জানিস, ক্রমাগত কাশিটা বিরক্তিকর। —দুইটা কথা বলিতে না বলিতেই আবার কাশিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

হরিমোহন বলিল—"স্পিউটাম একজামিন ক'রে কিছুই পাওয়া যায় নি, শুনেছিস্ তো? যাবে না, তা আগেই জানতাম। একটা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় অ্যাটাক হয়েছে আর কি।"

এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া সরমা প্রবেশ করিল।

কাশি শেষ করিয়া হরিমোহন বলিল—"ও কি আবার?"

"দুধ।"

"এখন আবার দুধ কেন?"

"ডাক্তারেরা ব'লে গেছেন দুধ দিতে যে।"

"কি মুশকিল, একটু বিশ্রাম দাও আমাকে তোমরা। এই তো—।" আবার কাশি শুরু হইল।

সামলাইয়া সে বলিতে লাগিল—"এই তো কিছুক্ষণ আগে ওষুধ খেলাম, তারপর গার্গল, তারপর স্প্রে, তারপর ফলের রস—আবার এখুনই দুধ!"

ডাক্তাররা বলেছেন, ভাল ক'রে খাওয়াদাওয়া করলেই শিগ্‌গির সেরে উঠবে। বেশি দুধ তো আনি নি। নাও।"

সরমা পেয়ালাটা সম্মুখে ধরিল।

দুই চুমুক খাইয়া হরিমোহন বলিল—"আর না, দোহাই তোমার, জায়গা নেই আর পেটে—"

"না না, খেয়ে নাও এটুকু। বলুন না আপনি একটু।"

আমিও অনুরোধ করিলাম।

"আচ্ছা, আর এক চুমুক খাচ্ছি তোর অনুরোধে।"

আধ পেয়ালার বেশি সে কিছুতেই খাইল না।

সরমা পেয়ালাটা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। রাত হইয়াছিল। সরমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতে হইবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, টেম্পারেচারের কথাটা হরিমোহনকে যেন জানানো না হয়। হরিমোহনকে বলিলাম,—"নটা বেজে গেছে। আজ উঠি ভাই। কাল আবার আসব।"

"আচ্ছা।"

হরিমোহন পাশ ফিরিয়া শুইল।

তিন

পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধটা পান করিতেছে। বলিলাম—"এ কি করছেন আপনি?"

ধরা পড়িয়া গিয়া সরমা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরক্ত মুখে বলিল—"কিছু নয়।"

তারপর সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল—"দেখে যখন ফেলেছেন, উপায় নেই। কিন্তু বলবেন না কাউকে।"

"তা না হয় বলব না। কিন্তু এঁটো দুধটা খাচ্ছেন কেন?"

একটু হাসিয়া সরমা বলিল—"স্বামীর এঁটো খেলে দোষ কি?"

"দোষ কি!"

যক্ষ্মার সংক্রামকতা সম্বন্ধে আমার যতটা জানা ছিল বলিলাম। সরমা অদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিল, তাহার পর সহসা প্রদীপ্ত একজোড়া চোখ আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে, উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও যদি একটা থাকত তা হ'লেও বা কথা ছিল!"

অনেক হিতকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বলিলাম। আনতমস্তকে হাসিমুখে নীরবে সে সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রতিবাদ পর্যন্ত করিল না।

চার

হরিমোহনের অসুখ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। তাহার যে যক্ষ্মা হইয়াছে, এ সংবাদ তাহার নিকটও আর চাপা রহিল না। সে জানিতে পারিল এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে দুইজন ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্যস্ত হইলেন এবং আরও দুইজন ডাক্তারকে পরামর্শার্থে ডাকিলেন। চারিজনে মিলিয়া ঠিক হইল যে, কয়েকটি এক্স-রে প্লেট লওয়া দরকার। তাহাও যথাসম্ভব হইল। এক্স-রে করিয়া দেখা গেল, একটি ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অপরটি একেবারে নির্দোষ আছে। স্যানাটোরিয়মে গিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করালেই সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে হরিমোহন ধরমপুর চলিয়া গেল। সুরমাও সঙ্গে গেল।

পাঁচ

ইহার পর অনেকদিন হরিমোহনের খবর পাই নাই। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হরিমোহন সম্বন্ধে কৌতূহলও ক্রমশ কমিয়া গেল, হরিমোহনও বিশেষ খবর লইল না। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম—হরিমোহন সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছে। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, টাকা আছে যাইবে না কেন!

নিয়মিতভাবে কেরানীগিরি করিতে লাগিলাম। আদার ব্যাপারী আমি,

জাহাজের খবর লইবার অধিকার নাই, সুযোগও ছিল না। হরিমোহন কোন ঠিকানা দিয়া যায় নাই।

ছয়

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হরিমোহনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন তাহার পত্র পাইলাম। দুই ছত্র চিঠি—

ভাই নরেশ,

আগামী মঙ্গলবার কলিকাতায় পৌঁছিব। পার তো দেখা করিও।

—হরিমোহন

দেখিলাম চিঠিখানা লিখিয়াছে দেশের ঠিকানা হইতে। কবে দেশে আসিল সে! কিছুই তো জানি না!

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর আপিস-ফেরত তাহার বাসায় গেলাম। সে বাড়িতেই ছিল। খুব ঘটা করিয়া আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। হরিমোহনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুস্থ সবল লম্বা চওড়া চেহারা—কে বলিবে ইহার যক্ষ্মা হইয়াছিল!

বলিলাম—"বেশ সেরে গেছিস্ তো?"

"হ্যাঁ, কমপ্লিট্‌লি।"

যে যে ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে নিরাময় হইয়াছে, তাহাদের গল্প করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"সুইট্‌জারল্যাণ্ড গেছলি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন লাগল?"

"অতি চমৎকার? কেতাবে যা পড়া যায় তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুন্দর। চল্ চল্, ওপরে চল্।"

উপরে গেলাম। উপরে গিয়াই হরিমোহন চীৎকার জুড়িয়া দিল—"সরমা কই, নরেশ এসেছে—চা জলখাবার আন—ব'স ব'স।"

দামী সোফাটার উপর একটু সন্তর্পণেই বসিলাম।

হরিমোহোন বলিতে লাগিল—তারপর তোর খবর কি বল্! তুই তো অনেক বদলে গেছিস্। কানের কাছের চুলগুলো যে বেবাক পেকে গেছে রে! এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেলি! ওদের পঞ্চাশ বছরে যৌবন শুরু হয়—বুঝলি ?"

'শুরু' কথাটার উপর সে জোর দিল।

আমার যে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে এবং ডাক্তারে আমারও টি. বি. সন্দেহ করিতেছে, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না,—বলিয়া লাভ নাই। কেবল বলিলাম—"ওদেশে-এদেশে ঢের তফাত রে ভাই! তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস কেন ? সেই বিশ বছর বয়স থেকে এক নাগাড়ে কেরানীগিরি ক'রে চলেছি—দম নেবার অবসর নেই।"

"তাতে কি হয়েছে? খাটলে কি মানুষ রোগা হয়?"—বলিয়া হরিমোহন হা-হা হাসিয়া উঠিল। ঘর-কাঁপানো হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

সরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে জলখাবারের প্লেট।

সরমাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে এত পরিবর্তন হইতে পারে!

আমার ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত সরমা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

"চা-টা নিয়ে আসি।"

জলখাবারের প্লেটটা সামনের তেপায়াটার উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে এ!

হরিমোহনকে বলিলাম—"সরমাকে তো একদম চেনা যায় না! এই দশ বৎসরে ভীষণ বদলে গেছে দেখছি।"

হরিমোহন স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর

বলিল—"হ্যাঁ, বদলে গেছে। তুই যাকে দেখেছিলি এ সে নয়—এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি. বি. হয়েছিল। দুটো লাংসেই।" কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল—"শেষটা ইন্‌টেস্‌টাইনও খারাপ হয়ে গেল। অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।"

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। হরিমোহনই আবার কথা বলিল।

"থাকতে পারলাম না—দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হ'ল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে বার করলাম শেষে। ও-নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আর ফিরবে না জানি, তবু নামটার—"

থামিয়া গেল। সরমা দ্বারপথে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে। হরিমোহনের দিকে নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল—"অত আমি খাব না। কত দিয়েছ আমাকে!"

শুনিলাম সরমা বলিতেছে—"ডাক্তারে তোমাকে খেতে বলেছে ভাল ক'রে। আজকাল তুমি খাচ্ছ না মোটে। একটু ব'লে যান তো আপনার বন্ধুকে।"

হরিমোহন বলিল—"নরেশের জন্যে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ আনিয়েছ তো? ভারি ভালবাসে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খেতে!"

"হ্যাঁ, এই যে আনিয়েছি।"

হাসিয়া এক প্লেট খেজুরে গুড়ের সন্দেশ সে আমার দিকে আগাইয়া দিল।

হাসির গল্প

খুব ছোট ছোট করিয়া মাথার চুল ছাঁটা, স্থানে স্থানে মাংস বাহির করা। ইহার উপর মাথা ও কপাল বেষ্টন করিয়া কয়েক ফেরতা টোয়াইন জাতীয় সূতা বেশ জোরে বাঁধা থাকাতে রগের শিরাগুলি স্ফীত এবং চক্ষু দুইটি লাল। এইখানেই বিসদৃশতার শেষ হয় নাই। রোমশ নাসারন্ধ্রে কফ ও নস্য মিলিয়া দৃষ্টিকটুতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহা কয়েক দিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফের সহযোগে যে চিত্রটি করিয়াছে তাহা মাধুর্যময় নহে।

বারান্দায় একটি শিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। ঘরের ভিতর আর একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত।

"কৃত্তিবাস, ওরে কিতে—"

রক্তচক্ষু তুলিয়া ভদ্রলোক দ্বারের দিকে চাহিলেন।

"কিতে—"

কৃত্তিবাসের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

উচ্চতর কণ্ঠে পুনরায় ডাকিলেন—"কিতে—"

কেহ আসিল না।

সগর্জনে—"ওরে শালা কিতে—"

গর্জনে রোগশয্যায় মেয়েটির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেও কাঁদিতে লাগিল। ক্ষীণস্বরে একটানা ধরনের কান্না। বারান্দার শিশুটি আগে হইতেই কাঁদিতেছিল। এ ক্ষীণকণ্ঠে নয়, জোরেই। দুইপ্রকার ক্রন্দনের প্রভাবে ভদ্রলোক আরও যেন চটিয়া গেলেন। কণ্ঠস্বর অসম্ভব রকম চড়াইয়া ক্ষেপিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন —"কিতে কিতে, কিতে—ওরে শালা—"

ফলোদয় হইল।

কিতে আসিল না বটে, আসিলেন হরিদ্রালাঞ্ছিতবসনা স্থূলাঙ্গিনী একটি মহিলা। তাহাতেই ফল ফলিল। ভদ্রলোক অকস্মাৎ অত্যন্ত নরম হইয়া গেলেন এবং অপ্রতিভভাবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন। মহিলাটি কিন্তু কিছুমাত্র নরম এবং কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া রোষকষায়িত লোচনে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর একটি হাত কোমরে দিয়া অপর হস্তটি আস্ফালন করতঃ সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন—"ব্যাপারখানা কি, পাড়া যে মাথায় তুলেছ!"

আমতা আমতা করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"গরম জলটা—"

"গরম জলটা! আমার কি দশখানা হাত!"

"তোমাকে তো বলি নি। কিতে কোথা গেল?"

"কিতে গেছে বাজারে—"

"সকালে তাকে একবার বাজারে পাঠিয়েছিলে না?"

"আবার পাঠিয়েছি।"

"ও!"

ইহার বেশি আর কিছু বলিতে ভদ্রলোক ভরসা করিলেন না। এমন সময় স্বয়ং কৃত্তিবাস আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল এবং বলিল—"পাঁচফোড়ন এনেছি মা।"

ভদ্রলোক আরক্ত নয়ন দুইটি কৃত্তিবাসের কুণ্ঠিত নয়নে স্থাপিত করিতেই কৃত্তিবাস বলিল—"জল এখুনি ক'রে আনছি বাবু, হয়ে গেছে বোধ হয়, চড়িয়ে দিয়ে এসেছি—"

কৃত্তিবাস চলিয়া গেল। মহিলাটি বাহির হইয়া গেলেন ও যাইবার সময় বারান্দার ক্রন্দন-নিরত শিশুটির পৃষ্ঠে দুমদুম করিয়া কয়েকটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"খালি বায়না—খালি বায়না—খালি বায়না! পোড়ারমুখো মেয়ে হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে আমার!"

ক্রন্দন ঘোরতর হইয়া উঠিল। রুগ্না মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—"বড্ড মাথা ব্যথা করছে বাবা।"

স্ত্রীর যে রণচণ্ডী মূর্তি এইমাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে এখন কিছু বলা সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নিজেই উঠিয়া গিয়া টেম্পারেচারটা লইলেন। দেখিলেন, জ্বর বাড়িয়া ১০৫ হইয়াছে। খানিকক্ষণ থার্মোমিটারটার পানে নিবদ্ধদৃষ্টি থাকিয়া হরিহরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন।

"পাশ ফিরে শো, চেঁচাস নি।"

পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েটি পাশ ফিরিয়া শুইল।

দুয়ারে কড় কড় শব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল। হরিহরবাবু কপাট খুলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই দেখিলেন—মুদী বিল আনিয়াছে।

বললেন—"পরশু দেব, আজ হাতে কিছু নেই।"

কটূক্তি করিয়া লোকটা চলিয়া গেল।

"জল এনেছি বাবু।"

পিছন ফিরিয়া হরিহরবাবু দেখিলেন, কেৎলিহস্তে কুণ্ঠিত কৃত্তিবাস দাঁড়াইয়া আছে।

"গামলা-টামলা আন্—"

কেৎলি নামাইয়া কৃত্তিবাস চলিয়া গেল এবং একটা বড়-গোছের গামলা ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। হরিহরবাবু নিজেই ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত দিয়া দেখিলেন, উত্তাপ মনোমত হইয়াছে কিনা। দেখিলেন, হয় নাই। পুনরায় খানিকটা গরম জল ঢালিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় অসুস্থ মেয়েটি বমি করিতে শুরু করিল।

"ওরে কিতে—দেখ্ তুই ওকে—"

কৃত্তিবাস মেয়েটিকে সামলাইতে লাগিল। হরিহরবাবু ঠাণ্ডা জল গরম জল ঠিক মত মিশাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন—"ওকে শুইয়ে দে। এইবার তুই আমার ছোট টেবিলটা আর কাগজ কলম দিয়ে যা তো।"

হরিহরবাবু একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া গরম জলে পা দুইটি ডুবাইয়া ফুট-বাথ লইতে লাগিলেন। কৃত্তিবাস কাগজ কলম দোয়াত ও ছোট টেবিল দিয়া গেল।

চেয়ারের ছারপোকাগুলি কামড়াইতে শুরু করিয়াছে, পাশের গলিটাতে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে, বারান্দায় ক্রন্দনরোল সমানে চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। হরিহরবাবু বামহস্তে রগ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজই লিখিয়া দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাগাদা দিয়াছেন, নিজের তাগাদাও প্রবলতর। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিহরবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।

ব্যতিক্রম

স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, উপার্জন করিতেছে, অথচ বিবাহ করে নাই, এহেন সুরেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বিশেষ কিছু বলে না, খালি একটু হাসে।

বহু অর্থবোধক ছোট্ট হাসিটুকুর বিশেষ কোন তাৎপর্য বোঝা যায় না। পিতামাতা হার মানিয়া বহুদিন পূর্বেই স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হালকাভাবে চেষ্টা করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণও হাল ছাড়িয়াছেন। দুই-একজন কন্যার পিতা, কন্যার পিতা বলিয়াই এখনও হতাশ্বাস হন নাই, নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাতেও সুরেনের কৌমার্যব্রত ভঙ্গ হইবে বলিয়া হয় না। ইদানীং সে এই-জাতীয় পত্রের উত্তর দেওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়াছে। কারণ সোজা 'না' উত্তরেও মিনতিপূর্ণ প্রত্যুত্তর আসে এবং তাহারও উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং ও-বিষয়ে সে আর অকারণ সময় এবং অর্থ নষ্ট করিতে রাজী নয়। কয়েক দিন পূর্বে এইরূপ একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তাহার এক পরিচিত ব্যক্তি মারফত তাহাকে ধরিয়াছিলেন। মেয়েটি আই. এ. পাস, দেখিতে ভাল, গান-বাজনা আদব-কায়দা রন্ধনবিদ্যা গৃহকর্মাদি সর্ব বিষয়েই পারঙ্গমা। পরিচিত ব্যক্তি বর্ণনা শেষ করিয়া বলিলেন—"এক কথায় তোমারই উপযুক্ত।

সুরেন তাহার সেই হাসিটি হাসিল।

"হাসছ যে!"

আর একটু হাসিয়া বলিল—"হাসছি আপনার আক্কেল দেখে! যার নিজেরই খেতে কুলোয় না, তার আবার বিয়ে।"

"দেড়শো টাকা মাইনে পাচ্ছ, খেতে কুলোয় না কি রকম?"

সুরেন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"কোনরকমে কুলিয়ে যাচ্ছে আমার একার! আর একজন এবং তার সঙ্গে বহুজনের সম্ভাবনা—কুলোবে না। তা ছাড়া হাল-ফ্যাশানদুরস্ত মেয়ের—"

কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না, কিন্তু মনের ধারণাটা তাহার সম্পূর্ণই আছে। আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চ ধারণা নাই তাহার। সে প্রাচীনপন্থী।

আজকাল খবরের কাগজের কল্যাণে যে-সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয় না, ভয় হয়। মহাভারত রামায়ণে পুরুষ-দুঃশাসন পুরুষ-রাবণ ছিল, এখনও তাহারা অবশ্য আছে। কিন্তু স্ত্রী-দুঃশাসন, স্ত্রী-রাবণের আমদানিটা বোধ হয় আধুনিক। মাসিক মাত্র দেড় শত টাকা আয় লইয়া ইহাদের সহিত পাল্লা দিবার স্পর্ধা তাহার নাই। এই তো কয়েক দিন আগে সে খবর পাইয়াছে, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বি. এ. পাস বউ ভ্যানিটি-ব্যাগটি মাত্র সম্বল করিয়া কোথায় উধাও হইয়াছে। কানাঘুষা যাহা শুনা যাইতেছে, তাহা গৌরবজনক নহে। কোন এক আর্টিস্টের সঙ্গে নাকি—

সুতরাং ও পিছল-পথে সে পা বাড়াইবে না। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে নিজেকে লইয়া। মনের মধ্যে ক্ষুধিত কামনা একটা তপ্ত তীরের মত বিঁধিয়া আছে, সেটাকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ—

ভাবিয়া কোন কূলকিনারা মেলে না। এই ভাবেই চলিতেছিল।

দুই

সুরেন থাকে পশ্চিমের একটি শহরে। শহরের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে তাহার ছোট বাসাটি। বাসায় থাকিবার মধ্যে আছে বৃদ্ধ ভৃত্য হকৃরু আর একটি বাইক। হকৃরু রাত্রে বাড়ি চলিয়া যায়, বাইকটি বারান্দায় ঠেসানো থাকে। দুই বেলা খাইবার সময় পাড়ার একটি অজ্ঞাতকুলশীল কুকুর আসিয়া উঠানে থাবা পাতিয়া উন্মুখ হইয়া বসে। গভীর রাত্রে সঙ্গোপনে একটি বিড়ালও যাতায়াত করে। মাঝে মাঝে দুই-একজন কন্যাদায়গ্রস্ত লোক অথবা ওই-জাতীয় কেহ আসেন। এতদ্ব্যতীত সুরেনের বাসাটিতে অপর বিশেষ কাহারও গতায়াত নাই। তাহার কারণ, বোধ হয়, সুরেন লোকটি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাপ্পাগোছের শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি। সাধারণ লোকের সঙ্গে কেমন যেন তাহার মিলে না। অপরিচিত প্রতিবেশীদের বৈঠকখানায় অনাহূতভাবে গিয়া দাদা খুড়া মেসো পাতাইয়া হুঁকাহস্তে তাসের আড্ডা গুলজার করিবার মত স্বভাব তাহার নয়। সে একটু মুখচোরা-স্বভাবের লোক এবং সম্ভবত একটু অহঙ্কারীও।

নিছক ডিগ্রীর জোরেই চাকুরিটি মিলিয়াছে।

তিন

হেমন্তের শুক্লা দ্বাদশী।

অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। আপিস হইতে প্রত্যাগত সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে যাইতেছে, এমন সময় একটি গাড়ি আসিয়া বাড়ির সম্মুখে থামিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেদিকে চাহিয়া সুরেনের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। কারণ গাড়ি হইতে যিনি অবতীর্ণা হইলেন তিনি একজন তরুণী—রীতিমত আধুনিকা একজন। হস্তে ভ্যানিটি-ব্যাগ, চোখে চশমা, পায়ে হাই-হীল জুতা। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সহাস্যে তিনি প্রশ্ন করিলেন—"আপনার নামই বোধ হয় সুরেনবাবু?"

প্রতিনমস্কার করিয়া সুরেনকে সত্য কথাই বলিতে হইল।

সুরেনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তরুণীটি হাসিয়া বলিলেন—"আমি হচ্ছি আপনার বন্ধু ললিতবাবুর স্ত্রী।"

স্তম্ভিত সুরেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিবার জন্য তরুণীটি ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া নানাভাবে সেটি দেখিলেন, তাহার পর ভিতর হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন,—"মুশকিলে পড়লাম তো, খুচরো নেই, এই নোটটা এখানে ভাঙাবার সুবিধে হবে কোথাও, কাছাকাছি কোন দোকান-টোকান আছে?"

সুরেন বলিল—"ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি আমি, খুচরো আছে আমার কাছে।"

গাড়োয়ান ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। সুরেনের আহ্বানে বন্ধু ললিতের স্ত্রী সুরেনের বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। আহ্বান করিতেই হইল, ভদ্রতা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! হাজার হোক, ললিতের স্ত্রী।

চার

বলা বাহুল্য, এরূপ আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সুরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিনা ভূমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর

অভ্যাগম, তাও যে-সে স্ত্রী নয়, রীতিমত রূপসী। সুরেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

তাহার অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য করিয়া আভা বলিলেন—"আপনাকে বোধ হয় বিব্রত করলাম, নয়?"

"না না, বিব্রত কি, কি বলেন!"

একটু হাসিয়া সুরেন অভিভূত ভাবটা সামলাইয়া লইল।

"ওর কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি। তাই দেখা করতে এলাম।"

কানের দুল দুইটি চমৎকার, লাল পাথরটায় ইলেকট্রিক আলো পড়িয়া অদ্ভুত দেখাইতেছে। সুরেন তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। হঠাৎ ভদ্রমহিলার প্রশ্নে পুনরায় আত্মস্থ হইল।

"আপনি কতদিন আছেন এখানে?"

"বেশি দিন নয়, বছরখানেক হবে।"

দুইখানি চেয়ারে বসিয়া দুইজন দুইজনের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন ভাবিতেছিল, উনি কি এখানে থাকিতে চাহিবেন? যদি চাহেন, তখন সে কি বলিবে? আভা ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া কথাটা পাড়া যায়, উনি সব শুনিয়াছেন কি? শুনিয়া থাকিলে কেমন ভাবে শুনিয়াছেন কে জানে?

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতার পর মুখভাব যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া সুরেন বলিল—"এর আগে কখনও দেখি নি আপনাকে আমি। বিয়ের সময়টাতে কিছুতে যেতে পারলাম না, ছুটি পাই নি।"

আসল কথা অবশ্য ছুটির জন্য সে চেষ্টাও করে নাই। ললিতের 'লভ ম্যারেজ' শুনিয়াই তাহার কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, তাহা ছাড়া পাওনা ছুটির এমনভাবে নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না, বরং ছুটি জমিলে পুরী বেড়াইয়া আসিবে মনে মনে এই বাসনা ছিল। কিন্তু এসব কথা বলা চলে না। ছুটি পাই নাই বলাটাই শোভন।

আভা বলিলেন—"আপনার কথা শুনেছি কিন্তু অনেক, তাই তো এলাম। মনে হ'ল এই বিদেশে একমাত্র আপনাকেই বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারব।"

সুরেন মনে মনে ঘামিতে লাগিল। এই রে, এইবার বুঝি ভদ্রমহিলা থাকিবার প্রস্তাবটা করিয়া বসেন! আজকালকার এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাণ্ড-

জ্ঞান একেবারে নাই। ইহারা সব করিতে পারে। স্বামীকেই যখন স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছেন, তখন ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে কয়েকদিন আপনার বাসায় আশ্রয় দিন আমাকে। সুরেনের পক্ষে 'না' বলা মুশকিল, 'হাঁ' বলা আরও মুশকিল। অবশেষে মরিয়া হইয়া সে বলিল—"কোথা থেকে আসছেন আপনি এখন ?"

"এখন আসছি আমি আমার কোয়ার্টার্স থেকে। এখানকার মেয়েদের ইস্কুলে হেড-মিস্ট্রেস হয়ে এসেছি আমি। কাল জয়েন করেছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই মনে হ'ল, যাই, আলাপটা ক'রে আসি।"—বলিয়া আভা দেবী অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিলেন।

কিন্তু এই নিশ্চিন্তকর শুভসংবাদ শুনিয়া সুরেনের যেরূপ পুলকিত হইয়া উঠা উচিত ছিল, আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক ততটা পুলকিত সে হইল না। বরং এই সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থাটার এমন একটা নিরামিষগোছের সমাধান হইয়া যাওয়াতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন বিমর্ষই হইয়া পড়িল। হয়তো তাহার মুখচ্ছবিতে সে ভাবটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

আভা দেবী বলিলেন—"সত্যি অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধ হয়, কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি ?"

"না না, বিরক্ত আবার কিসের !"

এইরূপ ভাসা-ভাসা আলোচনা খানিকক্ষণ চলিল।

তাহার পর আভা দেবী বলিলেন—"আজ এইবার উঠি। আবার আসব এখন মাঝে মাঝে।"

হকৃরু গাড়ি ডাকিয়া দিল, আভা দেবী চলিয়া গেলেন।

সুরেন রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে তেমন কিছু সাংঘাতিক বলিয়া তো মনে হইল না, ভালই লাগিল বরং। বেশ তো সহজ সুন্দর ভদ্র কথাবার্তা, অথচ ইনিই ললিতের মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নিশ্চয়ই কোন রকম কিছু—

সমস্ত সন্ধ্যাটা সুরেনের মাথায় অন্য কোন চিন্তাই আসিল না।

পাঁচ

কয়েক দিন পরে আবার একদিন বৈকালে আভা দেবী আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়া নিজেই বলিলেন—"মুখ ফুটেই চাইব আজ, চা হুকুম করুন। সেদিন আপনি যে রকম মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইলেন, তাতে চায়ের কথা বলতে আর ভরসা পেলুম না।"

আভা দেবী সহাস্যমুখে একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। সুরেন তাড়াতাড়ি চা আনিতে বলিল।

"খাবার-টাবার আনতে বলব কিছু? আমার এখানে মুখ ফুটেই বলতে হবে সব, কারণ বুঝতেই পারছেন, আমি ব্যাচিলার মানুষ, আমার ভরসা ওই বুড়ো হক্রু।"

"না, খাবার চাই না। ভাল এক কাপ চা হ'লেই চলবে। আপনার হক্রু ভাল চা করতে পারে তো?"

সুরেন স্মিতমুখে বলিল—"হক্রু আমার কাছে আসার পূর্বে আর কখনও চা করে নি। আমিই ওকে সম্প্রতি চা-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছি। সেজন্যে জোর গলায় কিছু বলতে পারছি না।"

"তা হ'লে ওকে জলটা গরম ক'রে সব জিনিসপত্র এখানেই দিয়ে যেতে বলুন, নিজেরাই ক'রে নেওয়া যাক।"

সুরেন সেইরূপই হুকুম করিল।

"চাটুকু মনোমত না হ'লে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না, যাই বলুন আপনি!"

সুরেন একটু হাসিল।

যথাসময়ে চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া হক্রু সামনের টেবিলটায় সাজাইয়া দিয়া গেল। আভা দেবী স্বচ্ছন্দ-নিপুণতার সহিত চা প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিলেন ও পান করিলেন।

"কেমন হয়েছে চা?"

"সুন্দর।"

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করিবার পর আভা দেবী হাতঘড়িটি দেখিয়া—"এইবার উঠতে হবে আমাকে, সেক্রেটারিবাবুর আসার কথা আছে আমার বাসায়।"

"কে আপনাদের সেক্রেটারি ?"

"খালি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশোনা করা ছাড়া ছুনিয়ায় আর কোন খবরই রাখেন না বুঝি আপনি ?"

"আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারি কে, এইটাই কি একটা রাখবার মত খবর বলতে চান ?"

"আপনার পক্ষে না হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ওইটেই এখন সবচেয়ে বড় খবর।"

"কে বলুন তো সেক্রেটারি আপনাদের ?"

"মুরারীমোহন পুরকায়স্থ, উকিল একজন। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। আমার যাতে কোন রকম অস্থবিধে না হয়, তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। উঠি আমি, তাঁর আসবার কথা আছে এখন।"

আভা দেবী চলিয়া গেলেন। যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আজও অনুক্ত রহিয়া গেল ; এবং যাহা শুনিবার জন্য স্থরেন মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। উভয়েই ললিতের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে সমুৎস্থক ; কিন্তু—। 'কিন্তু'তেই বাধিতেছে। স্থরেন একবার ভাবিল, ললিতকে একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয় ! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, সেটা ঠিক হইবে না। তাহার স্ত্রী এই শহরে আসিয়া চাকুরি করিতেছে এবং আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি শুনিলে ললিত হয়তো অত্যন্ত মর্মাহত হইবে। দরকার কি, অনর্থক তাহাকে খবর দিয়া ! কিন্তু এই পুরকায়স্থ লোকটা কে ?

ছয়

আরও মাসখানেক কাটিয়াছে। ললিতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। আভা দেবীর কথা বলিতে পারি না, কিন্তু স্থরেনের কাছে আভা দেবীই এখন মুখ্য, ললিত গৌণ। আভা দেবীর সংস্পর্শে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে তাহার মতামতের উগ্রতা কমিয়া গিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হয় না, মতামত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সে এখন ভাবে, আভা দেবী যদি শিক্ষিতা মহিলার নমুনা হন, তাহা হইলে সমাজের শঙ্কিত হইবার কারণ নাই, আনন্দিত হইবারই কথা।

সুরেনের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, ললিতঘটিত ব্যাপারটার নিগূঢ় একটা কোন রহস্য আছে। মোট কথা, আভা দেবীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে, এবং ভাল-লাগার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সে নিজের সঙ্গে নানারূপ জটিল তর্ক করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার মনে হইয়াছে—

যাক, কি মনে হইয়াছে তাহা আর নাই লিখিলাম। আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কাব্য নয়। আজকাল সন্ধ্যার সময় সে আর বেড়াইতে বাহির হয় না, বাড়িতেই থাকে। আভা অবশ্য রোজ আসেন না। কিন্তু যদি কোনদিন আসিয়া ফিরিয়া যান, সেটা বড় অন্যায় হইবে। ইহাই বর্তমানে সুরেনের মনোভাব। আপনারা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হইয়াছে সুরেন নিজে।

সাত

মাস দুই পরে।

উপর্যুপরি তিনটি সন্ধ্যা বৃথা গিয়াছে। আভা দেবী আসেন নাই। চতুর্থ সন্ধ্যায় অত্যন্ত আকুল অন্তঃকরণে সুরেন বসিয়া আছে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ হইল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া সুরেন দেখিল, আভা দেবী নয়, বকের মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া মুরারীমোহন পুরকায়স্থ আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।

"আসতে পারি কি ?"

"আসুন।"

পুরকায়স্থ মহাশয় আসিয়া উপবেশন করিলেন।

"ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয় নি। আভা দেবীর মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনতে পাই। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ ক'রেই আসা যাক, মানে—চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন আর কি!"—গলা খাঁকারি দিয়া পুরকায়স্থ মহাশয় একটু হাসিলেন, চেয়ারটা আর একটু কাছে সরাইয়া আনিলেন এবং পুনরায় বলিলেন—"মানে, শুনেছি আপনি ওঁর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। কিন্তু পুরকায়স্থ মহাশয় কাজের মানুষ, কাজের কথাটা

পাড়িতে অযথা বিলম্ব করিলেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো! যা শুনছি তাতে তো, মানে—"

"আমার মনে হয়, ওসব মিছে কথা।"

যেন মস্তবড় একটা ভুল ধারণা সংশোধিত হইয়া গেল, এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া পুরকায়স্থ বলিলেন—"তাই, নয়?"

তাহার পর একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন—"গুজবের কথা আর বলবেন না, আপনার মত নিরীহ লোকের নামও ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে কত কথাই না রটেছে শহরে!"

"তাই নাকি?"

"আর বলেন কেন! অতি পাজি জায়গা এ।"

সুরেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। পুরকায়স্থ মহাশয় বলিলেন—"আজ তবে উঠি, ঘোষপাড়ায় যেতে হবে একবার! ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবেন না মশাই, নিজে নিজে ঠিক থাকলেই হ'ল। কোন্ ব্যাটার তোয়াক্কা করেন আপনি। আচ্ছা, চলি তবে আজ।"

বকের মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া পুরকায়স্থ চলিয়া গেলেন।

আভা দেবী কেন আসিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরেন বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। শহরে গুজব রটিয়া গিয়াছে।

আট

তাহার পরদিন বৈকালে একটা স্টেশনারি দোকানে গিয়া অনেক নির্বাচন করিয়া সুরেন চিঠি লিখিবার প্যাড ও খাম কিনিল। দাম একটু বেশি দিতে হইল। এত দামী প্যাড ও খাম সে জীবনে এই প্রথম কিনিল এবং কিনিয়া আনন্দও পাইল। বাসায় ফিরিয়া ঘরে খিল দিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথম দুই-তিনখানা কাগজ নষ্ট হইল, লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইল, কিছুতেই ঠিক যেন মনোমত হইতেছে না। শেষে অনেক ভাবিয়া, অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া সে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিয়া ফেলিল। লেখা শেষ হইলে চিঠিটি আদ্যোপান্ত বারকয়েক পড়িয়া তবে সেটি খামে পুরিল। খামের উপর ঠিকানা লিখিতে যাইবে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে

পদশব্দ। সেই পরিচিত পদশব্দ। তাড়াতাড়ি চিঠিটা প্যাডের তলায় ঢাকা দিয়া সে তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিল।

আভা দেবী আসিয়াছেন।

"কি করছেন ঘরের ভেতর একা একা?"

সুরেনের মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"হ'ল কি আপনার? অসুখ করে নি তো কিছু?"

"না।"

"চলুন, ভেতরে বসা যাক একটু। সময় নেই বেশি হাতে।"

সুরেন একটু অনুযোগের সুরে বলিল— "অনেক দিন পরে এলেন!"

"হ্যাঁ, সময়ই হয়ে ওঠে না। আজ চ'লে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে।"

"চ'লে যাচ্ছেন!"

"হ্যাঁ, চাকরি করা পোষাল না।"

"পোষাল না মানে?"

"মুরারীবাবুর জন্যে। তিনি সেক্রেটারির কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠলেন যে, রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল। যাক, সে কথা অবান্তর। যে কথাটা বলতে এসেছি, ব'লে যাই। অনেক দিনই বলব বলব মনে করেছি, হয়ে ওঠে নি। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আপনার বন্ধুকে ত্যাগ ক'রে আমি চ'লে এসেছিলাম। কথাটা মিথ্যে নয়, ত্যাগ ক'রেই এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম, সেই কথাটাই আপনাকে আজ বলব। আপনাকে ব'লে যেতে চাই এই জন্যে যে, আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আপনি আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করবেন, এটা আমি চাই না।"

সুরেন নির্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল।

"আপনার বন্ধু লেখাপড়া-জানা স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি ঠিক তাঁর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ছিলাম কিনা জানি না। এইটুকু শুধু জানি, আমাকে তাঁর ভাল লেগেছিল, আমারও তাঁকে ভাল লেগেছিল। বিয়ে

হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন ; এবং সাধারণতঃ যেমন গল্পে পড়া যায়, আমার বেলায় সত্যি সত্যি তাই হয়ে গেল। আর্টিস্ট বন্ধু আর্টিস্টিক কায়দায় আমাকে একদিন একখানি চিঠি লিখে বসলেন। চিঠিটা পেয়ে ভাবলাম, স্বামীকে তাঁর বন্ধুর কীর্তিটা একবার দেখাই ; তখুনি আবার মনে হ'ল, কি দরকার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়ে! ও-রকম ধরনের চিঠি জীবনে তো অনেক পেয়েছি, কখনও হৈ-চৈ করি নি। এসব নিয়ে হৈ-চৈ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল। স্বামীকে কিছু না ব'লে চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিলাম। সেই হ'ল কাল। পুড়িয়ে ফেললেই চুকে যেত। হঠাৎ সেই চিঠি একদিন আমার স্বামীর হাতে প'ড়ে গেল, আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি, তুমুল কাণ্ড। আপনার বন্ধুর যে মূর্তি সেদিন আমি দেখেছিলাম, তা আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না। সামান্য একখানি চিঠি, তার ইতিবৃত্ত কিছুই না জেনে তিনি এরকম ভাষায় আমাকে গাল দিলেন যে, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘ'টে গেল। যে অবস্থাতেই ছিলাম সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে চ'লে এলাম। আসবার সময় ব'লে এলাম, লেখাপড়া-জানা রূপসী মেয়ে বিয়ে করবার উপযুক্ত তুমি নও। কোন খুকীকে বিয়ে ক'রে হারেমে পুরে রাখা উচিত ছিল তোমার।"

এই পর্যন্ত বলিয়া আভা চুপ করিলেন।

"তারপর?"

"আজ ওঁর চিঠি পেয়েছি, উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিঠি লিখেছেন ফিরে যেতে। আমিও কিছুদিন চাকরি ক'রে বুঝেছি, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া আমাদের আর কোন সত্য আশ্রয় নেই। যেখানে যাই, নানা ছুতোয় একঝাঁক পুরুষ পেছু নেবে। জীবনে কত রকমারী ধরনেরই যে চিঠি পেয়েছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। এখানে মুরারীবাবু তো আছেনই, আরও আছেন কয়েকজন ভদ্রলোক, নাম আর করব না।" আভা দেবী চুপ করিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—"আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যি বলছি, আপনিই একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেন নি। সত্যি বলছি, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, এবং এত কথা আপনাকে বললাম এর জন্যেই। আপনার বন্ধু যা বলতেন, ঠিকই দেখছি,

স্ট্রিক্টলি পিউরিটান আপনি। এবার কিন্তু বিয়ে করুন একটা। বলেন তো সম্বন্ধ করি।

স্থরেন বিবর্ণমুখে একটু হাসিবার ভান করিল।

আভা হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"ওমা, ট্রেনের আর বেশি সময় নেই তো! চললাম, নমস্কার। মনে রাখবেন।"

চলিয়া গেলেন। স্থরেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রভু-ভৃত্য

গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়াছেন।

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবার কথা, কিন্তু হাঁফটি ছাড়িতে পারিতেছি না। ভৃত্যটি পথরোধ করিয়া বসিয়া আছে। যে ভৃত্যটির তত্ত্বাবধানে গৃহিণী আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন সে অতিশয় বিচক্ষণ। কর্তব্যকর্মে বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই, পান হইতে চুনটি খসিতে দিতেছে না, আদেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা নির্বিবাদে প্রতিপালিত হইতেছে। তথাপি কিন্তু রুদ্ধশ্বাসে রহিয়াছি। কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছি না।

কারণ ভৃত্যটি গৃহিণী-পক্ষীয়।

নাম অরিন্দম।

আমার কোন আচরণের সে প্রতিবাদ করিতেছে না বটে, কিন্তু আমার প্রতি আচরণটি সে লক্ষ্য করিতেছে। যদিও তাহার বাড়ি এখানেই, কিন্তু আজকাল সে রাত্রে আমার বাসাতেই শুইতেছে। কারণ, তাহার গৃহিণীও নাকি পিত্রালয়ে। প্রোষিতপত্নীক ভৃত্য প্রোষিতপত্নীক প্রভুর পাহারা দিতেছে। আমি কোথায় যাই, রাত্রে কখন বাড়ি ফিরি, কি ধরনের লোকের সহিত মেলামেশা করি, ব্যঞ্জনে কি পরিমাণ ঝাল দিতে বলি, কাপড় জামা কত শীঘ্র শীঘ্র ময়লা করি, যে-সব বই পড়ি তাহাতে কি ধরনের ছবি থাকে—সমস্তই সে নীরবে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন গোপনে সে আমার নামে একটি 'চার্জশীট' প্রস্তুত করিতেছে, যথাসময়ে যথাস্থানে একদা পেশ করিয়া দিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলিবে—একবর্ণ মিথ্যা নহে।

দুই

সুতরাং ভয়ে ভয়ে আছি।

আকারে-ইঙ্গিতে খোসামোদ করিয়াই চলিতে হয়। সে আনন্দিত হইলে আমিও আনন্দ প্রকাশ করি, সে দুঃখিত হইলে আমিও দুঃখিত হই। কারণে-অকারণে বকশিশও দিতেছি। তথাপি কিন্তু তাহার কেমন একটা সি-আই-ডি

সি-আই-ডি গোছ ভাব—কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারি না। একজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার অনেক দিন হইতে বাসনা, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার সাহস হইতেছে না। মফস্বল জায়গা, তেমন হোটেল-ফোটেলও নাই, খাওয়াইতে হইলে বাড়িতেই আয়োজন করিতে হইবে, অরিন্দমই করিবে। রাত্রে খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলাম, কথাটা কি ভাবে পাড়া যায়! জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে পদে পদে নানারূপ অপরাধ করিতেছি নিশ্চয়, বোঝা হয়তো দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর এটাও চাপানো ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছিলাম।

নিতান্ত শাকের আঁটিটিও তো নয়।

অকস্মাৎ অরিন্দম বলিল—"দুধটা কেমন খেয়ে দেখুন তো বাবু।"

দুধের বাটিটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া অরিন্দমের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম সে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বাটিটার পানে চাহিয়া আছে। বুঝিলাম দুধকে ভাল বলা চলিবে না।

বলিলাম—"তেমন সুবিধে নয়।"

গভীর একটি 'হুঁ' করিয়া অরিন্দম কার্যান্তরে চলিয়া গেল। যে গুঁফো বুড়ো গোয়ালাটি অতি প্রত্যুষে আসিয়া আমাকে রোজ দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া থাকে তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ দেখা হয়, কারণ আমি বেলায় উঠিয়া থাকি। আগামীকল্য অরিন্দমের হস্তে তাহার অনিবার্য লাঞ্ছনার কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল। বুড়োকে সাবধান করিবারও তো আর সময় নাই।

তিন

দিন দুই পরে পুনরায় একদিন রাত্রে অরিন্দম বলিল—"আজকের দুধটা খেয়ে দেখুন তো!"

দুধে চুমুক দিয়া অরিন্দমের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম।

পুলকিত মুখচ্ছবি।

সত্য গোপন করিয়া বলিতে হইল—"আজকের দুধটা ভাল—বেশ ভাল।"

ঢক ঢক করিয়া এক নিশ্বাসে সবটা পান করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম, কাল সকাল সকাল উঠিয়া গুঁফো বুড়োকে যেমন করিয়া হোক ধরিতে

হইবে। দুধ দিয়া যখন বাহির হইয়া যাইবে তখন রাস্তায় তাহাকে ধরিয়া ধমকাইতে হইবে। অরিন্দমের সামনে কিছু বলা চলিবে না। কি জানি বুড়োর সহিত কি প্যাক্ট করিয়াছে হয়তো! কিন্তু এরকম দুধ-মেশানো জল প্রত্যহ খাইলে মারা যাইব যে!

চার

ভোরে উঠিয়াই কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া গেল!

গুঁফো নয়।

একটি কমবয়সী গোয়ালিনী রান্নাঘরের দাওয়ার উপর বসিয়া অরিন্দমকে দুধ মাপিয়া দিতেছে এবং অরিন্দম হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া অরিন্দম বলিল—"বুড়োর দুধ আপনার খারাপ লেগেছিল ব'লে একে বাহাল করেছি। কালও এই-ই দুধ দিয়ে গিয়েছিল, আপনি তো ভালই বললেন!"

কয়েক মুহূর্ত নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

তাহার পর গম্ভীরভাবেই বলিলাম—"দুধ একটু বেশি নে আজ। পুডিং বানাতে হবে। হাসপাতালের নার্স রুবি আজ রাত্রে খাবে এখানে।"

সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে অরিন্দম বলিল—"যে আজ্ঞে।"

প্রস্তর-সমস্যা

সূত্রপাত এইরূপে—

সাঁওতাল পরগণার এক পার্বত্য অঞ্চলে বায়ু-পরিবর্তন মানসে গিয়েছিলাম। প্রত্যহ ভ্রমণ করি, নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হই, পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়া পরিপাক করিয়া ফেলি, নিদ্রা এত প্রগাঢ় হয় যে তাহাকে সূচীভেদ্য না বলিয়া সূচী-অভেদ্য বলাই উচিত, ছুঁচ ফুটাইলেও পাশ ফিরি কিনা সন্দেহ। স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। অস্থিসার গণ্ডদ্বয় মাংসল এবং অক্ষিকোটরে বিলীয়মান অক্ষিযুগল শুধু প্রত্যক্ষগোচর নয়, রীতিমত কটাক্ষশালী হইয়া উঠিল। বহুকাল শিস দিই নাই। একদিন মনের আনন্দে শিস দিতে গেলাম, পারিলাম না। দেখিলাম আবহাওয়ার গুণে ওষ্ঠযুগল এরূপ স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কুঞ্চিত ও বিকৃত করিয়াও সুরের সূক্ষ্মতা আনয়ন করা গেল না। হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া মনে কিন্তু সুর জাগিয়াছিল। সুতরাং অনতিবিলম্বে এবং অনিবার্যভাবে আলোকপ্রাপ্ত মাইতি-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। যখন-তখন কারণে-অকারণে মিস যূথিকা মাইতিকে দেখিয়া আমার মংসল গণ্ড ও স্থূল ওষ্ঠ হাস্যজনিত কুঞ্চন-প্রসারণে অপরূপ হইতে লাগিল। মাইতি-পরিবারও বায়ু-পরিবর্তন মানসে আসিয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এক পুণ্ডরীকাক্ষবাবু ব্যতীত সকলেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ বলিষ্ঠ পুণ্ডরীকাক্ষবাবু যে কেন আসিয়াছিলেন প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। আর যে প্রয়োজনই তাঁহার থাক, বায়ু-পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। প্রায়ই ভাবিতাম, স্বাস্থ্য শব্দটির উপর মতুপ (বা বতুপ) প্রত্যয় যিনি এত সফলতার সহিত করিতে পারিয়াছেন তাঁহার এখানে আসিবার কারণ কি?

দুই

কিছুদিন পরেই মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে কারণটি উপলব্ধি করিলাম। রাত্রে মাইতি মহাশয়ের বাড়ি হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম। গেটটি

ছাড়াইয়া কিছুদূর আসিয়াছি—যূথিকার শেষ কথাগুলি তখনও কানে বাজিতেছে—এমন সময় একটি সুনিক্ষিপ্ত সুকঠিন প্রস্তরখণ্ড আসিয়া মস্তকে আঘাত করিল। চলতি বাংলায় মস্তকের যে স্থানটিকে 'রগ' বলা হয় সেই স্থানটি বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া পাথরটি কুড়াইয়া পকেটে পুরিলাম। ভবিষ্যতে মামলা করিতে হইলে পাথরটি কাজে লাগিবে। মামলা করিতেই হইবে, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায়শক্তির সাহায্য ব্যতীত পুণ্ডরীকাক্ষকে কায়দা করা যাইবে না। স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! আজকালকার স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে যূথিকার মত মেয়ের চতুর্দিকে উনি হারেম বানাইতে চান!

যথারীতি ডাক্তার এবং দারোগার শরণাপন্ন হইলাম।

দারোগাবাবুকে পাথরটি দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সেটি আমাকে ফেরত দিলেন এবং বলিলেন—"এ পাথরে তো তেমন কিছুই দেখছি না, তা ছাড়া শুধু পাথরের জোরেই তো আর কেস চলবে না। অন্য প্রমাণ চাই। দেখি এন্‌কোয়ারি ক'রে।"

সন্দেহ হইল অপর পক্ষ হইতে ঘুষ খাইয়াছেন। পাথরটি কিন্তু ফেলিয়া দিলাম না, রাখিয়া দিলাম। ভাগ্যে ফেলিয়া দিই নাই! কারণ কয়েক দিন পরেই ভাগ্যবিধাতার দূত এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বেশ ধরিয়া আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইলেন। ভদ্রলোক আমার অপরিচিত হইলেও আমার জনৈক বন্ধুর পরিচিত এবং তাঁহার নিকট হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছেন। যতদিন তিনি একটি বাসা যোগাড় করিতে না পারেন ততদিন যেন আমি তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে দিই। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য খারাপ, বিশুদ্ধ বায়ুর আশায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

স-প্রস্তর সমস্ত কারণ অকপটে তাঁহার গোচর করিলাম।

তিনি পাথরটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন এবং চুপ করিয়া গেলেন। দুই-চারি দিন পরে তিনি যে কথা বলিলেন তাহা গোপনে বলিলেই পারিতেন, কিন্তু কথাটা জানাজানি হইয়া গেল।

আমি মামলা উঠাইয়া লইতে চাহিলাম।

পুণ্ডরীকাক্ষ কিন্তু ছাড়িল না।

তিন

মামলা চলিতেছে।

মামলার স্বরূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

আমি আদালতে শপথ করিয়া বলিয়াছি, পুণ্ডরীকাক্ষ আমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারেন নাই, তাঁহার সহিত আমার কোন কলহ নাই, আমি হঠাৎ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া মস্তকে আঘাত পাইয়াছি। প্রস্তরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।

পুণ্ডরীকাক্ষ শপথ করিয়া বলিতেছেন পাথরটা তাঁহারই এবং আমি চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে তাড়া করিয়াছিলেন এবং তাড়ার চোটে পড়িয়া গিয়া মস্তকে চোট পাইয়াছি।

উভয়েই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। সার্থক এবং নিরর্থকভাবে উকিল, ডাক্তার, দারোগা যাহাকে পাইতেছি তোয়াজ করিতেছি। জলের মত অর্থ ব্যয় হইতেছে।

চার

আমার বাসায় আগত ভদ্রলোকটি সন্দেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রমাণ করিয়াছেন যে পাথরটি সহজ পাথর নহে—অতিশয় দামী একখণ্ড হীরা। দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনায়াসে উঠিবে।

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সাঁওতাল পরগণার উক্ত পার্বত্য স্থানটির নাম আমি উহ্য রাখিলাম। গল্প-লেখকের অন্তত এ অধিকারটুকু আছে আশা করি।

যূথিকা

অপ্রত্যাশিত রকম যোগাযোগ। সে-ই গত পরশ্ব আমাকে জানাইয়াছে সে ছাড়া তাহাদের বাড়িতে আর সকলে সিনেমায় যাইবে। তাহার সিনেমা দেখিতে ভাল লাগে না বলিয়া যাইবে না। এ সুযোগ অভাবনীয় সুযোগ, ছাড়া শক্ত। চিঠি লিখিয়া দিয়াছি, আপিস-ফেরত তাহার নিকট যাইব। তাহাকে বহুবার দেখিয়াছি, রোজই আমাদের বাড়িতে আসে কিন্তু কখনও একা পাই নাই, সুযোগ ঘটে নাই। ছিপছিপে চটুলনয়না মেয়েটি আমার ভগ্নীর সখী। ভগ্নীর সখী হিসাবেই প্রথম আলাপ হইয়াছিল প্রায় মাস ছয়েক পূর্বে। তাহার পর…

ঘনঘন আপিসের ঘড়ির দিকে তাকাইতেছি, কখন পাঁচটা বাজিবে।

দুই

স্পন্দিত বক্ষে বাহিরের ঘরটাতে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকার। এইখানেই তাহার থাকিবার কথা। চাকর-বাকরদের কোন ওজুহাতে সরাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম তাহা তো ঠিকই করিয়াছে দেখিতেছি। কেহ কোথাও নাই। কিন্তু সে কোথায়? অন্ধকারে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোথায় সে? সহসা কাপড়ের খসখস ও চুড়ির শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম সোফার উপর কে যেন বসিয়া আছে, মুখ দেখা যাইতেছে না। সোফার কাছে আগাইয়া গেলাম।

"যূথি—"

যূথি উত্তর দিল না। আমি আর একটু কাছে গিয়া চুপি চুপি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—"যূথি, তোমাকে প্রথমে দেখতে না পেয়ে আমার কি যে মনে হচ্ছিল,—কতক্ষণ ব'সে আছ?"

কোন জবাব নাই। একটু নড়িয়া চড়িয়া আর একটু জড়োসড়ো হইয়া বসিল।

"রাগ করলে নাকি?"

যূথি নিরুত্তর।

"কথা বলছ না যূথি ?"

যূথি মাথাটি একটু হেঁট করিল। তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সে আর একটু সঙ্কুচিত হইল।

তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলাম—"যূথি, রাগ করেছ ?"

যূথিকা তবু কিছু বলে না।

"যূথি—"

প্রাণে অনেক কিছু জাগিতেছে, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলি কি করিয়া ! আকূতির ভাষা নাই। একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু তাহাও কিছুক্ষণ পরে অসহ্য হইয়া উঠিল।

"যূথি—"

যূথিকা নীরব। মনে হইল, তাহার সমস্ত শরীরে যেন কিসের একটা শিহরণ বহিয়া গেল, তথাপি সে নীরব।

"যূথি—"

যূথির কি হইয়াছে, কথা বলে না কেন ! তাহার একখানা হাত আমার হাতের মধ্যে ছিল। স্পর্শে অনুভব করিলাম, অনামিকায় একটি আংটি রহিয়াছে। যূথিকাকে কোনদিন আংটি পরিতে দেখি নাই। হাত দিয়া আংটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পুনরায় কহিলাম—"যূথি—"

যূথি হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

তিন

একটু পরে বাড়ি ফিরিয়া দেখি যূথি আমাদেরই বাড়িতে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আপনার আজ ফিরতে এত দেরি হ'ল যে আপিস থেকে ?" ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম—"আটকে পড়েছিলাম এক জায়গায়।" মা আমার চা জলখাবার আনিতে বাহির হইয়া গেলেন। ভগ্নী পাশের ঘরে তাহার খোকাটিকে ঘুম পাড়াইতেছিল। যূথিকে একা পাইয়া প্রশ্ন করিলাম—"আমার চিঠি পাও নি সকালে ?"

"না, কি চিঠি ? কার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ?"

"ডাকে পাঠিয়েছিলাম। তোমাকে বাইরের ঘরটায় একা থাকতে বলেছিলাম, দুটো কথা ছিল তোমার সঙ্গে। পাও নি সে চিঠি ?"

যূথি অনামিকার আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে নির্বিকারভাবে বলিল—"কই না!"

অবাক্ হইয়া গেলাম।

বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট

ছাপোষা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হলধর হালদার মহাশয় চতুর্থ কন্যার বিবাহের ফর্দ করিতে বসিয়া নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন যে, সত্যই তিনি বিপন্ন। নিজের পুঁজিপাটা সব নিঃশেষ হইয়া হাজার খানেক টাকা ধারও করিতে হইয়াছে, তথাপি সঙ্কুলান হইতেছে না। বরপক্ষীয়গণ যাহা লইবেন তাহা তো সুনির্দিষ্ট, এক পয়সা কমাইবার উপায় নাই। ভোজের খরচ যদি কিছু কমানো যায় এই আশায় হলধর ফর্দটি লইয়া প্রিয়বন্ধু ও মন্ত্রী অখিল মিত্রের নিকট পুনরায় গমন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া অখিল বলিলেন—"ওর চেয়ে কম খরচে আর হয় না রে দাদা, কোন্‌টা কমাবে বল তুমি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হলধর ফর্দটির পানে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই কিছু কমাইবার নাই। লুচি, শাকভাজা, কুমড়োর ডালনা, ছ্যাঁচড়া, মাছের কালিয়া, চাটনি, এক রকম মিষ্টি এবং দই। ভদ্রতা বজায় রাখিতে হইলে ইহার অপেক্ষা কম করিলে আর চলে না।

অখিল বলিলেন—"এই ক'রে ক'রে চুল পাকিয়ে ফেললাম রে ভাই, ওর চেয়ে কমে আর হয় না, হতে পারে না।"

বলিয়া তিনি হাসিলেন। হাসির অর্থ—পাগল নাকি তুমি! বোঝা গেল অখিল মিত্রকে বিচলিত করা যাইবে না। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল অধিকতর কুঞ্চিত করিয়া হলধর বলিলেন—"তা হ'লে—"

অখিল কহিলেন—"উপায় নেই।"

ব্যর্থমনোরথ হলধর বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, নিধি গোয়ালা দধির বায়না লইবার জন্য আসিয়াছে। নিধিরামকে দেখিবামাত্র হলধরের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল। পেটি-বুর্জোয়া হলধর প্রোলিটারিয়েট নিধিরামের সহায়তায় কিছু খরচ বাঁচাইবেন সঙ্কল্প করিলেন।

"ভাল দই কত ক'রে মণ ?"

"ভাল দই বিশ টাকা ক'রে পড়বে বাবু।"

"তার চেয়ে নিরেশ ?"

"পনরো আছে, দশ আছে—"

"তার চেয়ে কম নেই ?"

"থাকবে না কেন বাবু, সাড়ে সাত আছে, পাঁচ টাকা মণ অবধি আছে, তবে সে ভাল জিনিস হবে না।"

হলধর চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুই মণ দধি লাগিবে। টাকা পঁচিশেক অনায়াসে বাঁচানো যায়।

বলিলেন—"দেখ বাপু নিধিরাম, ওই পাঁচ টাকা মণের দই-ই তুমি দু' মণ দিও। কিন্তু একটি কথা আছে।"

"আজ্ঞা করুন।"

"দই খেয়ে যদি কেউ নিন্দে-টিন্দে করে—"

"নিন্দে আজ্ঞে করবেই। পাঁচ টাকা মণের দই, সঙীন দই হবে হুজুর।"

"হ্যাঁ, তাই বলছি নিন্দে-টিন্দে যদি কেউ করে, তখন তোমাকে ডেকে আমি একটু ধমক-টমক দেব। ভাবটা যেন তোমাকে আমি ভাল দই-ই দিতে বলেছিলাম, তুমি যেন আমাকে ঠকিয়েছ। তুমি একটু কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো—ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না।"

নিধিরাম ঘোষ তাহার ঝাঁকড়া গোঁফে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিল—"সেটা কি ঠিক হবে হুজুর! ওসব তঞ্চকতার ভেতর আমি—"

"এর জন্যে একটা টাকা বেশী দেব তোমায়। এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার কর তুমি, ভাল দই কেনবার আমার পয়সা নেই। অথচ মানটা বাঁচাতে হবে।"

দ্বিধাগ্রস্ত নিধিরাম অবশেষে রাজী হইয়া গেল।

দুই

নিধিরামের কথা মিথ্যা হয় নাই।

দধি নয়, যেন আগুন!

আহার্যদ্রব্যের প্রতিপদেই হলধর কার্পণ্য করাতে বরযাত্রিগণের প্রত্যেকেই এক-একটি বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়া ছিলেন। দধি পড়িতেই একযোগে সকলে

ক্ষেপিয়া উঠিলেন।—এরকম দই যে কোন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোকের পাতে দিতে পারে তাহা কল্পনাতীত।

পাতা ঠেলিয়া দিয়া সকলে নাকে কাপড় দিলেন।

হলধর করজোড়ে কহিলেন—"দইটা কি—"

"অখাদ্য মশাই—অখাদ্য।"

"তাই নাকি! অথচ আমি ভাল দই ফরমাশ দিয়েছিলাম।" সহসা হলধরের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। তারস্বরে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নিধে—নিধে—"

নিধিরাম নিকটেই ছিল, আসিয়া দাঁড়াইল।

হলধর বলিতে লাগিলেন—"কি দই দিয়েছ তুমি?"

"আজ্ঞে দই তো ভালই।"

এঁরা তা হ'লে মিথ্যে কথা বলছেন! বেটাচ্ছেলে, হারামজাদা, ঠকাবার আর জায়গা পাও নি তুমি!"

নিধিরাম কাঁচুমাচু হইয়া মস্তক অবনত করিল। সম্ভবত আবেগের আতিশয্যেই হলধর কিন্তু থামিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া নিধিরামের গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—"জুয়াচোর, পাজি কোথাকার—"

নিধিরাম মুখ তুলিয়া বলিল—"চড় মারবার তো কথা ছিল না। চড় মারলেন যে বড়! আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক রয়েছেন, বিচার করুন আপনারা—"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলধর গিয়া প্রাণপণে নিধিরামের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীধরের উত্তরাধিকারী

মক্ষিচুস্!

স্থানীয় বেহারীগণ শ্রীধর মিত্রকে এই আখ্যাই দিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত কথাটির অর্থ অনেকে হয়তো জানেন না। মক্ষিচুস্ আখ্যা সেই সকল মহাত্মাকেই দেওয়া হয়, যাঁহারা মক্ষিকাকে চুষিয়াও গুড় অথবা মধু আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। শ্রীধর মিত্তিরের কৃপণতা ও শোষণপটুতা সম্বন্ধে স্থানীয় বাঙালী বিহারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একমত। সজ্ঞানে প্রভাতে কেহ তাহার নামোচ্চারণ করেন না এবং দৈবাৎ করিয়া ফেলিলে উপবাস-আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীধর মিত্রের দীর্ঘ জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে, তিনি কখনও কাহাকেও এক কপর্দক দান করেন নাই; কিন্তু বহু কপর্দক বহু লোকের নিকট হইতে বহুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখনও করিতেছেন। বর্তমানে স্থদে টাকা খাটানোই তাঁহার প্রধান উপজীবিকা। কয়েকখানা ভাড়াটে বাড়িও প্রতি মাসে তাঁহাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রজাবিলি করা কিছু জমি আছে। কিছু কোম্পানির কাগজও আছে। আয়ের পথ এতগুলি আছে, কিন্তু ব্যয়ের পথ নাই বলিলেও চলে। জন থাকিলেই ধনক্ষয় হয়। শ্রীধরের তিন কুলে কেহ নাই। আত্মীয়স্বজন সকলেই একে একে পরলোকগমন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন শ্রীধর নিজে এবং তাঁহার পুরাতন ভৃত্য নকুড়। নকুড় অবশ্য শুধু ভৃত্য নয়। সে একাধারে পাচক, ভৃত্য, বন্ধু, পরামর্শদাতা—সব। দিনে নকুড় ভাতে-ভাত ফুটাইয়া দেয়। রাত্রে হরি গোয়ালা স্থদ-পরিশোধকল্পে যে দুধটুকু দিয়া যায় তাহাই উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট! জলখাবারের পাট নাই। পোশাক-পরিচ্ছদের খরচও নাই বলিলেই চলে। আইন বাঁচাইবার জন্য যতটুকুই আবরণ প্রয়োজন ততটুকুই শ্রীধর মিত্রের অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। দিনে সূর্য এবং রাত্রে রেড়ির তেলের ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ তাঁহার অন্ধকার মোচন করিয়া থাকে।

টাকা স্থতরাং জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয়—মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি। শ্রীধর মিত্র যদিও ভুলক্রমে কখনও নিজের ঐশ্বর্যের কথা কাহারও নিকট উল্লেখ করিতেন না, কিন্তু সকলেই জানিয়াছিল যে শ্রীধর মিত্র নামক কদাকার বৃদ্ধটি বেশ

শাঁসালো ব্যক্তি। তাঁহার শাঁসটুকুর কিয়দংশও অন্তত হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে নানা লোক নানা ভেক ধারণ করিয়া সততই তাঁহার দুয়ারে ধরনা দিত। শ্রীধর থাকিতেন শহরের বাহিরে নিজেরই একটা শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে, অর্থাৎ সেই বাড়িটাতে—যাহার ভাড়াটে সহজে জুটিত না। কিন্তু শহরপ্রান্তের সেই পোড়ো বাড়িতেই অর্থ-অনুসন্ধিৎসু মতলব-বাজগণ গিয়া হাজির হইতেন।

দুই

সেদিন গিয়াছিলেন জলধরবাবু।

জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে, স্বদেশহিতৈষীও। সম্প্রতি শহরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। শ্রীধর মিত্রের হৃদয় বিগলিত করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী একটি বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ শ্রীধর মিত্র তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—"খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার দরকার কি ?"

বিস্মিত জলধর বলিলেন—"তার মানে ?"

"মানে, লেখাপড়া না শিখেই এই শহরের মেয়েগুলো যে রকম বাবু হয়ে উঠেছে, লেখাপড়া শিখলে এদেশের সব গণেশই তো উল্টে যাবে। কি বলিস নোকৃড়ো ?"

নকুড় একটু মৃদু হাস্য করিল মাত্র।

শ্রীধর আবার বলিলেন—"ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই গণেশকে কাত করেছে—মেয়েরা শিখলে একদম উল্টে যাবে। কেউ রক্ষে করতে পারবে না। ওসব দুর্বুদ্ধি ছাড়ুন আপনি জলধরবাবু।"

জলধরবাবু কোনদিন গণেশের দিক দিয়া স্ত্রী-শিক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই। প্রথমটা তিনি একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি উকিল মানুষ। কোথায় কি ভাবে কোন্ কথা বলিলে কাজ হাসিল হয় তাহা তাঁহার জানা আছে।

সুতরাং তিনি বলিলেন—"মেয়েরা লেখাপড়া শিখে নিজেরা রোজগার করলে তবে না বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন না করলে টাকার প্রতি দরদ হয় না। গণেশকে খাড়া রাখবার জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত।"

দেখা গেল, অ-উকিল শ্রীধর মিত্রও কম নন।

নকুড়ের দিকে এক নজরে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"ছাগলকে দিয়ে যব মাড়িয়ে নেওয়া যদিই বা সম্ভবপর হয়, ছাগলের স্বভাব কি বদলে যাবে তাতে বলতে চান? সে কি যবগাছে আর মুখ দেবে না? না, যবের গাদায় ছেড়ে দিলে নয়-ছয় করবে না? বল্ না রে নোকুড়ো, ও-পাড়ার ব্যাপারখানা!"

অদূরে উপবিষ্ট নকুড় এবারও কিছু না বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

শ্রীধর তখন নিজেই বিবৃত করিয়া বলিলেন—"ঘোষালপাড়ায় আমার যে বাড়িটা আছে, তার এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই বেশ লেখাপড়া জানে শুনেছি। কিন্তু তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসুন, কি কাণ্ড-কারখানা! স্বামীটি ক্রমাগত সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছেন, আর স্ত্রীটি ক্রমাগত শেলাই ক'রে যাচ্ছেন। কলের খচখচি শুনে মনে হয় দরজীর বাড়ি। ওই যে কি এক রকম জামা মেয়েরা পরে, তাই ক্রমাগত শেলাই হচ্ছে শুনলাম। জামাগুলোর কি নাম যে ভাল—মনেও থাকে না ছাই!"

নকুড় বলিল—"বালাউস্।"

"বালাউস্—বালাউস্! এত বালাউস্ নিয়ে যে কি হবে তাই ভাবি। পরবে কখন?"

জলধরবাবু বুঝিলেন, তর্ক-পথে চলিবে না।

বলিলেন—"সবাই কি আর এক রকম হয়? তা ছাড়া আপনার মত প্রবীণ বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারি কি আমি? মোট কথা, সৎকার্য আরম্ভ করেছি একটা, কিছু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত বদনে শ্রীধর কিছুক্ষণ জলধরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন—"সাহায্য!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ পাঁচজনের কাজ, কিছু দিতে হবে আপনাকে।"

সকাতরে শ্রীধর বলিলেন—"আমি দরিদ্র মানুষ। এতবড় বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্য করা আমার সাধ্যে যে কুলোবে না জলধরবাবু। বিশ্বাস করুন, অতি দরিদ্র আমি।"

জলধরবাবু বিশ্বাস করিলেন না।

বলিলেন—"তিল কুড়িয়েই তো তাল। সবাই কিছু-কিছু সাহায্য না করলে হবে কি ক'রে! বুঝছেন না!"

"বুঝছি তো। কিন্তু আমার যে তিলের সামর্থ্যও নেই।"

"ও আমি শুনব না—কিছু দিতে হবে আপনাকে।"

জলধরবাবুর ব্যবহারে একটা নাছোড়বান্দা ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীধর শঙ্কিত হইলেন। উকিল মানুষকে চটাইতেও সাহস হয় না। সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের মৃত্যুকালীন উপদেশের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। অশুভস্য কালহরণম্! বলিলেন—"এখন তো কিছুতেই পেরে উঠব না। আসছে মাসে চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। আধপেটা খেয়ে থাকব আর কি! কি বলিস রে নোকৃড়ো?"

নকুড় পুনরায় মৃদু হাস্য করিল।

জলধরবাবু অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন।

তিন

জলধরবাবুর কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম। সকলের কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কেহই শ্রীধর মিত্রের ধনভার লাঘব করিতে পারেন নাই—সকলকেই ব্যর্থমনোরথ হইতে হইয়াছিল। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল, খদ্দরধারী স্বদেশীর দল, হার্মোনিয়ামধারী বন্যাসাহায্যকারীর দল, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনী-সভার সভ্যগণ, লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠাতৃগণ, কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ ব্রাহ্মণ—সকলের আবেদনই শ্রীধর মিত্র ধৈর্যসহকারে শুনিয়া যাইতেন। ধৈর্য হারাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। সকলকেই কিন্তু অবশেষে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইয়াছিল।

চার

টাকা সুতরাং জমিতেছিল।

তিলে তিলে, ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া শ্রীধর মিত্রের ধনরাশি এমন একটা অঙ্কে গিয়া পৌঁছিল যে, শেষকালে তাহা শ্রীধর মিত্রেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

শ্রীধর চিন্তা করিতে লাগিলেন—জীবন তো শেষ হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যু যে

কোন মুহূর্তে আসিয়া হানা দিতে পারে। এতগুলা টাকার পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হইবে? মাটির তলায় এই বিপুল ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? সেদিন লটারির খেলাতেও তিনি বেশ কিছু টাকা পাইয়াছেন। লটারি খেলার দিকে শ্রীধরের ঝোঁক আছে। মাঝে মাঝে লটারির জন্যই তিনি দুই-চারি টাকা বাজে খরচ করেন। গত বৎসর লটারির দৌলতে বেশ কিছু অর্থাগম হইয়াছে। কিন্তু এত অর্থের পরিণতি কি হইবে, নকুড়টা শেষকালে সব ভোগ করিবে? আযৌবন-সহচর নকুড়কে অবশ্য তিনি কিছু দিয়া যাইবেন, কিন্তু সমস্ত টাকাটাই সে ভোগ করিতেছে—এ চিত্র মোটেই মনোজ্ঞ নয়। নকুড়টাই বা কতদিন বাঁচিবে? শেষকালে সমস্ত টাকাটা নকুড়ের উত্তরাধিকারী সেই ঘাড়ছাঁটা ভাইপোটার হস্তে গিয়া পড়িবে নাকি? একথা চিন্তা করিলেই শ্রীধরের সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠে। বালিকা-বিদ্যালয়ে টাকাগুলা দিয়া যাইবেন? না, প্রাণ থাকিতে তাহা তিনি পারিবেন না। আজকালকার বিলাস-প্রবণ হাই-হিল-জুতাপরা মেয়েগুলোকে দেখিলেই তাঁহার অস্থিপঞ্জর জ্বলিতে থাকে। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে টাকাটা দিলে কেমন হয়? দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বর্তমান ডাক্তার খোঁচা-গোঁফ পরেশ চক্রবর্তীর মুখটা স্মৃতিপটে উদিত হইলেই এ ইচ্ছা আর দ্বিতীয়বার হয় না। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের? ও-ভণ্ড ব্যাটাদের টাকা দিয়া লাভ? বন্যা-প্রপীড়িতদের? স্বয়ং ভগবান যাহাদের শাস্তিবিধান করিয়াছেন তাহাদের বাঁচাইবে শ্রীধর মিত্তির? ও চিন্তা করাই অনুচিত। টাকাগুলা শুধু জলে পড়িবে। স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির ছোঁড়াগুলা কিছু টাকার জন্য ধরিয়াছিল। তাহাদের কিছু দিলে কেমন হয়? ঘোড়ার ডিম হয়! যে স্বাস্থ্য তাহাদের আছে, তাহারই আহার যোগানো কঠিন ব্যাপার। এমনিই তো প্রত্যেকটা ষণ্ডামার্ক। ইহার অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবান হইলে খোরাক যোগাইবে কে? সকলেরই গণেশ উল্টাইয়া যাইবে শেষকালে!

শ্রীধরের কিছুই মনঃপূত হয় না।

রোজই চিন্তা করেন। কিন্তু কি করিলে যে অর্থটার প্রকৃত সদ্গতি হয় কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন না।

পাঁচ

অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। কি ভীষণ রাত্রি সেদিন!

মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত, মুষলধারে বৃষ্টি, প্রবল ঝড়। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বেচারী নকুড় সেই দারুণ ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দাহ করিবার জন্য লোক ডাকিতে হইবে। জলধরবাবুর নিকটে গেল। শ্রীধরের উপর জলধরবাবু প্রসন্ন ছিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন যে, তাঁহার শরীর খারাপ—এই দুর্যোগের রাত্রে তিনি মড়া বহিতে পারিবেন না। নকুড় তখন পরিচিত অন্যান্য ভদ্রলোকদের নিকটে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং সকাতরে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু মক্ষিচুসের শব বহন করিয়া এই দারুণ রাত্রে তিন ক্রোশ দূরবর্তী শ্মশানে যাইতে কেহই রাজী হইলেন না। একটা-না-একটা অজুহাত দেখাইয়া সকলেই ঘরে খিল দিলেন। বিপন্ন নকুড় ব্যাকুলভাবে প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল।

ছয়

অনেকক্ষণ পরে নকুড় ফিরিল।

একটিমাত্র লোককে সে যোগাড় করিতে পারিয়াছিল। লোকটি অপর কেহ নয়—ঘোষালপাড়ার সিগারেটখোর সেই ভদ্রলোকটি। শ্রীধরের মৃত্যু-সংবাদে একমাত্র তিনিই বিচলিত হইয়াছিলেন এবং এই নিদারুণ দুর্যোগ সত্ত্বেও শব বহন করিতে আপত্তি করেন নাই। ব্লাউস-বিলাসিনী তাঁহার পত্নীটিও এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন; নকুড় বাহিরে দাঁড়াইয়া স্বকর্ণে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই মৃত শ্রীধর মিত্র উঠিয়া বসিলেন ও সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"কে কে এল ?"

সিগারেটখোর ভদ্রলোক স্তম্ভিত।

নকুড় সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা করিল। লটারি-খেলোয়াড় শ্রীধর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার পর অকস্মাৎ উঠিয়া সিগারেটখোর ভদ্রলোককে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চুম্বন করিলেন। শ্রীধরকে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে নকুড়ও কখনও দেখে নাই। চুম্বনান্তে শ্রীধর বলিলেন—"তোমাকেই আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলাম। নোকুড়োকেও অবশ্য কিছু দিতে হবে।"

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—"দেখ, নগদ চার লাখ টাকা আছে আমার। তা থেকে ইচ্ছে কর তো স্ত্রী-শিক্ষা বাবদ কিছু খরচ করতে পার তুমি। আপত্তি করবার উপায় নেই আর আমার।"

তাহার পরদিনই যথাবিধি উইল করিয়া শ্রীধর কথাকে কার্যে পরিণত করিলেন। আমরণ এ উইল তিনি পরিবর্তন করেন নাই।

জাগ্রত দেবতা

মন্দিরটি যদিও জীর্ণ, আশেপাশে কচুবন ঘেঁটুবন, দিনান্তে মহাদেবের মাথায় এক ফোঁটা জল পড়ে কিনা সন্দেহ—মহাদেব কিন্তু জাগ্রত। সনাতনপুরের মহাদেবের নাম শোনে নাই কে? জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে। বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়াই মোকদ্দমায় জিতিয়াছেন এবং এত বড় বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পালেদের বাড়ির ছেলেটা টাইফয়েডে তো প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিলই, এই মহাদেবের দ্বারে ধরনা দিয়াই তাহার মা তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। মুকুজ্যেদের যে আজকাল এত বাড়বাড়ন্ত তাহাও এই মহাদেবের কৃপায়। মহাদেবই স্বপ্নে দেখা দিয়া তাহাকে পাটের ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়া হরিহর ঘোষালও লটারিতে টাকা পাইয়াছেন। এরকম ছোটখাটো প্রমাণ ছাড়াও জীর্ণ-মন্দিরবাসী মহাদেবের মহিমার আর একটি ভয়ানক প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন এই মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া সনাতনপুরে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড উৎসব হয়। বহু নরনারী সেদিন শিবের মাথায় জল ঢালিয়া থাকেন, শিব শিব হর হর ব্যোম ব্যোম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। মুকুজ্যেরা এই উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করাইয়া মহাদেবের স্বপ্ন-ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পান। চৌধুরীদের বাড়ি সেদিন আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, এবং গ্রামের সকলে সেদিন সেখানে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। আরও একটা ঘটনা সেদিন ঘটে—এইটাই মহাদেব-মাহাত্ম্যের জলন্ত প্রমাণ—একজন লোক সেদিন পাগল হইয়া যায়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পাগল ভোলানাথ প্রতিবৎসরই একজনকে তাঁহার নিজের দলে টানিয়া লন।

দুই

সে বছরও বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। মুকুজ্যেদের বাড়িতে অভিনীত 'কর্ণার্জুন' নাটকের অভিনয়-চমৎকারিত্বে সকলেই পুলকিত। চৌধুরী-বাড়িতে যদিও

পায়েসটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সকলে পরিতৃপ্তি-সহকারেই আহার করিয়াছিলেন। মেলাটাও বেশ জাঁকজমকসহকারেই বসিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সংখ্যাও নিতান্ত কম আসে নাই। উৎসবের পরদিন এইসব লইয়া পালেদের চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় যাদব আসিয়া বলিল—"ওহে শুনেছ, এ বছর কেউ পাগল হয়নি!"

সমস্ত আলোচনা থামিয়া গেল। বলে কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! হরেন বলিল—"কেন, ওই গেঁজেল বিশেটা?"

যাদব বলিল—"দেখে এলাম ঠিক আছে।"

সকলেই আশা করিয়াছিল, বিশেই এবার মহাদেবের মান রক্ষা করিবে। সেও ঠিক আছে।

প্রবীণ নীলমণি এতক্ষণ নীরবে তামাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"এ হতে পারে না, ভাল ক'রে খুঁজে দেখ, কেউ, না, কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। চিরকাল ধ'রে হয়ে আসছে—"

যাদব বলিল—"এবার সকলের মাথা ঠিক আছে, কেউ বেঠিক হয়নি।"

নীলমণি বলিলেন—"এ হতে পারে না।"

যাদব হাসিয়া বলিল—"আমি বলছি, কেউ পাগল হয়নি এবার।"

নীলমণি ধমকাইয়া উঠিলেন।

"তুমি তো সেদিনকার ছোঁড়া হে, তোমার কথার আবার মূল্য কি! তোমার কথায় কি চিরকালের নিয়ম উল্টে যাবে? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ-না-কেউ পাগল, এখনও জানা যায় নি।"

যাদব স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল।

তিন

পরদিনও কোন পাগলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনাতনপুরবাসীরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যই এ বছর কেহ পাগল হয় নাই। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। মহিলাগণ বলিলেন—এ রকমটা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্বেই অনুমান

করিয়াছিলেন। বছরে মাত্র একদিন মহাদেবকে লইয়া ঘটা করিলে কি হইবে, বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন তো শিবকে কেউ পোঁছেও না, শিবের মাথায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ে না। মহাদেব বলিয়াই এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আর কতদিন সহিবেন? মাতব্বর হালদার মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে, ইহা আর কিছুই নয়, কলির প্রতাপ। কলি নিজের প্রতাপ দেখাইবেন না? সনাতনপুরের মহাদেব বলিয়াই এতকাল নিজ প্রতাপ বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, অন্য কোন মহাদেব হইলে কোন্ কালে তলাইয়া যাইতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি মহাদেবের অধঃপতনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। ধনী মুকুজ্যেরা দায়ী করিলেন পুরোহিতকে—ওই ব্যাটাই কিছু গোলমাল করিয়াছে। পুরোহিত চৌধুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লগিলেন। নামহীন একটা বিপদের ছায়া সনাতনপুরের সকলকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিল।

চার

দমিলেন না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।

তাঁহার বিশ্বাস, কেহ-না-কেহ নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপুরের বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে? হইতেই পারে না।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত চক্ষু, স্ফীত নাসা! ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

সনাতনপুরবাসিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।

সে সব শুনিতেছিল।

"অত বিচ্ছিরি ওষুধ আমি খেতে পারব না।"

"ডক্টর বোস তো ব'লে গেলেন মিষ্টি হবে খেতে।"

"মিষ্টি না ছাই, যা বিচ্ছিরি গন্ধ!"

"কোথায় গন্ধ, তোর যত অনাছিষ্টি বাপু, নে, খেয়ে নে, বিজন আবার এসে পড়বে এখুনি। ছোট বউ, ক'টা বাজল দেখ তো! ওরে হিরু, পিকদানিটা দিয়ে যা, কতক্ষণ ধ'রে ধুচ্ছিস?"

হিরু পিকদানি দিয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে ছোট বউ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"সাড়ে দশটা বেজেছে।"

"তা হ'লে তো আর দেরি নেই মোটে। নে, খেয়ে নে ওষুধটা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি বাপু?"

"কে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছে তোমাকে! যাও না তুমি।"

"ওষুধ খাবি না তুই?"

"অত বিচ্ছিরি ওষুধ আমি খেতে পারব না।"

"লক্ষ্মীটি!"

"উঁ, তুমি খালি খালি বিচ্ছিরি ওষুধ খাওয়াবে আমাকে!"

"কি করব বল মা, তখন আমার মানা তো শুনলে না, দল বেঁধে গেলে সিনেমায় ফিনফিনে ব্লাউজ গায়ে দিয়ে, এখন ভোগ। ডক্টর বোস বলেছেন—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, চার-পাঁচ দিন লাগবে সারতে।"

"কিচ্ছু জানে না ডক্টর বোস, তোমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ষোলটা ক'রে টাকা নিয়ে যায় খালি, আর যত রাজ্যের বিচ্ছিরি ওষুধ লিখতে জানে।"।

"বিলেতফেরত বড় ডাক্তার—সে কিচ্ছু জানে না, আর তুমি মহা পণ্ডিত হয়েছ!"

"হয়েইছি তো।"

"নে, খেয়ে নে শিগগির, ঠাকুর পায়েসটার কতদূর কি করলে, কে জানে! ওরে হীরু!"

"আজ্ঞে মা, যাই।"

"পোলাওটার চারপাশে আঙরা দিয়ে রাখতে হবে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না হ'লে। তুই কাঠকয়লাগুলো ধরা ততক্ষণ। কি করছিস তুই?"

"বাসন মাজছি।"

"আগে কাঠকয়লাগুলো ধরা।"

"আচ্ছা।"

"খেয়ে নে ওষুধটা তাড়াতাড়ি, অনেক কাজ আমার।"

"কি কি রান্না হয়েছে আজ মা?"

"কই আর করতে পারলুম সব! কাঁকড়া ভেট্‌কিমাছ এসেই পৌঁছল না। কেষ্ট যত বুড়ো হচ্ছে, তত যেন ওর ভীমরতি হচ্ছে।"

"গলদা চিংড়ি এসেছে?"

"এসেছে।"

"ফ্রাই করেছ বুঝি?"

"যা মূর্তিমান ঠাকুরটি জুটেছে, কি রকম যে কি করেছে কে জানে! কিমাগুলো আমি না গিয়ে পড়লে তো মাটিই ক'রে ফেলত আর একটু হ'লে!"

"ফাউলের কি করলে?"

"রোস্ট।"

"মাটনের কোর্মা করেছ বুঝি?"

"কি আর করি, তুই ভাল থাকলে কাবাব করতে পারতিস। কাবাব করা আনাড়ী ঠাকুরের কর্ম নয়। নে, ওষুধটা খেয়ে নে।"

"কত সব ভাল ভাল রান্না হচ্ছে বাড়িতে, আর আমাকে ওষুধ গেলাচ্ছ খালি! খাব না যাও আমি ওষুধ।"

"আচ্ছা, তুই কি!"

"এক দাগ তো খেয়েছি।"

"এক দাগে অসুখ সারলে আর ভাবনা ছিল না। নে, খেয়ে নে, আর জ্বালাস নি।"

"তুমি ঢাকা দিয়ে রেখে যাও, আমি খাব এখন পরে।"

"দশটার সময় খাওয়ার কথা, সাড়ে দশটা বেজেছে, আবার পরে কেন ?"

"ভাল লাগে না।"

"আজ বাদে কাল বিয়ে হবে মেয়ের, খুকীপনা এখনও ঘুচল না!"

"বিয়ে আমি করছি কিনা। আই. এ. পড়ব।"

"দুবার ফেল ক'রে ম্যাট্রিক পাস করেছেন, আবার আই-এ পড়ার শখ!"

"বাঃ রে, সে কি আমার দোষ নাকি? সবাই মিলে কার্সিয়াঙে নিয়ে গিয়ে আমাকে পড়তে দিলে নাকি একটুও? খালি পার্টি আর পার্টি। তার আগের বার তো দিদির বিয়ের হাঙ্গামেই গেল। নিজেরা যত হাঙ্গামা জোটাবেন, আর দোষ হবে আমার!"

"বেশ বেশ, সব দোষ আমাদের। এখন ওষুধটা খেয়ে নাও দেখি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"মা পুডিং করেছ?"

"পুডিং না করলে চলে, বিজন আসছে।"

"আমি পুডিং খাব একটু।"

"ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস ক'রে দিতে পারি না মা।"

"ডক্টর বোস তো দুধ এগফ্লিপ সব খেতে বলেছেন। পুডিংয়ে তো দুধ আর ডিম আছে। আর ভারি তো নাইন্টি-নাইন জ্বর!"

"নাইন্টি-নাইন থেকে একশো পাঁচ হতে বেশি দেরি লাগে না মা। সেবার অমিতার বেলায় দেখেছি তো।"

"পুডিং না দিলে আমি ওষুধ খাচ্ছি না।"

"কাল খাস, রেফ্রিজারেটারে রেখে দোব।"

"জামাইবাবু যা ভালবাসে তোমার হাতের পুডিং, সব শেষ করবে আজকেই। আমাকে একটু দাও, তোমার জামাইয়ের ভাগে কিছু কম পড়বে না।"

"তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু। ডক্টর বোসকে ফোনে তা হ'লে জিজ্ঞেস করি; থাম, নিজের দায়িত্বে দিতে পারব না আমি।...সাউথ থ্রি ফাইভ ও প্লীজ। ইয়েস। হ্যালো, কে, ডক্টর বোস? ও, ডক্টর বোস বাড়ি নেই? আমি মিসেস হালদার, ডক্টর বোস কখন ফিরবেন? ঠিক নেই? আচ্ছা ধন্যবাদ!"

"একটু দাও আমাকে, একটু খেলে কিচ্ছু হবে না।"

"না মা। ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস ক'রে দিচ্ছি না আমি। সেবার অমিতার বেলায় আধখানা কেক দিয়ে সে কি কাণ্ড!"

"দিদির তো টাইফয়েড হয়েছিল!"

"পরে না সেটা বোঝা গেল। গোড়ায় গোড়ায় তো প্রমথ ডাক্তার ইনফ্লুয়েঞ্জাই বলেছিল।"

"বিলেতফেরত এই চালিয়াতটার চেয়ে বুড়ো প্রমথ ডাক্তার ঢের ভাল।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, কাল তোমার প্রমথ ডাক্তারকেই ডাকা যাবে জ্বর যদি না ছাড়ে। এখন তো এই ওষুধটা খেয়ে নাও।"

"বড্ড বিচ্ছিরি যে!"

"ছোট বউ, বেদানাগুলো ছাড়িয়ে আন তো।"

"বেদানা খাব না।"

"তবে আপেলটাই কেটে আন।"

"আপেল বিচ্ছিরি।"

"আঙুর তো ফুরিয়েছে, কেষ্টকে তখুনি বললুম আর এক বাক্স এনে রাখতে, দু বাক্সে কুলোয় কখনও! নাকটা টিপে ঢক ক'রে খেয়ে ফেল না মা, কতটুকুই বা! কি আনবে তুমি ছোট বউ?"

মৃদুস্বরে ছোট বউ বলিলেন—"আপেল, বেদানা, পেয়ারা।"

"ওসব চাই না আমার, চারটি সুপুরি আর ধনেরচাল ভাজা দাও।"

"ও তো বললে খাব না, তবু কেন তুমি এগুলো কেটেকুটে নষ্ট করলে! সবাই মিলে পাগল ক'রে দেবে দেখছি আমাকে!"

ছোট বউ কোন উত্তর দিলেন না।

"আচ্ছা, আমি এমনই খাচ্ছি, কিন্তু তার বদলে একটা জিনিস দিতে হবে আমাকে।"

"কি আবার?"

"ঝুমকো।"

"এই তো সেদিন দুল গড়ালে, আবার ঝুমকো?"

"তা হ'লে ওষুধ খাব না, যাও।"

"তোকে নিয়ে আর পারি না আমি, অনি।"

"উঃ কতদিন থেকে তো বলেছ, ঝুমকো গড়িয়ে দেবে। মালতী, রুবি, ফুলু—সক্কলের গড়িয়ে পুরনো হয়ে গেল।"

"বেশ বেশ মা, তুমিও গড়িও, এখন ওষুধটা খেয়ে উদ্ধার কর আমায়। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আমি।"

"এই বারটি খাচ্ছি, আর খাব না কিন্তু।"

"পরের কথা পরে হবে, এবারটি তো খাও।"

"তোমাকে চিনি না আমি? প্রত্যেক বারই ওই কথা বলবে।"

"অনি, আর কথা বাড়াস নি, ভাল লাগছে না আমার।"

"বলছি তো খাব, দাও না, কিন্তু এই বারটি।"

"বাবা বাবা, এক দাগ ওষুধ খাবেন মেয়ে, তা নিয়ে কি কাণ্ড!"

"জল জল, শীগ্‌গির।"

"এই যে, নে না।"

"হীরু আসিয়া বলিল—"কয়লা ধরানো হয়েছে মা।"

"আচ্ছা, তুই পিকদানিটা নিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফের দিয়ে যা।"

"নাকটা ছাড়িস নি তুই অনি, চেপে থাক্ জোরে।"

নাক-চাপা কণ্ঠস্বরে অনি বলিল—"কতক্ষণ চেপে থাকব! এবার ছাড়ছি আমি।"

"থাম, পিকদানিটা আনুক।"

হীরু পিকদানি দিয়া গেল।

"চুপটি করে শুয়ে থাক এবার, আমি রান্নার দিকটা দেখিগে একটু। ছোট বউ না হয় কাছে বসুক।"

"না, কাউকে বসতে হবে না। তুমি ওই আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও। চোখের সামনে দপদপ ক'রে জ্বলছে। মাথা আমার আরও ধ'রে গেল।"

"বেশ, এটা নিবিয়ে দিচ্ছি, শিয়রের দিকে নীল আলোটা জ্বলুক।"

উজ্জ্বল আলোটা নিবিয়া গেল। স্নিগ্ধ নীল আলোয় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর জানালার কাছে আবছা একটা মূর্তি দেখা গেল। অনি জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঔষধটা ফেলিয়া দিতেছে। ষোল টাকা ভিজিটওয়ালা ডাক্তারের দামী ঔষধ সমস্তটা ফেলিয়া দিল।

সে সব দেখিতেছিল।

তাহার কেবল মনে হইতেছিল, তাহার প্রথম পক্ষের মেয়েটা মরিবার সময় এক ফোঁটা ঔষধ পায় নাই। বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে মারা গিয়াছে। হাসপাতালের ঔষধ পর্যন্ত আনা হয় নাই। কেমন করিয়া আনিবে! সে যে নিজেও তখন শয্যাগত। স্ত্রীও ছিল না। জমিদার-তনয় তাহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন।

দুই

একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল বোধ হয়। হর্ন শোনা গেল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। বিলাতী কুকুর, গলার আওয়াজেই বোঝা যাইতেছে। অনেকগুলো পদশব্দ, জিনিসপত্র নামানোর শব্দ।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"বিজন এল বুঝি? ওমা, সায়েবী পোশাকে চেনাই যে যায় না দেখছি! তার-পর, এস বাবা, এস বাবা, এস। থাক আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। তারপর খবর সব ভালো তো?"

বিনীত অথচ পরুষকণ্ঠে উত্তর হইল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানকার খবর সব ভাল?"

"ভাল আর কই? অনি জ্বরে পড়েছে।"

"তাই নাকি?"

"এত মুশকিলে পড়েছি আমি। ওঁর টেলিগ্রাম পেয়ে বম্বে চ'লে যেতে হ'ল, ডিরেক্টারদের মিটিং সেখানে। যাবার দিন বার্থ রিজার্ভ নিয়ে সে আবার এক হাঙ্গামা, কেষ্টকে তো চেনই, কি ফোন করতে কি ফোন করেছে ওই জানে, বার্থ রিজার্ভ হয় নি। সে এক কাণ্ড!"

"অনিতার কদিনের জ্বর?"

"কাল থেকে হয়েছে। ডক্টর বোসকে ডেকেছিলাম, তিনি বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা। ওমা, ও-বাড়ির হারাণকাকা আসছেন, আমি যাই, তুমি দেরি ক'রো না বেশি।"

গৃহিণীর চলিয়া যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

"বিজন ভায়া এসে পড়লে নাকি? থাক্ থাক্ আর পেন্নামে কাজ নেই,

প্যান্টালুনের বোতাম ছিঁড়ে যাবে। হ্যাঁ, অমিতাদির ক্ষমতা আছে বটে! সাত দিন যেতে না যেতেই—এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌—"

হারাণবাবু তাঁহার নিজস্ব ধরনে হাসিতে লাগিলেন।

"আমার জিনিসটা এনেছ তো?"

"এনেছি। কিন্তু রূপোর সেট, অন্য কিছু তেমন পছন্দ হ'ল না, জয়পুরী কাজ।"

"ওরে বাবা, ডুবিয়েছ তা হ'লে বল!"

"আপনাকে ডোবাবার মত সমুদ্র পৃথিবীতে আছে নাকি?"

"এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌—"

"হঠাৎ এ শখ হ'ল যে! দিদিমার বুঝি আবার—"

"আরে না না, সে-সব কিছু নয়। বিয়েতে উপহার দিতে হবে একটা।"

"সেকথা জানলে অন্য রকম আনতুম। দিদিমাকে লক্ষ্য ক'রেই রাশটা আলগা ক'রে দিয়েছিলুম।"

"এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌।"

"তারপর এখানকার খবর কি?"

"আমার মুখে তো সে-সব ভাল শোনাবে না। স্বস্থানে সব শোন গিয়ে। আমি যাই এখন, অমিতাদির অভিশাপ কুড়িয়ে লাভ নেই—এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ —কাল আসব আবার।"

হারাণকাকা চলিয়া গেলেন। বিজনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ হইল।

"কি হ'ল?"

স্যুটকেস ও হোল্ড-অলের ভারে হীরু চাকরটা চকচকে মার্বেলের মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। স্যুটকেস ও হোল্ড-অলের কোন ক্ষতি হইল কিনা, তাহা নিরূপণ করিতেই সকলে প্রথমটা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর নজর পড়িল হীরুর প্রতি।

"লেগেছে নাকি, ও কি, রক্ত পড়ছে যে!"

বিনীতকণ্ঠে হীরু বলিল—"না, বেশি লাগে নি।"

"আচ্ছা জামাইবাবু, কি ব'লে আপনি আজ এলেন?"

"উৎকণ্ঠিত হয়ে আছ বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করি! ছুটি পেলাম না।"

"ব'য়ে গেছে আমার উৎকণ্ঠিত হ'তে।"

"জ্বর খুব বেশি নাকি?"

"নাইন্টি-নাইন।"

"এত কম জ্বরে সাধারণতঃ লোকে ভুল বকে না।"

"ভুল বকলাম কখন?"

"চির-উৎকণ্ঠিতা তুমি, অথচ বলছ—ব'য়ে গেছে আমার উৎকণ্ঠিত হতে! এ যে বড় আশঙ্কাজনক উক্তি!"

"অহঙ্কারটা একটু কমান।"

"কমিয়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই তো আসা।"

"কেন আজ এলেন আপনি? নিজে বেশ মজা ক'রে নানা রকম জিনিস খাবেন, আর আমাকে শুয়ে শুয়ে ওষুধ খেতে হবে?"

"সেটা কি আমার দোষ?"

"না তো কি! আর দুদিন পরে এলেই হ'ত।"

"দেখি নাড়ীটা?"

"আপনি কি ডাক্তার?"

"শালীর নাড়ী বোঝবার জন্যে ডাক্তার হওয়ার দরকার করে না।"

"উঃ, উঃ, লাগছে—ছাড়ুন।"

পাশের ঘরটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

"অমিতা, তুই বিজনের খাবারের কাছে থাক্‌ একটু, আমি চান ক'রে আহ্নিকটা সেরে ফেলিগে, রাত অনেক হয়েছে। তুমি আর দেরি ক'রো না বাবা, ব'সে পড়।"

গৃহিণী স্নান-আহ্নিকের ছুতা করিয়া কন্যা-জামাতাকে আলাপের সুযোগ দিয়া চলিয়া গেলেন।

অমিতা বলিল—"তুমি এলেই মায়ের বিপদ।"

"কেন?"

"তুমি এলেই উনি ফাউল আনাবেন, কারও মানা শুনবেন না, আর ফাউল ছুঁয়ে চানও করবেন রাত দুপুরে।"

"তার চেয়েও বেশি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আমার ক্ষিদে নেই। বর্ধমানে কেল্‌নারে ঢুকে এক পেট খেয়েছি।"

"কেল্‌নারে ঢুকে খেতে যাওয়া কেন আবার?"

"ক্ষিদে পেয়েছিল।"

"এখানেও খেতে হবে সব। একটি জিনিসও পাতে প'ড়ে থাকলে চলবে না। মা সেই দুপুর থেকে ব'সে ব'সে সব করিয়েছেন।"

"তা হ'লে কি তোমার ইচ্ছেটা, জিনিসগুলো প'ড়ে না থেকে আমি প'ড়ে থাকি? এসব খেলে তো আমি আর উঠতে পারব না এখান থেকে।"

"একটু একটু ক'রে খাও না।"

"একটা জিনিস খেতে পারি।"

বিজন চুপি চুপি কি বলিল, শোনা গেল না।

অমিতা তর্জন করিয়া উঠিল—"লোভীটা!"

একটু পরে।

হীরু বলিল—"কুকুরটা আর খেতে পারছে না মা।"

"কি আর হবে তা হ'লে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিগে যা।"

"আচ্ছা।"

"আমি এবার শুতে যাচ্ছি। তুই চায়ের টেবিলটায় সব গুছিয়ে রেখেছিস তো? নতুন চাকরের সঙ্গে বকতে বকতে প্রাণটা গেল।"

"রেখেছি মা।"

"অনির ঘরের জানালার পরদাগুলো টেনে দিয়েছিস?"

"দিয়েছি।"

"খিড়কির দরজাটায় বাইরে থেকে তালাটা টিপে দিয়ে যাস।"

"আচ্ছা।"

গৃহিণী শুইতে গেলেন।

হীরু চাকরও চলিয়া গেল। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

সে আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রথম স্ত্রীকে গ্রাস করিয়াছে

জমিদার, দ্বিতীয় স্ত্রীকে যক্ষ্মা। ঘরে একপাল অনাহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে। বাজারেও আজকাল ধার জোটে না। ডাস্টবিনটা একবার দেখিয়া আসিলে কি হয়! ভাল-মন্দ জিনিস—না, দরকার নাই। অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া সে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল। অমিতা ও বিজন যে ঘরটায় শুইয়া ছিল, সেই ঘরের জানালাটার নীচে আসিয়া কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কিছু শোনা গেল না। সন্তর্পণে উঠিয়া জানালায় কান পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিল। না, কোন সাড়াশব্দ নাই। চাকরটাও ঘুমাইয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে সিঁধকাঠিটা বাহির করিয়া সে কাজ শুরু করিয়া দিল।

মাসখানেক পরে চোরের শাস্তি হইল।

থানার দারোগা, কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টর, কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী, সকলের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া মাননীয় বিচারপতি মহাশয় অকাট্য প্রমাণ পাইলেন যে, হীরু চাকরটাই চুরি করিয়াছিল।

আইন অনুযায়ী তাহার সাজা হইয়া গেল।

মাধব মুকুজ্যে

রাত্রি দশটা। অমাবস্যার রাত্রি, চতুর্দিকে অন্ধকার। মাধব মুকুজ্যে ক্লাব হইতে ফিরিতেছিলেন, পথে চাটুজ্যে মহাশয়ের সহিত দেখা। চাটুজ্যের হাতে লণ্ঠন।

মুকুজ্যে। কি হে চাটুজ্যে, খবর কি?

চাটুজ্যে। চ'লে যাচ্ছে।

মুকুজ্যে। মেয়ের বিয়ের কিছু হ'ল?

চাটুজ্যে। কই আর হ'ল ভাই! বিনা পণে কোন সুপাত্রই বিয়ে করতে রাজী নয়। অথচ দেখ, আমার মেয়ে কিছু নিন্দের নয়। লেখাপড়াও কিছু জানে, গেরস্তালি কাজকর্মে নিখুঁত, সেলায়ের কাজ নেহাত মন্দ করে না, গান-বাজনাও কিছু শিখেছে; কিন্তু হ'লে কি হবে, সাড়ে তিন হাজারের কম কোন ব্যাটাই রাজী হয় না! এমন সমাজে বাস করি—

মুকুজ্যে। সমাজের দোষ দিও না। তুমি নিজে অসমর্থ তাই বল।

চাটুজ্যে। সমাজের দোষ নয়, বল কি তুমি!

মুকুজ্যে। (গম্ভীরভাবে) সমাজের বিন্দুমাত্র দোষ নেই।

চাটুজ্যে। বিন্দুমাত্র দোষ নেই?

মুকুজ্যে। না।

চাটুজ্যে উত্তেজিত হইলেন। বাঁ-হাতি গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া কিছুদূর গেলেই তাঁহার বাড়ি। কিন্তু তিনি গলিতে ঢুকিলেন না, তর্ক করিতে করিতে মুকুজ্যের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন

চাটুজ্যে। তোমার মতে তা হ'লে পণপ্রথাটা অন্যায় নয়। আমার ধারণা ছিল তুমি পণপ্রথার বিরোধী।

মুকুজ্যে। পণপ্রথা যদি অন্যায় হয়, তা হ'লে ট্রেনে টিকিট কেটে যাওয়ার প্রথাটাও অন্যায়।

চাটুজ্যে। তার মানে?

মুকুজ্যে। তুমি কাশ্মীর বা গৌহাটী যাবার বেলায় রেল-কোম্পানিকে পয়সা দিতে ইতস্তত কর না, যে ক্লাসে চ'ড়ে যাও সেই ক্লাসের মতই ভাড়া দাও। অথচ মেয়ে পার করবার বেলায় পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দাম দিতে চাও না, এরই বা মানে কি!

চাটুজ্যে একটু থতমত খাইলেন। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিলেন

চাটুজ্যে। কাশ্মীর বা গৌহাটী যাওয়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের তুলনা চলে না।

মুকুজ্যে। চলবে না কেন, খুব চলে। রেলে গমনাগমন করাও তোমার যেমন প্রয়োজন, মেয়ের বিয়ে দেওয়াও তেমনি তোমার প্রয়োজন। একটার জন্যে স্বচ্ছন্দে পয়সা খরচ করতে তোমার আপত্তি হয় না, আর একটার জন্যে হয় কেন?

চাটুজ্যে। বিয়েটা একটা সামাজিক ব্যাপার। ও নিয়ে অত দরকষাকষি করা—

মুকুজ্যে। তুমি যে পুরুতগিরি কর, বিনা দক্ষিণায় কর? ওটাও তো সামাজিক ব্যাপার। ডাক্তার, মাস্টার, উকিল, লেখক, ব্যবসাদার—সবাই নিজের যোগ্যতা অনুসারে মূল্য নেয়, বরই বা নেবে না কেন?

চাটুজ্যে। তা ব'লে এত নেবে?

মুকুজ্যে। খুব বেশী কি? যে ধরনের পাত্র তুমি চাও সে হিসেবে খুব বেশী নয়। ফার্স্ট ক্লাসে যেতে হলে বেশী ভাড়া দিতে হবে না? থার্ড ক্লাসে যাও, কম ভাড়ায় হবে। তোমরা সবাই যে ফার্স্ট ক্লাস পাত্র চাও! দেখতে ভাল হবে, বিদ্বান হবে, উপার্জনশীল হবে, বংশ ভাল হবে, সচ্চরিত্র হবে, বাপের বিষয় থাকবে, দোজবরে হবে না—অর্থাৎ চাও একটি নিখুঁত জিনিস, কিন্তু বিনা পয়সায় তা কি কখনও হয়? হওয়া উচিতও নয়।

চাটুজ্যে। উচিত নয়?

মুকুজ্যে। নিশ্চয় নয়। তোমার মেয়ের ভরণপোষণের জন্য তুমিই দায়ী। কিন্তু সে দায়িত্ব তুমি নির্বিবাদে চাপিয়ে দিতে চাও আর একজনের স্কন্ধে। বিনা পয়সায় এ ভার সে নেবে কেন? একটি মেয়ের ভরণপোষণের খরচ যদি গড়পড়তায় মাসে পনরো টাকা ক'রেও ধর এবং তার বিবাহিত জীবন যদি কুড়ি বছর হয় মনে কর, তা হ'লে একুনে কত টাকা হয় হিসেব ক'রে দেখ দিকি! সাড়ে তিন হাজার টাকার ওপর হয়। আইনত, এই টাকাটা তোমারই দেয়, কারণ তুমিই মেয়েটির জন্মদাতা। তুমি তোমার মেয়েকে যে স্টাইলে রাখো সেই অনুসারেই হিসেব করলাম, মেয়েকে যদি বড়লোকের ঘরে দিতে চাও তা হ'লে অঙ্কটা আরও বেশী হবে।

চাটুজ্যে। অঙ্ক তো বুঝলাম, কিন্তু বিয়ে করাটা কি কেবল মেয়েরই প্রয়োজন, ছেলের নয়?

মুকুজ্যে। এখানে তো ছেলেমেয়ের প্রয়োজনের প্রশ্ন উঠছে না। এখানে

তোমার প্রয়োজনটাই মুখ্য। তুমি তোমার প্রেস্টিজ, কুল, গোত্র, গণ, বাঁচিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাও, ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ কর। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েও যাবে অথচ পয়সা চাইলেই নাকে কাঁদবে—এ মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের কথা তুলেছিলে—

চাটুজ্যে। হ্যাঁ, তুলেছিলাম বইকি।

মুকুজ্যে। তাদের প্রয়োজন তারাই অনায়াসে মিটিয়ে নিতে পারত যদি আমরা তাদের বাধা না দিতাম। তোমার যুবতী মেয়ে যদি স্বাভাবিক নিয়মে কোন বলিষ্ঠ সদ্গোপ যুবককে আকৃষ্ট করে তা হ'লে তুমিই সবচেয়ে বেশী খাপ্পা হয়ে উঠবে। অথচ যদি ঐ ছোকরাটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হও, একটি পয়সা পণ লাগবে না তোমার। উল্‌টে হয়তো ওই ছোকরাই কিছু দেবে তোমাকে—

চাটুজ্যে। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে। সে যদি মোহে পড়ে যাকে-তাকে একটা—

মুকুজ্যে। ঠিক কথা। তাকে মোহ থেকে বাঁচিয়ে তার ভবিষ্যৎ যদি ইনসিওর করতে চাও প্রিমিয়ম দিতে হবে। এবং যে কোম্পানি যত ভাল, তার প্রিমিয়মও তত বেশী—এতো সোজা হিসেব।

চাটুজ্যে। তা হ'লে কি তুমি বলতে চাও—

মুকুজ্যে। আর আমি কিছু বলতে চাই না। বাড়ি পৌছে গেছি, এবার তুমি যেতে পার। (হাসিলেন)

চাটুজ্যে। না না, কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক, দাঁড়াও।

মুকুজ্যে। পরিষ্কারই তো আছে। (হাসিয়া) আরে, এ কথাটা ভুলে যাও কেন, আমার নিজেরই চার চারটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে বর্তমান। কিন্তু আজ অন্ধকার ভীষণ, টর্চটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়াছিলাম, তোমার হাতে লণ্ঠনটা দেখে তর্কটা তুললাম। তর্ক না তুললে কি তুমি আসতে আমার সঙ্গে এতদূর?

চাটুজ্যে। তা হ'লে তোমার মতে পণপ্রথাটা—

মুকুজ্যে। অতিশয় খারাপ।

মুকুজ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

নির্ভর

বেরিবেরি হইয়াছিল, চেঞ্জে আসিয়াছি।

শুনিলাম, দিবাকরবাবুই এখানে বিচক্ষণ নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক। তাঁহাকেই ডাকিয়াছিলাম এবং তাঁহার উপদেশাবলী মন দিয়া শুনিতেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বলিতেছিলেন—"দেখুন, ওভারলোড করবেন না কখনও নিজেকে, অল্প অল্প খাবেন, বারে বেশী খেতে পারেন ; কিন্তু একেবারে কখনো বেশী খাবেন না। আপনার হার্ট খারাপ, বেশী খেলে কষ্ট পাবেন। আর একটা কথা—অ্যাণ্ড দিস্ ইজ মোস্ট ইম্‌পর্টাণ্ট্—রেস্ট্। ফিজিকাল অ্যাণ্ড সাইকিকাল রেস্ট্। বিশ্রাম করতে হবে। বেশী চলা-ফেরা করা, বেশী উত্তেজিত হওয়া এসব একেবারে চলবে না।" সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"উপন্যাস-টুপন্যাস পড়তে পাব তো ?" ডাক্তারবাবুর কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। বলিলেন—"উত্তেজনা-মূলক উপন্যাস না পড়াই ভাল। সাদা-মাটা গোছের হ'লে পড়তে পারেন।"

তাহার পর তিনি নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মানসিক উত্তেজনায় হার্টের গতি-বেগ দ্রুততর হয় এবং দুর্বল হার্টের গতি-বেগ দ্রুততর হইলে তাহা বিপজ্জনক হইয়া থাকে। আমার হার্টের রিজার্ভ-শক্তি নাকি খুব কম।

"বই পড়ার দরকার কি, সামনের জানলাটা খুলে দিয়ে সিনারি দেখুন। এমন চমৎকার সিনারি রয়েছে আপনার বাড়ির সামনে, দিব্যি দেখুন না ব'সে ব'সে। আপনার সময় কাটাবার ভাবনা কি!"

বুঝিলাম তর্ক করা নিষ্ফল।

"সিগারেট খেতে পারি ?"

"একদম নয়।"

অপ্রতিভমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"খাবার কি কি খেতে পারি ?"

"খেতে সবই পারেন, কিন্তু সেটা লঘু-পথ্য হওয়া চাই, গুরুপাক কিছু খেলেই কষ্ট পাবেন। তেল একদম চলবে না। আর এমন কোন জিনিস খাবেন না যাতে পেটে গ্যাস হয়। দু-একখানা লাইট্ বিস্কুট, কি টোস্ট্, দু-একটা ভাজাভুজি—কিন্তু

ঘিয়ে, মাইণ্ড ছ্যাট—একটু চা, যদি সহ্য হয় একটু দুধ কিংবা ডিম, দু-একখানা হাতে-গড়া রুটি—এইসব খাবেন আর কি, যখন যেটা স্যুট করে। খাওয়াটা নিজেই ঠিক ক'রে নিতে হবে আপনাকে। কোন্ খাবার কাকে স্যুট করবে তা অফহ্যাণ্ড্ বলা বড় শক্ত। কেউ এক কুঁচি শশা খেয়েই আইঢাই করে, কারো আবার এক কাপ দুধ খেলেও কিছু হয় না। দুটি জিনিস কেবল লক্ষ্য রাখবেন—ওভারলোড করবেন না, আর পেটে যেন গ্যাস না হয়। তা হ'লেই ভাল থাকবেন। ভাতটা খাবেন না।"

"ওষুধ-বিষুধ কিছু দেবেন কি?"

"ওষুধ দিতে হবে বইকি, কাগজ দিন একখানা।"

পকেট হইতে চশমার খাপ বাহির করিলেন এবং খাপ হইতে বেশ পুরু রিম-ওয়ালা একটি চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। টেবিলের উপর একখানা প্যাড ছিল, আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তারবাবু পুরা দুইখানি পাতার ঔষধের ফর্দ লিখিয়া দিলেন। দুইটি মিক্শ্চার—একটি গ্যাস-নিবারক, অপরটি হৃৎপিণ্ডের শক্তিবর্ধক। একটি কোষ্ঠ-পরিষ্কারক পুরিয়াও দিলেন, প্রয়োজন হইলে রাত্রে শুইবার সময় খাইতে হইবে। ভিটামিন-বি-ঘটিত একটা পেটেণ্ট ঔষধও প্রত্যহ দুইবার করিয়া চলিবে। ইহা ছাড়া আপাতত সপ্তাহে চারিটি ইন্জেক্শন লইতে হইবে, একটি গ্লুকোজ পঞ্চাশ সি. সি. এবং তিনটি ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামের কোর্স শেষ হইলে ভিটামিন-বি'র ইন্জেক্শন শুরু করিবেন, ভিটামিন-বি বেরিবেরি হার্টের পক্ষে নাকি খুবই উপকারী। এসব ছাড়া তিনি ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি দিয়া আর একটি মিক্শ্চার লিখিয়া দিলেন—সময়-অসময়ে রাত-বিরাতে যদি হার্ট বিগড়াইয়া যায় এক দাগ খাইয়া ফেলিতে হইবে।

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"রোজ দু বেলা আপনার ব্লাড্ প্রেসারটা মাপতে হবে। ডায়াস্টোলিক প্রেসার আর পাল্স্-প্রেসারটা দু বেলাই দেখা দরকার—"

"বেশ।"

চশমাটি খুলিয়া খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—"হ্যাঁ, আর একটি কথা মশাই, পূবে হাওয়াটি বাঁচিয়ে চলবেন। পূবে হাওয়া গায়ে লাগলে, কি জানি কেন, হার্টটা একটু বিগড়ে যায়।"

"বেশ, পূবে হাওয়া লাগাব না।"

চশমার খাপ পকেটে পুরিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, এবার উঠি তবে। আর কোন ভয় নেই আপনার, চিয়ার আপ।"

সহাস্যমুখে পিঠ ঠুকিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিদেশে নির্ভরযোগ্য ডাক্তারবাবুটিকে পাইয়া নিশ্চিত হইলাম।

রাত্রে একটু যেন শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল।

বুঝিলাম, হার্ট গোল বাধাইয়াছে। বিবেকেও গোল ছিল। সন্ধ্যার সময় পুডিংটা একটু বেশী বোধ হয় খাইয়াছি, সিগারেটও টানিয়াছি, তাহা ছাড়া যে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছি সেখানি জেম্স্ জয়সের লেখা কমা-ফুলস্টপ-হীন একটানা কাঁচা বাস্তব ব্যাপার।

হার্টের অপরাধ নাই।

শুইয়া ছিলাম, উঠিয়া বসিতে হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম একটু পরে আপনিই বোধ হয় কমিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, কমিল না। বাহিরে গভীর রাত্রি সাঁ-সাঁ করিতেছে—কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। পাশেই পত্নী শুইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইলাম। শোভা তাড়াতাড়ি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ব্যস্তসমস্তভাবে মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস, মাথায় হাওয়া করিলেই সব রোগ সারে।

খানিকক্ষণ হাওয়া করিয়াও যখন কোন ফল হল না, তখন বলিলাম—"ভানুকে বল, দিবাকরবাবুকে আর একবার ডেকে আনুক।"

ভানু আমার ভাই, সঙ্গে আসিয়াছে। পাশের ঘরেই ছিল।

বাইসিকল চড়িয়া সে অবিলম্বে বাহির হইয়া গেল।

শোভা বলিল—"ডাক্তারবাবু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে সেই যে ওষুধটা দিয়ে গেছেন, সেইটে খাও না ততক্ষণ। এনে দেব?"

"দাও।"

এক দাগ সেবন করিলাম।

শোভা পুনরায় হাওয়া করিতে লাগিল।

একটু পরে, যে কারণেই হোক, সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। শ্বাসক অনেকটা কমিয়া গেল, ধীরে ধীরে শুইতে পারিলাম। ভাবিতেছিলাম, চাকরটাকে

পাঠাইয়া ডাক্তারবাবুকে আসিতে বারণ করি। অকারণে ডবল ফী গনিয়া লাভ কি, এই তো খানিকক্ষণ আগে বিকালবেলায় দেখিয়া গিয়াছেন।

ভানু আসিয়া প্রবেশ করিল।

"দিবাকরবাবু মারা গেছেন এক্ষুনি একটু আগে—"

"সে কি! কি ক'রে?"

সিবিল সার্জন বললেন—"হঠাৎ হার্ট ফেল ক'রে।"

উঠিয়া বসিলাম।

শোভা আবার মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

দর্জি

এত কাজ, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

কলের খচখচানিতে নিজেরই বিরক্ত ধরিতেছে, কিন্তু উপায় নাই, কাল সকালের মধ্যে আড়াই শত পতাকা প্রস্তুত করিয়া দিতেই হইবে। এই খচখচানির অন্তরালে রজত-নিক্কণ উহ্য আছে এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

নির্মল আসিয়া প্রবেশ করিল। চেনা ছোকরা, এইখানকার কলেজেই পড়ে। আমারই কাছে কামিজ পাঞ্জাবি করাইয়া থাকে।

নির্মল বলিল—"শিশিরদা, আমাদের কলেজ ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ট্রাইকলার ফ্লাগ চাই!"

"আমার ভাই আজ ফুরসত নেই, অন্য কোথাও যাও।"

"কারো ফুরসত নেই, সকলের কাছেই গেসলাম।"

"সবাই ফ্লাগ তৈরি করছে?"

"সক্কলে।"

কথাটা মিথ্যা নয়। শহরের সমস্ত দর্জিই ব্যস্ত।

"আমার কিন্তু ভাই অবসর নেই। চারটে দর্জি লাগিয়েছি, তবু কূল পাচ্ছি না—"

"আমার কিন্তু চাই-ই। বলেন তো বেশী চার্জ দেব।"

"ডবল দিতে হবে।"

"বেশ।"

নির্মল তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি কাজ করিতে হইবে—উপায় নাই।

মহাত্মা গান্ধী কাল এই স্টেশন দিয়া 'পাস্' করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে যাইবে।

দুই

দুই বৎসর কাটিয়াছে।

আজও পুনরায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছি না। আজও অবিরাম কলের খচখচানিতে বিরক্তি ধরিতেছে এবং আজও নিরুপায়ভাবে তাহা সহ্য করিতেছি। আজও সেই একই ব্যাপার, কাল সকালের মধ্যে আড়াই শত পতাকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আজও নির্মল আসিয়া প্রবেশ করিল।

সেই এক কথা।

"শিশিরদা, আমাদের কলেজ ইউনিয়নের জন্যে পঞ্চাশটা ফ্লাগ চাই।"

আমিও সেই একই উত্তর দিলাম।

"আমার ভাই আর ফুরসত নেই, অন্য কোথাও যাও।"

উত্তরে নির্মল দুই বৎসর আগে যাহা বলিয়াছিল এবারও তাহাই বলিল— "কারো ফুরসত নেই, সকলের কাছে গেসলাম। আমাদের ক'রে দিতেই হবে— বলেন তো বেশী চার্জ দেব।"

পূর্ববৎ সুযোগ বুঝিয়া আমি ডবল মজুরি চাহিলাম।

নির্মল পূর্ববৎ রাজী হইল।

ঘটনাও পূর্ববৎ—মহাত্মা গান্ধী কাল এই স্টেশন দিয়া 'পাস্' করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া স্টেশনে হাজির থাকিবে। সবই এক, সামান্য একটু তফাত আছে। এবারে ত্রিবর্ণ পতাকা নয়, কৃষ্ণবর্ণ পতাকা।

ছেলে মেয়ে

মেয়েদের হাসপাতাল।

আন্নাকালী ও নমিতা একই ঘরে আছেন, পাশাপাশি খাটে। আন্নাকালীর বয়স চল্লিশ, নমিতা সপ্তদশী। দুই জনেই আসন্ন-প্রসবা, এখন-তখন হইয়া আছেন।

আন্নাকালীর গালের হাড় উঁচু, কপাল শিরাবহুল, চক্ষু পীতাভ, হাসি দন্তসর্বস্ব, পেট প্রকাণ্ড, হাত-পা সরু সরু, মাথার সম্মুখ দিকটায় টাক। সাতটি সন্তানের জননী, গর্ভে অষ্টম সন্তান। আগের বার প্রসব করিবার সময় যমে-মানুষে টানাটানি হইয়াছিল, তাই এবার ডাক্তারের পরামর্শ-অনুযায়ী আন্নাকালী হাসপাতালে আসিয়াছে। স্বামী কেরানী।

নমিতা সুন্দরী। এইবার প্রথম সন্তান হইবে। সহসা দেখিলে গর্ভবতী বলিয়া মনেই হয় না। সমস্ত অবয়ব পরিপুষ্ট, আসন্ন মাতৃত্বের পূর্বাভাসে সে যেন আরও শ্রীমতী হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী ডাক্তার। বিজ্ঞানসম্মত প্রসব-পদ্ধতি হাসপাতালে ঠিকমত অনুসৃত হইবে বলিয়া স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছেন।

দুই

বয়সের, রূপের এবং অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। প্রথম প্রথম অবশ্য রাখিয়া-ঢাকিয়া শোভন সংযত কেতাদুরস্তভাবে আলাপ শুরু হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের উজ্জ্বল দিকটা সুকৌশলে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। ক্রমশ নিজের নিজের স্বামীর প্রসঙ্গ লইয়াও আলোচনা শুরু হইল এবং রাখা-ঢাকা ভাবটা ক্রমশ যেন তিরোহিত হইতে লাগিল। আলাপটা যখন ভাল করিয়া জমিল তখন দেখা গেল, উভয়েই পুরুষ-বিদ্বেষী। পুরুষ জাতির নানাবিধ দোষ কীর্তন করিতে উভয়েই পঞ্চমুখ। এমন কি উচ্ছ্বাসের মুখে উদাহরণস্বরূপ নিজের নিজের স্বামীর দোষও উভয়ে আজকাল অকাতরে উদ্ধৃত করিতেছেন। দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবলীলাক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। আন্নাকালীর প্রাত্যহিক কোমর-কনকনানিটাও যেন কিছু কম পড়িয়াছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হইতেছিল।

আন্নাকালী। ব্যাটাছেলেদের কথা আর ব'লো না ভাই, অমন স্বার্থপর জাত দুনিয়ায় আর আছে নাকি!

নমিতা। (মৃদু হাসিয়া) নিজেদের পান থেকে চুন খসলেই তুল্‌কালাম।

আন্নাকালী। সে কথা আর বলতে! আমাদের বাড়ির কর্তাটি আপিস থেকে এসেই ছুটবেন পাশার আড্ডায়, ফিরবেন কোনদিন এগারোটায়, কোনদিন বারোটায়। কিন্তু এসে ভাত যদি না গরম পান, বাড়ি মাথায় তুলবেন। আচ্ছা, অত রাত্তির পর্যন্ত ভাত গরম রাখা কি সহজ কথা ভাই, আঁচ আর কতক্ষণ থাকে বল! এদিকে আবার কয়লা যদি কোন মাসে বেশী খরচ হয়েছে তো সেও আবার ফাটাফাটি ব্যাপার!

নমিতা। আমাদের উনিও তাই।

আন্নাকালী। পাশাখেলা বাই আছে নাকি?

নমিতা। না, উনি খেলেন বিলিয়ার্ডস্‌। বিলিয়ার্ডস্‌ খেলে আড্ডা দিয়ে সিনেমা দেখে রোজ বাড়ি ফিরবেন রাতদুপুরে। কিন্তু এক ডাকে কপাট না খুলে দিলেই রাগ। আমরা যেন চাকরানী, রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ার-গোড়ায় ব'সে থাকব! একদিন রাত্তিরে এসে দেখেন, আমি নেই—পাড়ায় একজনদের বাড়ি কীর্তন হচ্ছিল, আমি শুনতে গেছলাম। বাবুর সে কি রাগ!

আন্নাকালী! ওই রাগটুকুই ভগবান দিয়েছেন শরীরে, আর কোন গুণ নেই। আমাদের পাশের বাড়ির বৈকণ্ঠবাবু কি কাণ্ডই যে করেন রোজ মদ খেয়ে এসে! প্রহার তো বউ দুটোর অঙ্গের ভূষণ হয়েছে।

নমিতা। (সাগ্রহে) কি রকম?

আন্নাকালী। রোজ ঠ্যাঙায় ধ'রে। মুষকো চেহারা, ইয়া গোঁফ, লাল চোখ, কালো রঙ—যেন একটা দৈত্যি! অগাধ পয়সা আছে শুনেছি, রোজ সন্ধ্যেবেলা মদ খাবে, মদ খেয়ে বউ দুটোকে ডেকে এনে ঘরে পুরে কপাটে খিল দেবে। খিলও আবার এত উঁচুতে যে বউরা কেউ নাগাল পায় না। সেই খিলটি এঁটে বন্ধ করে শুরু করবে মার। মারতে মারতে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাবে ততক্ষণ ছাড়বে না।

নমিতা। বউ দুটো?

আন্নাকালী। দুটোই তো। সেদিন আবার একটা বিয়ে করেছে লুকিয়ে। ওদের

কি লজ্জা আছে! চিরকালই ওই রকম, আগেরকার দিনে দুশো পাঁচশো বিয়ে করত, এখন আর খ্যামতায় কুলোয় না বলে করে না।

নমিতা। (মুচকি হাসিয়া) মনে মনে কিন্তু লোভ আছে প্রচুর। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই একজন ভদ্রলোক থাকেন, প্রবীণ লোক, কিন্তু তাঁর জ্বালায় ওদিকের জানালা খোলবার জো নেই।

আন্নাকালী। (নাসা কুঞ্চিত করিয়া) ঝাঁ্যাটা মার, ঝাঁ্যাটা মার। দেখে দেখে আর শুনে শুনে ঘেন্না ধ'রে গেছে জাতটার ওপর।

নমিতা। নেশা তো একটা-না-একটা করাই চাই।

অন্নাকালী। ওঁর সে বালাই ছিল না এতদিন, কিন্তু বুড়ো বয়সে আবার আপিঙ ধরেছেন মরতে।

নমিতা। উনি দিনরাত সিগারেট চালাচ্ছেন।

আন্নাকালী। স্বার্থপর, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর সব।

নমিতা। খবরের কাগজে তো পুরুষদের কীর্তি রোজ একটা-না-একটা আছেই। হয় গুণ্ডায় মেয়ে ধ'রে নিয়ে গেছে, না হয় কোন মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে, না হয় স্বামী বউকে খুন করেছে। রোজ একটা-না-একটা কিছু থাকবেই।

আন্নাকালী। খবরের কাগজের কথা বলতে পারি না, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখছি রোজ। অমন নেমকহারাম জাত আর আছে নাকি! এই ধর না, যে ছেলেকে পেটে ধরে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমরা, সেই ছেলেই বিয়ে করে একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায় না। সেই বউও আবার কিছুদিন পরে পানসে হয়ে যায়, তখন আবার অন্য দিকে নজর—স্বার্থপর পাজি সব।

নমিতা। তা ছাড়া, নিজেরা রোজগার করেন ব'লে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, কথায় কথায় দশবার করে শোনানো হয় সে কথা আমাদের। কিন্তু আমরা যে এদিকে একধারে রাঁধুনী, চাকরানী, সেবাদাসী,—আমাদের দামও নেই, কদরও নেই। একটি পয়সা চাইতে হ'লে ওঁদের কাছে হাত পাততে হয়, দেন তো সাড়ে বাইশ, কিন্তু লম্বা লম্বা লেকচার কত—বাজে খরচ করতে নেই, বিলাসিতা করা মহাপাপ! নিজেরা যেন সব সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী!

আন্নাকালী। নিজেরা? নিজেরা এক-একটি কাছিম। জলেও থাকেন স্থলেও থাকেন যখন যেখানে সুবিধে, একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলে মুখটি গুটিয়ে নেন,

সর্বাঙ্গে কঠিন আচ্ছাদন, মারো বকো ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের স্থবিধে মতন আস্তে আস্তে মুখটি বার করেন, আর যদি একবার ধরেন, তো রক্ষে নেই। জেদী ভীতু একগুঁয়ে—অবিকল কাছিম সব।

নমিতা। (হাসিয়া) আমি ভেবেছিলাম—বলবেন বুঝি ঘুঘু, উপমাটা বেশ বের করেছেন তো!

তিন

সেই দিনই গভীর রাত্রে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। পুরুষদের অপেক্ষা করিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে আন্নাকালীর স্বামী ভজহরি বিশ্বাস আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া বসিয়া আছেন। বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ, সম্মুখে উপবিষ্ট স্থদর্শন যুবক, প্রাচীরবিলম্বিত টকটকায়মান ঘড়ি, কোন কিছুরই সম্বন্ধে তিনি সচেতন নহেন। তন্ময় বিভোর ভাবে অর্ধ-নিমীলিত নয়নে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মাত্র কর্তব্যের অনুরোধে আসিয়াছেন।

স্থদর্শন যুবকটি ডাক্তার বি. কে. দত্ত—নমিতার স্বামী। দীর্ঘ সরু একটি পাইপে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন এবং অত্যন্ত মনোযোগসহকারে 'ট্রু লাভ স্টোরি' নামক ইংরেজী পত্রিকা হইতে সচিত্র একটি প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিতেছেন। তাঁহারও বাহ্জ্ঞান তিরোহিত।

পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইটি টেবিলের উপর আন্নাকালী ও নমিতা শায়িতা। উভয়েই প্রসব-বেদনাতুরা। উভয়ের নিকটেই ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শী ডাক্তার ও নার্স দণ্ডায়মান।

আন্নাকালী বলিতেছিলেন—"ওগো ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান গো ডাক্তারবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—"

নার্স বলিল—"আর একটু পরেই সব যন্ত্রণার অবসান হবে মা, ছেলের মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবে।"

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিলেন।

"আর পারছি না, উঃ, আর পারছি না আমি। ওঁকে ডেকে দিন, উঃ, গেলুম। ডাক্তারবাবু, উঃ উঃ উঃ, ওঁকে ডেকে দিন, শীগ্‌গির ওঁকে ডাকুন—"

নমিতার নার্স বলিল—"ভয় কি, এখনি হয়ে যাবে, ছি, অমন করে না।"

ডাক্তারবাবু সাবান দিয়া হাত ধুইতে লাগিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে ভজহরি বিশ্বাস ও ডাক্তার দত্ত খবর পাইলেন, প্রসব নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। দত্তের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি লম্বা পাইপে আর একটি সিগারেট গুঁজিয়া ধরাইয়া ফেলিলেন। ভজহরি স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল।

উভয়েই রাস্তায় নামিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে।

নার্স আসিয়া আন্নাকালীকে বলিল—"এই দেখ মা, কেমন সুন্দর মেয়ে হয়েছে তোমার!"

আন্নাকালীর পাণ্ডুর মুখ আরও যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

সদ্যোজাত শিশুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহসা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"মেয়ে! আমার মেয়ে হয়েছে!"

"মেয়েই তো, কেমন সুন্দর গোলগাল, ফুটফুটে, একমাথা চুল।"

"নমিতার কি হয়েছে?"

"ছেলে।"

নার্স মেয়েটিকে আন্নাকালীর বিছানার পাশে শোয়াইতে যাইতেছিল, হঠাৎ আন্নাকালী উঠিয়া দুই হাত দিয়া শিশু কন্যাটিকে ঠেলিয়া দিলেন।

"ও আমার মেয়ে নয়, নিয়ে যাও, বদলাবদলি ক'রে দিয়েছ তোমরা।"

বিস্মিত নার্স বলিল—"সে কি কথা, বদলাবদলি করব কেন?"

নিশ্চয়ই বদলাবদলি করেছ, আমার মেয়ে হতে পারে না—জ্যোতিষী বলেছে, এবার আমার ছেলে হবে"—

আন্নাকালীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

"এ তোমারই মেয়ে—"

"না না, আমার মেয়ে নয়, আমার সাত-সাতটা মেয়ে, আর মেয়ে আমি চাই না, আমার মেয়ে হয়নি, আমার ছেলে হয়েছে। নমিতা ডাক্তারের বউ ব'লে আমার ছেলেটি তাকে দিয়েছ তোমরা।"

"ছি ছি, তাই কি কখনও হতে পারে! এ তোমারই মেয়ে, নাও কোলে কর।"

"না, মেয়ে আমি চাই না—চাই না—চাই না,—আমার ছেলে এনে দাও, আমার ছেলে এনে দাও—নিশ্চয় আমার ছেলে হয়েছে।"

হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আন্নাকালী চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আর্ত অসহায় চীৎকার।

পাশের খাটে নমিতা সভয়ে তাহার শিশু পুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

ঘোষাল মহাশয়

শ্বশুরবাড়িতে নূতন বধূ আজ প্রথম মাংস রান্না করিবে।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, তবু শাশুড়ী হইতে শুরু করিয়া বাড়ির চাকরানী পর্যন্ত সকলেই মনে মনে অল্প-বিস্তর উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ শুধু নূতন নয়। সবিতা এ বাড়ির প্রথম বধূ। তা ছাড়া কলেজে-পড়া মেয়ে। কলেজে-পড়া বউ এ গ্রামে এই প্রথম। সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল, হয়তো হাই-হিল জুতা পরিয়া বউ পালকি হইতে অবতরণ করিয়া শাশুড়ীর সহিত শেকহ্যাণ্ড করিবে। ঘোষাল মহাশয় তো আগাগোড়াই এ বিবাহের বিরোধী ছিলেন, কেবল পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে রাজী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সবিতাকে দেখিয়া সকলের দুর্ভাবনা ঘুচিয়াছে। বেশ শান্তশিষ্ট মেয়েটি, লজ্জা-শরম আছে, বাড়ির সঙ্গে বেশ মিশিয়া গিয়াছে। আর পাঁচজনের মতই ধরন-ধারণ, কোনরূপ বদ চাল নাই।

ঘোষাল মহাশয় সব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে যেন গদগদ হইয়া উঠিয়াছেন।

ছোট দেবর বীরেনই সবিতাকে মাংস রাঁধিতে প্ররোচিত করিয়াছে। তাহাদের ক্লাবে 'ফীস্‌ট্' হইবে, সে ধরিয়া বসিয়াছে বউদিদিকেই মাংসটা রাঁধিয়া দিতে হইবে।

সবিতা রাজী হইয়াছে।

ছোট ননদ পুষি বলিল—"ছোটদার ফিস্‌টিতে আমিই এতকাল মাংস রান্না ক'রে দিয়েছি, দেখা যাক বউদি এবার কেমন করে! খুব ঝাল দাও বউদি, তা না হ'লে—" বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি তাহার একটি রোগ-বিশেষ। কথায় কথায় যখন-তখন যেখানে-সেখানে কারণে-অকারণে সে হাসিয়া ফেলে।

বীরেন পুষি পিঠোপিঠি, সুতরাং অহি-নকুল সম্পর্ক।

বীরেন বলিল—"তুই কি আর মাংস রাঁধিস, কতকগুলো মসলার শ্রাদ্ধ করিস খালি।"

"বেশ, বেশ!"

পুষি নাক ফুলাইয়া রাগ করিতে গিয়া পুনরায় হাসিয়া ফেলিল এবং বউদিদির দিকে একবার তাকাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বীরেন বলিল—"বউদি, মান রাখতে হবে কিন্তু।"

সবিতা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"চেষ্টা করব। একটু ভিনিগার যোগাড় করতে পারবেন?"

"নিশ্চয়।"

ভিনিগারের চেষ্টায় বীরেন বাহির হইয়া পড়িল।

হুঁকা-হস্তে ঘোষাল মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সবিতা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; শাশুড়ী বার্তাটি কর্তার কর্ণগোচর করিলেন।

"নতুন বউ আজ মাংস রাঁধছে—"

সবিস্ময়ে কর্তা বলিলেন—"কেন, নতুন বউ কেন?"

"এমনি।"

"আসতে না আসতেই ওঁকে রান্নাঘরে ঢোকাবার দরকার কি!"

"আমি কি ঢুকিয়েছি নাকি, বীরেনদের ক্লাবে খাওয়া-দাওয়া হবে, তারই মাংস রান্না হচ্ছে।"

"যত সব—"

খড়ম চটপট করিতে করিতে ঘোষাল মহাশয় চলিয়া গেলেন।

দুই

"ও বউমা, কোথা তুমি? দেখ দেখ মাংসটা বোধ হয় ধ'রে গেল, গন্ধ ছাড়ছে—" শাশুড়ী ডাক দিলেন।

সবিতা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

মাংস চড়াইয়া সে নিজের ঘরে গিয়াছিল এবং সেখানে বীরেনের নিকট ফুটবল ম্যাচের একটা কৌতুকজনক গল্প শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

তলার দিকটা সত্যই ধরিয়া গিয়াছে। যা আঁচ!

পুষিটা দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

শাশুড়ী বলিলেন—"এক কাজ কর, নেড়ো না, নেড়ো না, ওপর-ওপর আর একটা হাঁড়িতে ঢেলে ফেল, তলাটা ঘাঁটিয়ে কাজ নাই। তারপর নাবাবার আগে খানিকটা রসুন বেটে দিয়ে দিলেই আর কিছু ধরা যাবে না।"

তাহাই করা হইল।

"পুষি, একটু চেখে দেখ্ তো কেমন হয়েছে!"

পুষি চাখিয়া বলিল—"চমৎকার হয়েছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

তাহার পর বউদিদির দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ঘোষাল মহাশয় অন্দরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন। পুষিকে মাংস চাখিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন রেঁধেছে বউমা?"

"চমৎকার!"

শাশুড়ী বলিলেন—"আমি না দেখলেই হয়েছিল আর কি! পুড়ে খাক হয়ে যেত।"

"কি রকম?"

মাংস ধরিয়া যাওয়ার কাহিনী বিবৃত করিয়া শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন—"হাজার হোক ছেলেমানুষ তো, এখন কি আর অত হুঁশ আছে! করতে করতেই হবে সব।"

ঘোষাল উনুনের নিকট উবু হইয়া বসিয়া কলিকায় আগুন তুলিতেছিলেন। কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে পুষির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এখন আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো?"

"একটুও না।"

"দেখিস, তুই যেন আবার পাড়ায় পাড়ায় ঢাক পিটিয়ে বেড়াস না যে, কলেজে-পড়া বউদি মাংস রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল। তোর পেটে তো কথা থাকা মুশকিল।"

"আমি কেন বলতে যাব?"

"খবরদার, একটি কথা কারো কাছে বলবে না। আর কেউ শুনেছে নাকি?"

"বিন্দি ঝি-টা শুনেছে।"

"কোথা সে, মানা ক'রে দাও তাকে, কাউকে যেন না বলে এ কথা।"

"সে বাড়ি চ'লে গেছে।"

"তাকে আবার কেন শোনানো! যত সব—"

খড়ম চটপট করিয়া ঘোষাল মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তিন

বীরেনের বন্ধুগণ মাংস খাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

মাংস যে ধরিয়া গিয়াছিল তাহা তাহারা একটুও ধরিতে পারে নাই।

পরদিন কিন্তু জানা গেল, খবর গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। এত রাষ্ট্র হইয়াছে যে, রাঙী নাপতিনীটা পর্যন্ত তাহা শুনিয়াছে। আলতা পরাইতে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে সে পুষিকে প্রশ্ন করিয়াছে—"হ্যাগা পুষিদিদি, তোমাদের নেকাপড়া-জানা বউ নাকি কাল মাংস রানতে গিয়ে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে সব একাক্কার করেছিল?"

পুষি জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কোত্থেকে শুনলি? বিন্দি মুখপুড়ি রটিয়েছে বুঝি?"

"না, বিন্দি তো কিছু বলে নি আমাকে। আমি শুনে এনু মুকুজ্যে-গিন্নীর কাছে।"

"মুকুজ্যে-গিন্নী! তিনি কি ক'রে জানলেন?"

"তা তো আমি জানি নি বাপু।"

বীরেন বলিল—"আমি খোঁজ নিচ্ছি দাঁড়াও। যত সব মিথ্যুক কোথাকার!"

বীরেন খোঁজ করিয়া যাহা জানিল, তাহা এই—মুকুজ্যে-গিন্নী শুনিয়াছেন চাটুজ্যে-গিন্নীর নিকট, চাটুজ্যে-গিন্নীর বার্তাবহ চাটুজ্যে মশাই, চাটুজ্যে মশাই শুনিয়াছেন দত্তের মুখে, দত্তকে বলিয়াছিলেন বাঁড়ুজ্যে, বাড়ুজ্যের কানে কানে সঙ্গোপনে এবং চুপি চুপি খবরটি দিয়াছেন স্বয়ং ঘোষাল মহাশয়।

পুষি হাসিয়া বলিল—"বউদি মাংস রাঁধছেন শুনে বাবা রাগ করছিলেন। তাই বোধ হয় ব'লে দিয়েছেন সক্কলকে।"

বীরেন বলিল—"বাঃ, বাবাই তো আমাকে কাল আড়ালে ডেকে বললেন যে, তোদের ক্লাবের ফিসট্ হচ্ছে, মাংসটা বউমাকে দিয়ে রাঁধা!"

পুষি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

আইন

কাপড়-চোপড় বদলাইয়া ঠিক পরের স্টেশনে জীবন নামিয়া পড়িল। চিন্তা করিয়া দেখিল, একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়। খোঁজ-খবর করিয়া নিকটবর্তী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুর সহিত সে সুযোগমত গোপনে সাক্ষাৎ করিল। ডাক্তারবাবু অনেকদিন হইতে চাকুরি করিতেছেন, এ-জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন তাঁহাকে বহুবার হইতে হইয়াছে। চুলে পাক ধরিয়াছে। সুতরাং এক কথায় রাজী হইলেন না। জীবনও তাহা আশা করে নাই। একাধিক কথা বলিতেও সে প্রস্তুত।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আজ থেকে চান, দিতে পারি। কিন্তু ব্যাক্-ডেটের সার্টিফিকেট দেওয়া শক্ত। আপনাকে আমি চিনি না, শুনি না—এর আগে কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন, কিছুই জানা নেই। দিয়ে দিলেই হ'ল সার্টিফিকেট!"

জীবন কিন্তু না-ছোড়। ব্যাক-ডেটেরই মিথ্যা একখানা সার্টিফিকেট চাই। তাহাতে লেখা থাকিবে যে, গত পরশু হইতে জীবনচন্দ্র কুণ্ডু ডাক্তার টি. সি. পালের চিকিৎসাধীনে আছেন।

ইহার জন্য যত ফী লাগে সে দিবে।

"বড় রিস্‌কি ব্যাপার মশাই!"

"বড় বিপদে পড়েছি, দিতেই হবে দয়া ক'রে—"

দশ, বিশ, পঞ্চাশ, এক শত, দুই শত, পাঁচ শত—শেষে হাজার টাকা পর্যন্ত জীবন উঠিল। পূর্বপুরুষের কৃপায় টাকার তাহার অভাব নাই।

ডাক্তারবাবুর গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।

জীবন বুঝিল, পাল মহাশয় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছেন।

"আপনার কোন অসুখ-বিসুখ আছে?"

"বছর দুই আগে একবার অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্ হয়েছিল।"

"অপারেশন করিয়েছিলেন?"

"না।"

"বেশ, তা হ'লে আসুন, আপনার অ্যাপেন্‌ডিক্‌স্‌টাই কেটে বার করে দি।"

"তাতে লাভ!"

"লাভ আছে বইকি! অ্যাপেন্‌ডিসাইটিসটা তো সেরে যাবে।"

"তার দরকার নেই, সার্টিফিকেট দরকার আগে।"

"বুঝছেন না, সব দিক বাঁচিয়ে তো করতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হ'লে খাতায় একটা রেকর্ড থাকবে—খাতাটা অবশ্য বদলাতে হবে—আপনার পেটের ওপর একটা দাগও থাকবে।"

জীবন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

ডাক্তারবাবু বুঝাইয়া দিলেন।

"হাসপাতালের অ্যাডমিসন-রেজিস্টারখানা বদলে আপনাকে পরশুর তারিখেই ভর্তি ক'রে নিতে চাই। অর্থাৎ আমার অ্যাসিস্টেণ্ট ডাক্তারকে আর কম্পাউণ্ডার-টিকেও কিছু খাওয়াতে হবে। আমার একার দ্বারা হবে না। এসব বড় রিস্‌কি ব্যাপার, বুঝছেন না? আইন যে কড়া!"

পুনরায় গুম্ফাগ্রকে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।

জীবন বলিল—"সবসুদ্ধ কত লাগবে তা হ'লে বলুন!"

"হাজার দুই।"

জীবন চিন্তা করিয়া দেখিল, প্রাণের অপেক্ষা দুই হাজার টাকা বেশী নয়। অপারেশনটাও হইয়া যাইবে। তা ছাড়া ডাক্তারবাবু যে ভাবে কাজটা করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কাজটা পাকা হইবে।

জীবন রাজী হইয়া গেল।

দুই

ডাক্তারবাবু সার্জনও ভাল। নিখুঁতভাবে অপারেশনটি করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, জীবন যে কয়দিন হাসপাতালে রহিল, তিনি এমন মনোযোগ-সহকারে তাহার তত্ত্বাবধান করিলেন যে, জীবন মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন প্রাণ দিয়া লোকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়েরও বোধ হয় শুশ্রূষা করে না। সহকারী ডাক্তার এবং বুড়া

কম্পাউণ্ডারটিও অতিশয় সজ্জন। জীবনের সামান্যতম অসুবিধা দূর করিবার জন্য যেন সতত উন্মুখ হইয়া আছে। বড়লোকের ছেলে জীবন জীবনে এমন কত দুই হাজার টাকা উড়াইয়াছে, কিন্তু এমন ভদ্রতা কখনও দেখে নাই।

ডাক্তারবাবু জীবনকে যেদিন হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ করিলেন, সেদিন সকালে সে ডাক্তারবাবুর বাসায় গেল। ডাক্তারবাবু তাহাকে খাতির করিয়া বসাইলেন এবং জোর-কলমে বেশ জোরালো একটা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

হাসিয়া বলিলেন—"এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনে বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে।"

জীবন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

"এইবার কিন্তু আসল কথাটি বলতে হবে। এত টাকা খরচ ক'রে যে মিথ্যা সার্টিফিকেট নিলেন—কেন, কি করেছিলেন আপনি?"

প্রশ্নটার জন্য জীবন প্রস্তুত ছিল না।

"বলুন না, এখন আর বলতে বাধা কি!"

একটু ইতস্তত করিয়া জীবন বলিল—"বিশ্বাস করতে পারি তো আপনাকে?

"নিশ্চয়ই।"

"খুন করেছিলাম।"

"বলেন কি? কাকে?"

নামটা জীবনের জানা ছিল, কিন্তু বলিল না। ক্ষণিকের জন্য রক্তাক্ত লোকটার মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। বাঁ হাতে উলকি দিয়া লেখা ছিল 'রমেশ'। জীবন নামটা বলিল না।

"হঠাৎ খুন করতে গেলেন কেন?"

জীবন হাসিয়া উত্তর দিল—"মেয়েমানুষ। লোকটা আমার 'রাইভাল' ছিল।"

"কোথায় খুন করলেন?"

"ট্রেনে।"

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং লম্বা খামে একখানা চিঠি দিয়া গেল। জীবন উঠিয়া পড়িল।

"আমি এবার উঠি তা হ'লে, মেনি থ্যাঙ্কস।"

সার্টিফিকেটখানা পকেটে পুরিয়া জীবন চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পুলিস খবর দিতেছে যে, প্রায় একমাস পূর্বে তাহারা একটি মৃতদেহ একটি ট্রেনের কামরায় পায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যাইতেছে যে, লোকটির মৃত্যুর কারণ ছুরিকাঘাত। আত্মহত্যা নয়, কেহ খুন করিয়া গিয়াছে। তাহার বাঁ হাতে উলকি দিয়া নাম লেখা ছিল—'রমেশ'। ইহা ছাড়া সনাক্ত করিবার মত আর কোন চিহ্ন তাহারা পায় নাই। এখন অনুসন্ধান করিয়া পুলিস জানিতে পারিয়াছে যে, উক্ত রমেশ কলিকাতায় মেসে থাকিয়া দালালি করিত এবং সে নাকি ডক্টর টি. সি. পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই সংবাদটি সত্য কিনা তাহা যেন ডক্টর পাল পুলিসকে অবিলম্বে জানান এবং যদি সত্য হয় তাহা হইলে রমেশ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য পুলিসের গোচর করিয়া যেন আইনত প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার সহায়তা করেন।

সামান্য ঘটনা

নরেন কমলাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

ভাল করিয়া একবার দেখিল—হ্যাঁ, কমলাই তো! সেই কমলা, যাহাকে ঘিরিয়া কত স্বপ্নই না একদা রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল! জীবনের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম নারী, প্রথম প্রেম। জীবনের প্রথম স্বপ্ন সফল হয় না, প্রথম নারী ধরা দেয় না, প্রথম প্রেম পূর্ণ হয় না। কমলাকে সে পায় নাই। দুঃখ শুধু ইহাই নয়, নিদারুণ দুঃখ—কমলা বিধবা। বিবাহের ঠিক তিন মাস পরেই বিধবা হইয়াছে।

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিধবাবেশে নরেন কমলাকে এই প্রথম দেখিল। রুক্ষ চুল, পরনে সাদা থান। সেই কমলা যাহার এক পিঠ কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল, শৌখিন শাড়ির শখ ছিল। নরেন একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল!

…কুষ্ঠির মিল হয় নাই বলিয়া বিবাহ হয় নাই। কুষ্ঠির মিল হইলে সুমিত্রা তাহার পত্নী হইত না, কমলাকেই সে বিবাহ করিত। কমলার বাবা গোঁড়া হিন্দু, কুষ্ঠির নিখুঁত মিল করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

…কিন্তু ইহাও তো মিথ্যা নয় যে, সুমিত্রাকে পাইয়া সে কমলাকে ভুলিয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কয়বার সে কমলার কথা ভাবিয়াছে? অথচ—। কমলা কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে? বোধ হয় পায় নাই।

ওতো ওদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। ডাকিয়া কথা কহিবে? কিন্তু—

দুই

ওদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেও কমলা নরেনকে দেখিয়াছিল।

শুধু দেখিয়াছিল নয়, একবার-দেখা মুখখানিকে মনে মনে বার বার দেখিতেছিল। নরেন যে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে তাহাও সে অনুভব করিতেছিল। কিন্তু না, সে আর ওদিকে চাহিতে পারিবে না, কিছুতেই না—তা ছাড়া সঙ্গে শ্বশুর রহিয়াছেন। সে কাপড়-চোপড় সামলাইয়া মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া সম্বৃত হইয়া বসিল।

কিন্তু মনকে তো ঢাকা যায় না। মানসপটে নরেনদার মুখখানাই যে বার বার ফুটিয়া উঠিতেছে। নরেনদা একটু রোগা হইয়া গিয়াছেন যেন, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। কতদিন পরে নরেনদাকে সে আবার দেখিতে পাইল! পাঁচ বৎসর। নরেনদার বউটি কেমন হইয়াছে, কে জানে!

সেই নরেনদা, যে তাহার অঙ্কের খাতায় কবিতা লিখিয়া দিয়াছিল, যে তাহাকে—। কমলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কিন্তু না, সে এ কি করিতেছে! হাজার হোক, নরেনদা পরপুরুষ।

কমলা চোখ বুজিয়া তাহার মৃত স্বামীর মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করিল।

মানসপটে কিন্তু মুখখানা ফুটিয়া উঠিল না—ফুটিয়া উঠিল সাদা কাপড়-ঢাকা শবদেহের ছবিটা। তাহার উপর ফুটিয়া উঠিল নরেনদার সেই অনেকদিন-আগে-দেখা দুষ্টামিভরা মুখখানা। সেই অনেকদিন-আগে-শোনা কথাগুলিও আবার যেন সে শুনিতে পাইল—কমলি, আমাকে বিয়ে করবি? তোকে আমার বড্ড ভাল লাগে।'

কমলা জোর করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুতেই সে আর ওদিকে চাহিবে না।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—

কমলা আর পারিল না, কে যেন জোর করিয়া তাহার ঘাড়টা ফিরাইয়া দিল। কিন্তু সে নরেনকে দেখিতে পাইল না—একটা কুলি মাথায় করিয়া প্রকাণ্ড একটা ট্রাঙ্ক লইয়া যাইতেছে—তাহার পর আর একটা কুলি—নরেনদা আড়ালে পড়িয়া গেল।

গার্ডের বাঁশী বাজিল।

ট্রেন চলিতে শুরু করিল।

নরেনের ট্রেনটাও ছাড়িয়া দিল।

সুমিত্রা প্রশ্ন করিল—"কি দেখছ তুমি অমন ঝুঁকে?"

নরেন বলিল—"কিছু না।" নরেন ভিতরে আসিয়া বসিল।

দুইখানি বিপরীতগামী ট্রেন দুই দিকে চলিয়া গেল।

নিপুণিকা

লীলাময়ী তন্বী রূপসী।

খঞ্জননয়নের চটুল চাহনি, পীবরবক্ষের সংযত অসংযম, লাস্য-চপল-ললিত গমন-ভঙ্গিমা, মিষ্ট কণ্ঠের রজত-নিক্কণনিভ হাস্যধ্বনি, ছদ্ম-কোপ-কমনীয় ভ্রূভঙ্গী পাষাণকেও উতলা করিয়া তোলে।

কঠিন-হৃদয় সেনাপতি বিচলিত হইলেন। হাসপাতালের এই নার্সটি নিকটে আসিলেই তাঁহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া যায়। যুদ্ধে সামান্যরূপে আহত হইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন। যুদ্ধের ক্ষত সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন রকম আঘাতে তিনি জর্জরিত। সঞ্চরমাণ এই শিখাটি তাঁহার অন্তরলোকে যে বহ্নিকাণ্ড শুরু করিয়াছে তাহার উত্তাপে তিনি উন্মাদপ্রায়।

নানা ছুতায় বারম্বার কাছে আসে, মনে হয় বুঝি ধরা দিল-দিল, আবার সরিয়া যায়। স্ফুরিত অধরের বাণীহীন আকৃতি দুর্বোধ্য!

আর তো সময়ও নাই, কালই হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আগামী পরশ্ব শিবিরে হাজির হইবার কথা।

সেনাপতি বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিলেন। গভীর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া কাছে-দূরে আলো জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আহত সৈনিকের করুণ আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। অন্তরের অন্তস্তলে তীব্র তীক্ষ্ণ বাসনা সমস্ত হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছে।

নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল।

খাবার লইয়া আসিয়াছে।

সেনাপতি নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"কালই আমাকে চ'লে যেতে হবে।"

তাঁহার মনে হইল, নার্সের চটুল নয়ন দুইটিতে যেন বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। একটি দীর্ঘশ্বাসকে হাসিতে রূপান্তরিত করিয়া নার্স বলিল—"জানি।"

"কি জান? সত্যি কথাটা জান কি?"

নার্স চকিতে একবার চাহিয়া আনতনয়নে কফিতে দুধ মিশাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সেনাপতি বলিলেন—"আমার জন্যে মন-কেমন করবে?"

"সে কথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।"

ছোট টেবিলটিতে কফি প্রভৃতি সাজাইয়া সেটি সেনাপতির কাছে আগাইয়া দিয়া ত্বরিতপদে নার্স বাহির হইয়া গেল।

"শোন।"

পুনঃপ্রবেশ করিল।

সেনাপতি কথাটা শেষে বলিয়াই ফেলিলেন।

"আমার সঙ্গে তুমি যাবে?"

"কোথায়?"

"আমার ক্যাম্পে।"

"কেন?"

নার্সের নয়ন দুইটি চঞ্চল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিতে লাগিল।

সেনাপতি বলিলেন—"কেন, তা কি তুমি জান না? চল, অন্তত এক রাত্রির জন্যে চল।"

"চাকরি ছেড়ে যাব কি ক'রে?"

"ছুটি নাও।"

"সেনাপতির শিবিরে নার্স যাবে কোন্ অজুহাতে?"

"পুরুষের ছদ্মবেশে এস, কেউ বুঝতে পারবে না।"

নার্স কিছুক্ষণ নীরব রহিল; কিন্তু মনে হইল সে যেন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসকে প্রাণপণে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বলিল—"ছুটি কি পাব?"

"যাতে পাও তার ব্যবস্থা করব।"

দুই

দুই দিন পরে।

সেনাপতির শিবির। চতুর্দিকে গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে। দ্বারপথে চাহিয়া অধীর আগ্রহে সেনাপতি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল।

পুরুষের বেশ।

সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

নার্স হাসিয়া আসন গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, অত্যন্ত তীব্র-মদির নীরবতা। উভয়ে উভয়ের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া আসিল। সহসা সেনাপতি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

"চল, ও-ঘরে চল।"

নার্স উঠিল না, মধুর হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"চল, ও-ঘরে যাই।"

নার্স তথাপি ঠিল া।

"উঠছ না যে, কি চাই তোমার?"

"আমি যা চাই তা দেবেন?"

"নিশ্চয় দেব।"

নার্সের আকম্পমান অধর দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেনাপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কি চাই?"

"কিছুই না। আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করে, আপনি এত বড় বড় যুদ্ধ জয় করেন কি কৌশলে?"

"কৌশল তো এক রকম নয় যে, এক কথায় বলব!"

"কিছুদিন পরে শুনছি আবার আপনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করবেন। তার কৌশলটা কি?"

"অর্থাৎ যুদ্ধের প্ল্যানটা তুমি জানতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

নার্স নিষ্পলক নয়নে সেনাপতির মুখের পানে চাহিল।

সেনাপতি বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিলেন। এই মায়াবিনী তাহা হইলে স্পাই!

"যুদ্ধের প্ল্যান জেনে তুমি কি করবে?"

অবিচলিত কণ্ঠে নার্স বলিল—"কিছুই না, কৌতূহলমাত্র।"

"যুদ্ধের প্ল্যান কখনও কাউকে বলি না, বলতে মানা।"

"পরপুরুষের শয়নকক্ষেও আমি কখনও প্রবেশ করি না, শাস্ত্রে মানা।"

তাহার কালো চক্ষু দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিল।

সেনাপতির মুখভাব ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিল। নির্নিমেষ নয়নে আরো কিছুক্ষণ তিনি তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"যুদ্ধের প্ল্যান না বললে তুমি যাবে না?"

কোটটি খুলিয়া দেওয়ালের একটি পেগে টাঙাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া নার্স বলিল—"না।"

নার্সের নাতি-আবৃত দেহের দিকে সেনাপতি প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

যৌবন ফাটিয়া পড়িতেছে, অধরে মৃদু হাসি, চক্ষু আবেশময়।

"যদি জোর করি?"

"আমি চীৎকার করব। মাননীয় সেনাপতির পক্ষে সেটা সম্মানজনক হবে না।"

সেনাপতির মুখভাব কঠিনতর হইল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আরও কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"বেশ, দেখ।"

ড্রয়ার খুলিয়া একটি ম্যাপ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

নার্স মনোযোগসহকারে ম্যাপটি সাগ্রহে দেখিতে লাগিল।

"এইবার চল।"

"আপনি যান, আমি আসছি এক্ষুনি, আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে। বাথরুমটা কোথায়?"

বাথরুম দেখাইয়া দিয়া সেনাপতি পাশের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নার্স টেবিল হইতে কাগজ লইয়া কি যেন লিখিতে লাগিল।

লেখা শেষ করিয়া বাথরুমে গেল এবং বাথরুম হইতে বাহির হইয়া সেনাপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

তিন

আধ ঘণ্টা পরে।

সেনাপতি শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বিস্রস্তবাসা নার্সও বাহির হইল।

সেনাপতির মুখ পাষাণের মত নির্মম হইয়া উঠিয়াছে।

নার্স মৃদু হাসিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না—চকিতের মধ্যে সেনাপতির পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল, নার্সের মস্তক বিচূর্ণিত হইয়া গেল।

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সেনাপতি বলিলেন—"ঘৃণ্য স্পাই কোথাকার!"

নার্সের রক্তাক্ত মৃতদেহটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল! তাহার পানে চাহিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সহসা নজরে পড়িল টেবিলের উপর একটা চিঠি রহিয়াছে।

প্রিয় সেনাপতি মহাশয়,

আমি ধরা পড়িয়াছি, হয়তো আমাকে এজন্য মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। আপনার হাতে মরিতে আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুকে কে অতিক্রম করিতে পারে? আপনার হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিলাম, ইহা আমার সৌভাগ্য।

একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ করিয়া যাইতেছি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে এ অনুরোধ হয়তো আমি করিতাম না, কিন্তু আপনাকে সত্যই আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই ভালবাসাজনিত স্পর্ধায় এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি করিতে সাহস করিতেছি। আমার মৃতদেহটা আমার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি সেনাপতি, ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন। ইহাই আমার অন্তিম অনুরোধ।

ইতি

আপনার ক্ষণ-সঙ্গিনী

চার

নার্সের মৃতদেহ স্বদেশে উপনীত হইল।

তাহার পূর্বে একটি সংবাদও উপনীত হইয়াছিল।

জীবিত নার্সই সংবাদটি পাঠাইয়াছিল—"আমার শব হয়তো গোপন সংবাদটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিও।"

বাথরুমে যে কাগজটি নার্স গলাধঃকরণ করিয়াছিল, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া সে কাগজটি পাওয়া গেল।

তাহাতে যুদ্ধের প্ল্যান লেখা ছিল।

ঘরে-বাইরে

সবেগে অন্দর হইতে বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া চৌকির উপর বসিয়া স্বগতোক্তি করিলাম—"টাকার গাছ আছে ঘরে যেন! একেবারে উজবুক বানিয়ে ছেড়েছে আমাকে—"

জানু আন্দোলিত করিতে লাগিলাম এবং আমার যেটি মুদ্রাদোষ—নাক দিয়া 'ঘোঁৎ' করিয়া একটি শব্দ বাহির করা—তাহাই করিয়া একটি সিগারেট ধরাইলাম। চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল।

দ্বারপ্রান্তে একটি সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে নমস্কার করিলেন। মুখে প্রসন্ন হাসি, ললাটে চন্দনের টিপ, পরিধানে কেটের ধুতি ও ফতুয়া, পায়ে তালতলার চটি।

"কি চান?"

"আমি হরিবাবুকে চাই।"

"আমার নামই হরি।"

ভদ্রলোক পুনরায় নমস্কার করিলেন এবং ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। দেখিলাম, যতীনের চিঠি। লিখিতেছে—"এই ভদ্রলোক একজন জ্যোতিষী। আমাকে ধরিয়াছেন দুই-একজনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য। তোমার নিকট পাঠাইতেছি। জ্যোতিষ-সংক্রান্ত কোন প্রয়োজন থাকিলে ইঁহাকে বলিতে পার।" মনে পড়িল, কাল বৈকালে যতীনের সহিত দেখাও হইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল—"এক নাছোড়বান্দা জ্যোতিষীর পাল্লায় পড়েছিলাম ভাই। সিম্প্লি তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তোমার নামে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। কিছু মনে ক'রো না যেন—"

বলিলাম—"আমার কোন দরকার নেই।"

ভদ্রলোক টেবিলের নিকট যে চেয়ারখানি ছিল সেটিতে উপবেশন করিলেন এবং আর একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার দরকার না থাকতে পারে, আমার দরকার আছে।"

"তার মানে ?"

"যে বিদ্যেটা শিখেছি সেটা চর্চা করা তো দরকার। এক পয়সা দিতে হবে না আপনাকে। দেখি আপনার হাতটা—"

হাতে কাজ ছিল না, পয়সাও লাগিবে না। সুতরাং জ্যোতিষ-চর্চা করিতে সম্মত হইলাম। টুলটা টানিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম।

ভদ্রলোক হস্তটি পর্যবেক্ষণ করিতে শুরু করিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত হইতে কুঞ্চিততর হইতে লাগিল। মিনিট দুয়েক নীরবতার পর ওষ্ঠ নয়, নাসার সাহায্যে ভদ্রলোক একটি ছোট্ট শব্দ করিলেন—হুঁ।

আমিও করিলাম—ঘোঁৎ।

ছোঁড়া চাকরটা আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"মা ডাকছেন।"

আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। একদণ্ড স্বস্তিতে থাকিতে দিবে না!

"যা, যাচ্ছি একটু পরে।"

জ্যোতিষী মহাশয় আমার দক্ষিণ করতলটি টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন।

চাকর আবার ফিরিয়া আসিল।

"মা এক্ষুনি আসতে বললেন—"

আগন্তুকের সম্মুখেও রসনা অসংযত হইয়া পড়িল।

"আঃ, জ্বালিয়ে খেলে দেখছি!"

জ্যোতিষী মহাশয় আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া শান্তকণ্ঠে প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—"যান, শুনে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।"

চলিয়া গেলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, স্মিতমুখে জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া আছেন। বাস্তবিকই ভদ্রলোকের মুখচ্ছবিতে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করিলাম। আমি আসিয়া পুনরায় হস্তপ্রসারণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—"যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। আপনি কি বিষয়ে প্রশ্ন করিতে চান করুন।"

"বর্তমান বিষয়ে।"

"অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি নির্বিকার! বেশ, বর্তমানের কথাই বলছি—আজকের বিষয়ই বলছি।"

ভাবিলাম, মালতীর বিষয়ই কিছু বলে বুঝি! উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম।

তিনি বলিলেন—"আজ আপনার একটা অর্থনাশ যোগ রয়েছে—"

"তাই নাকি! আর কিছু?"

"আরও শুনতে চান? বন্ধুদের শত্রু হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে—"

"তাই নাকি! ঘোঁৎ।"

"তাই তো মনে হয়।"

জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন।

বলিলেন—"কাল আবার আসব। যদি আজকের ঘটনা মিলে যায়—কাল আপনার অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

সবিনয় নমস্কারান্তে তিনি বিদায় লইলেন।

গুম হইয়া বসিয়া জ্যোতিষীর নয়, মালতীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আচ্ছা শাইলক তো! কাল রাত্রে না হয় আবেগের মাথায় প্রতিজ্ঞাই করিয়া ফেলিয়াছি যে, একখানা ভাল ঢাকাই শাড়ি আজ কিনিয়া দিব; কিন্তু তাই বলিয়া আজই কিনিয়া দিতে হইবে! রাঙা রাঙা ঠোঁট দুইটি ফুলাইয়া মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া আছে! ঘোঁৎ।

চাকর পুনরায় দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিল।

"মায়ের ভয়ানক মাথা ধরেছে—শরীর জ্বর-জ্বর করছে। কিছু খাবেন না। আপনাকে খেয়ে নিতে বললেন—"

বুঝিলাম, মোক্ষম অস্ত্র ধরিয়াছে। ভিতরে গেলাম এবং কিছুক্ষণ পরে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, জার্মানির ঔষধ অথবা নানুরের পদাবলী তো ছেলেমানুষ, মালতীর বাবাও যদি আসিয়া সাধ্যসাধনা করেন, এ মাথা-ধরা ছাড়িবে না। শাড়িই কিনিয়া দিতে হইবে। ইহাও বুঝিলাম, বিলম্ব করিয়াও লাভ নাই, ড্রয়ার টানিয়া কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া গেল—মণিব্যাগ নাই! জ্যোতিষী এই ড্রয়ারটার কাছেই বসিয়া ছিল যে! মালতীকে কিছু বলিলাম না—বলা বৃথা। আজ রবিবার—ব্যাঙ্ক বন্ধ—তবু বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া অনুভব করিলাম যে, জ্যোতিষীর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটাও মিলিয়াছে। যতীন, বীরেন, সুশীল, বিশু, হাবুল, নন্দ, পরেশ, কালো—সকলের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছি। দশটা টাকা কেহ ধার দিতে পারিল না। শেষটা দোকান হইতে ধারে কাপড় কিনিতে হইল।

ইহারা বন্ধু! ঘোঁৎ।

কবচ

আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে।

কিসে বিগলিত হইতেছে, কেন বিগলিত হইতেছে, কে বিগলিত করিতেছে, তাহা আমি বলিব না। বলিতে পারিব না। বলিতে গেলে আমার হৃদয় আরও বিগলিত হইয়া যাইবে, তখন আর আমি নিজেকে সামলাইতে পারিব না, সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া সব কথা বলিয়া ফেলিব। আমার অচেতন মনের অন্তরালে যে সকল নিগূঢ় বাণী নিগূঢ়ভাবে চাপা আছে তাহাদের নিরুদ্ধ উত্তাপ হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে কি পারে না সে প্রশ্ন অবান্তর, কারণ—

বাতাসা—৶৹
পোস্ত—আধ পোয়া
পাঁচফোড়ন—এক আনার
জৈত্রি—দুই পয়সার

দুই

আকাশ দেখিয়াছেন?

যে আকাশ দেখা যায়, যে আকাশ নীল, সে আকাশ নয়। যে আকাশ দেখা যায় না, যাহার বর্ণ অবর্ণনীয়, যাহা কোনে স্থানবিশেষের বিস্তৃতি নয়, সেই আকাশ। দেখিয়াছেন? আমার বিশ্বাস আপনি দেখেন নাই। আমি একদিন দেখিয়াছি, এক মুহূর্তের জন্য অকস্মাৎ দেখিয়াছি। চোখ খুলিয়া নয়, চোখ বুজিয়া দেখিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি আপনি প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আপনার প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে সে আকাশ কেমন, কোথায়···না, না পারিব না, বলিতে পারিব না।

এলাচ—এক কাঁচ্চা
ঝোলা গুড়—দুই সের
কুলি বেগুন—আধ সের
সৈন্ধব লবণ—আধ সের

টম্যাটো—দুই সের
জিরা-মরিচ—আধ পোয়া
তেঁতুল—এক সের

তিন

কাঁদিয়াছেন কখনও ?—

ভেউ-ভেউ করিয়া নয়, হু-হু করিয়া নয়, ফোঁস-ফোঁস করিয়া নয়, গুমরিয়া গুমরিয়া। সে ক্রন্দনে অশ্রু নাই, স্বার্থ নাই, এমন কি বেদনা-বোধও নাই। তাহা কোনো বাহ্যিক আঘাতের ফল নয়, তাহা স্বতঃ-উৎসারিত। সমুদ্রের গভীরতার অন্তস্তলে সে ক্রন্দন স্তব্ধ হইয়া আছে, তাহা হাসিরই নামান্তর, তাহা অনাদি রহস্যের অনন্ত আক্ষেপের মতো…ও কি,…কিসের ডানা হাওয়ায় উড়িতেছে…প্রজাপতির… কিন্তু…না,

আলু—দুই সের
চাল—আধ মণ
মসুর ডাল—আড়াই সের
দারুচিনি—এক পয়সার
পেঁয়াজ—আধ সের
যব—আধ সের
তিসি—এক সের

চার

আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে।
ও ঘুড়ি নয়, মানুষের মন।
চিনাবাদাম—দুই পয়সার
সরিষার তৈল—আধ পোয়া
স্টোভের পোকার—একটা
ছাঁকনি—একটা

পাঁচ

মন আকাশে ওড়ে।

কিন্তু উড্ডীয়মান মনের সূত্র লাটাইয়ের পাকে পাকে জড়ানো। লাটাই ওড়ে না, সে মৃত্তিকার, সে সূত্রধারক, সে ওড়ায়। দার্শনিকতার অবতারণা করিতেছি না, কথাটা মনে হইল তাই বলিলাম। যাহা মনে হয় তাহা বলার নামই দার্শনিকতা নয়। বস্তুত যাহা সহজে মনে হয় না তাহাই মনে পড়াইয়া দেওয়ার নাম দার্শনিকতা। যাহা বহুর মধ্যে এক-আধজন দেখে তাহাই দর্শন, বহুজন যাহাকে দেখে তাহাও এক-প্রকার দর্শন, কিন্তু তাহা মহাত্মা-দর্শন বড় জোর দেব-দর্শন, তত্ত্ব-দর্শন নয়। বিচিত্র! তত্ত্বটা আছে কিন্তু সকলে দেখিতে পায় না, দেখিতে পাইলেও তদনুসারে চলিতে পারে না। সংসারে ঝঞ্ঝাট অনেক, একথা অনেকেই বোঝেন, কিন্তু বুদ্ধ বা চৈতন্যের মতো কয়জন পালাইতে পারিলেন! অনেক দূরে…বনে…পর্বতে…সুদূর দ্বীপে… সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া প্রবালতটে লাগিতেছে—ছলাৎ ছলাৎ, ছলাৎ…কোথায় যেন বাঁশি বাজিতেছে……না, না পারিব না, পারিব না—

ছোলা—এক সের
আদা—আধ পোয়া
নিমের দাঁতন—এক পয়সা
মকটো—এক বাক্স
শালগম—আধ সের
বাঁধাকপি—একটা

ছয়

বলিতেছিলাম,—আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে। কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ভুল। যাহার কাঠিন্য আছে তাহাই বিগলিত হয়। আমি কোনোদিন কঠিন-হৃদয় ছিলাম না। আমি চিরদিনই তরলমতি। যাহা তরল তাহা আবার বিগলিত হইবে কি প্রকারে? হৃদয় পদার্থ উত্তাপ-সংযোগে বাষ্পে পরিণত হয় শুনিয়াছি। তবে কি তাহাই হইল? হৃদয় কি ক্রমশ বাষ্পে পরিণত হইতেছে?…বাষ্পের জোরে বেলুন

উড়ে, এঞ্জিন ছোটে, জাহাজ চলে। বস্তুত সমগ্র সভ্যতার মূলে বাষ্প আছে। আমার হৃদয় সেই বাষ্পে পরিণত হইয়াছে? কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তরল পদার্থে উত্তাপ দিলে বাষ্পই হয়। বাষ্পের স্বপ্ন দেখিব? বাষ্পীভূত হৃদয়ের ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন! বিচিত্র কক্ষ-পথে ঘূর্ণ্যমান লক্ষ কামনার বায়বীয় রূপ!...না, না, পারিব না, পারিব না, পারিব না—

খেসারির ডাল—আধ সের
বরবটি—এক পোয়া
ঝিঙে—আধ সের
পুঁইশাক—এক পয়সার
কুঁচো চিংড়ি—এক পোয়া
মুড়কি—দুই পয়সার

সাত

শিশু হাসে।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই! তাহার হাসিটি সুমিষ্ট তাহাও স্বীকার কারব। একদা তাহার হাসির সহিত 'বাঁশি', 'ভালবাসি', 'সুধারাশি' প্রভৃতি মিলাইয়া আমি কবিতা লিখিয়াছি; লিখিয়া সুখও পাইয়াছি। কিন্তু শিশুর সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য আছে যাহা সকলে জানেন, কিন্তু বলেন না। একটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি। শিশু কাঁদে। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদে, অসুখের যন্ত্রণায় কাঁদে, গ্রীষ্মের প্রকোপে কাঁদে, শীতের আধিক্যে কাঁদে, সকারণে কাঁদে, অকারণে কাঁদে। ভয়ানক কাঁদে, অনেক সময় সে কান্না থামানো যায় না। অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। অনেক শিশু জীবনে হাসিবার সুযোগই পায় না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যায়। পাড়া ঠাণ্ডা হয়।

ঠাণ্ডা! আমরা ঠাণ্ডা প্রকৃতির, উত্তাপ চাই না, উত্তেজনা চাই না, ঠাণ্ডা চাই। ...ঠাণ্ডা ও শিশু...একটি স্মৃতি মনে জাগিতেছে। ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে, ঠাণ্ডা গঙ্গাজলে নামিয়া একটি মৃত শিশুকে একদা বিসর্জন দিয়াছিলাম। ছেলেটা বড় কাঁদুনে ছিল, আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিত। সে কান্না...

ঘুঁটে—চার পয়সার
লাউ—একটা
পটল—এক পোয়া
মাছ-ধোয়া চুবড়ি—একটা
ধূপ—এক বাণ্ডিল
বড়ি—চার পয়সার
তেজপাতা—এক পয়সার
ধনে—এক আনার

আট

অনেকে বলেন কোনো কিছুই হারানো ভালো নয়, এমন কি আত্মহারা হওয়াও অশোভন। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? যদি মানুষ আত্মহারা হইতে না পারিত তাহা হইলে সে কিছুই করিতে পারিত না। আত্ম কথাটার সহিত স্বার্থ কথাটা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হইলেও কথা দুইটি একার্থক নয়। আত্মহারা হওয়া মানে স্বার্থহারা হওয়া—ইহা মানিতে গেলে গোলমালে পড়িতে হইবে। আমরা আত্মহারা হই স্বার্থেরই প্রেরণায়। প্রেমে আত্মহারা হই, অধ্যয়নে আত্মহারা হই, ক্রোধে আত্মহারা হই, বিস্ময়ে আত্মহারা হই, হিংসায় আত্মহারা হই। সকলেরই মূলে একটা-না-একটা স্বার্থ প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন আছে। যাঁহারা আত্মহারা হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াছি তাঁহাদের লক্ষ্য মোক্ষলাভ। যাঁহারা অত্মহারা হইয়া সংসার আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের কি লক্ষ্য, বস্তুত কোনো লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সংসার পাতিয়াছেন কিনা তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই। আমার সন্দেহ হয় অধিকাংশ লোক গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া সংসার ধর্ম করেন, আত্মহারা হইয়া নয়। আমার মতো আত্মহারা হইয়া যদি সংসার করিতে হইত তাহা হইলে একটা লক্ষ্য ঠিক থাকিত এবং অধিকাংশ লোকই শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারিত যে, যাঁহারা বলেন কোনো কিছুই হারানো ভাল নয়, এমন কি আত্মহারা হওয়াও অশোভন, তাঁহাদের কথা একেবার মূল্যহীন নয়। আমিও তাঁহাদের এই উক্তিটিকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি তথাপি কিন্তু বারংবার মনে হয় আত্মহারা না হইলে মনুষ্যত্ব

বলিয়া কোনো কিছু থাকিত কি ? প্রথম যৌবনে আত্মহারা হইয়া যখন নীলিমাকে ভালোবাসিয়াছিলাম তখন……

কেরোসিন তেল—এক টিন
শাড়ি—তুই জোড়া
ব্লাউজের ছিট—তিন গজ
টুথব্রাশ—একটা
কুমড়োর ফালি—একটা
কাঁকরোল—এক পয়সার
চ্যাড়স—এক পোয়া
হলুদ—আড়াই পোয়া
লঙ্কা—এক পোয়া

নয়

অবচেতন মনের স্তরে স্তরে অনেক কামনা সুপ্ত আছে। তাহাদের মাঝে মাঝে নিদ্রাভঙ্গ হয়, আমার চলনে-বলনে হাসিতে কাশিতে তখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, আপনারা সকলে উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখেন। আপনাদের এই উৎসুক চাহনি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু জানিয়া রাখুন আমি ধরা দিব না। অন্তরের অন্তস্তলে যে স্বপ্নগুলি গুটি বাঁধিয়া আছে, যেই তাহারা গুটি কাটিয়া প্রজাপতি আকারে বাহির হইয়া আসিতে চায়, আমি এমনি তারস্বরে সেই নামগুলি আবৃত্তি করিতে থাকি যাহারা আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে—বাতাসা, পোস্ত, পাঁচফোড়ন, জৈত্রি, ঝোলাগুড়, এলাচ, কুলি বেগুন, কুঁচো চিংড়ি, চাল, ডাল, শাড়ি, সাবান। কবচ আবিষ্কার করিয়াছি।

আমার মনের খবর জানিতে পারিবেন না।

পাকা রুই

স্টেশনের পান্থশালায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। পরনে খদ্দরের মোটা কাপড়, গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর, একমুখ দাড়ি, একবুক চুল। খালি পা। কথায় কথায় ভণ্ডামির কথা উঠিল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, ভণ্ডামিতেই তো সেরেছে! পরশুরাম বিরিঞ্চি বাবা এঁকেছেন, ওই হল ভণ্ডামির পারফেক্ট টাইপ। কিন্তু একটা কথা কি জানেন, ভণ্ডামি বেশিদিন টেঁকে না। আসল মানুষটাকে শেষ পর্যন্ত ধরা দিতেই হয়।"

"কি রকম?"

ভদ্রলোক ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"একটা গল্প বলি তাহলে শুনুন—"

"বলুন—"

"নীলমাধব বলে একজন লোক ছিল। অসাধারণ ব্যক্তি। অর্থাৎ বাইরের নীল-মাধবকে দেখে ভেতরের নীলমাধবকে চেনবার উপায় ছিল না। বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন হয়ে দূর-সম্পর্কের পিসের বাড়িতে মানুষ হয়ে-ছিল, বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে আই-এ ফেল, বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে বেকার, বোঝবার উপায় ছিল না যে, ওই পিসের গলগ্রহ থেকেও সে একটা যক্ষ্মা-গ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে করে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে। কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। লোকের কাছে ধার করবার অসাধারণ শক্তি ছিল তার। সবাই তাকে ধার দিত। নিখুঁত লেফাপার জোরে রঙীন রবারের বেলুনের মতো সে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে উড়ে বেড়াত। রবারের বেলুনের সঙ্গে উপমা দিচ্ছি বটে, কিন্তু রবারের বেলুনের সঙ্গে তার প্রকাণ্ড একটা অমিল ছিল। রবারের বেলুন বেশিক্ষণ নিজের ফুটানি বজায় রাখতে পারে না। সামান্য একটু খোঁচা খেলেই চুপসে যায়। বহু খোঁচা খেয়েও নীলমাধব কিন্তু সুডোল ছিল। সর্বদাই অনিন্দনীয় চেহারা, অনিন্দনীয় কথাবার্তা, অনিন্দনীয় পরিচ্ছদ এবং সমস্ত ধারের ওপর! সুতরাং যা অনিবার্য তাই একদিন ঘটল—প্রেম। নীলমাধব ও কিস্‌মিস্‌কুমারী। রঙীন লেফাপা আর একটি রঙীন লেফাপাকে দেখে উতলা হয়ে উঠল। পিসেমহাশয়ের

বাসায় একটি যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রী কাঁদে আর কাশে। রোগা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে তুটো রাস্তায় রাস্তায় ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়! ছেলেটা একদিন মোটর চাপা পড়ে মরেই গেল। নীলমাধব তিন দিন পরে বাড়ি ফিরে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে। বিশেষ বিচলিত হল না। পিসেমশায় অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করতে এসে সরে পড়লেন নির্বাক নীলমাধবের নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো বীর্য তাঁর ছিল না। সবাই জানে আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করে নীলমাধব অহোরাত্রি চাকরি খুঁজছে। কখনও বাড়ি আসে—কখনও আসে না। যেদিন নীলমাধবের স্ত্রী ম'ল, সেদিনও নীলমাধব বাড়ি ছিল না। উঠোনে পিসেমশায় ও পাড়ার কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরের ভেতরে বস্ত্রাচ্ছাদিত শব নীলমাধবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ আলুথালু-বেশে উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি নীলমাধব এসে হাজির। সকলে পথ ছেড়ে দিলেন। নীলমাধবসোজা গিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। মৃতদেহের কাছে ক্রন্দনাকুল মেয়েটি এবং পিসিমা বসে ছিলেন। নীলমাধব তাদের ঘর থেকে বের করে দিলে—ভাবটা শেষ-বিদায় নেবার বেলায় সে একাই থাকতে চায়। মেয়ে এবং পিসি ত্রস্তভাবে বেরিয়ে গেল। নীলমাধব ঘরের কপাট ভেজিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কেটে গেল—নীলমাধব বেরোয় না। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে পিসেমশায় অবশেষে কপাটে ছোট্ট টোকা দিলেন। কপাট খুলে গেল—ঘরে নীলমাধব নেই—বস্ত্রাচ্ছাদিত শব বস্ত্রাচ্ছাদিতই রয়েছে। ঘরের অপর দরজাটি দিয়ে নীলমাধব নীরবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে।

কিস্‌মিস্‌কুমারী বড় আর্টিস্ট ছিলেন না, তাঁর রঙীন লেফাপা ছিঁড়ে গণিকা বেরিয়ে পড়েছিল। নীলমাধবের লেফাপা কিন্তু অত অপলকা নয়—সে যে নিঃস্ব বেকার একথা ঘুণাক্ষরে সে প্রকাশ করলে না। স্ত্রীটি মরে সুবিধেই হল তার। সে নির্বিকার-চিত্তে মৃত স্ত্রীর গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নিয়ে গেল। স্ত্রীর গায়ে তার বাপের দেওয়া যা তু-চারখানা গয়না ছিল, তাই বিক্রি করেই নগদ আটশো টাকা হল। পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা ভাল নেকলেশ কিনে সে কিস্‌মিস্‌কে উপহার দিলে। এমন অভিজাত-সুলভ ঔদাসীন্যভরে দিলে যে, কিস্‌মিস্‌কুমারী আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, নীলমাধব প্রকৃতই তাঁর জীবনসর্বস্ব। অতিশয় দ্রুতবেগে অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বেশিদিন নয়, মাস তিনেকের মধ্যেই কিস্‌মিস্‌-কুমারীকে পুনরায় নতুন ধরনে আত্মহারা হতে হল। ঘুম ভেঙে একদিন রাত্রে তিনি

দেখলেন—শয্যা শূন্য, নীলমাধব নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখলেন দেরাজও শূন্য—গয়নার বাক্স নেই। জীবনসর্বস্ব তাঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে সরেছে। গয়নার বাক্সে দশটি হাজার টাকার গয়না ছিল।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর?"

"তারপর বছর কয়েক পরে নিখুঁত স্যুট ও ডিগ্রী ধারণ করে নীলমাধব পুনরায় যখন কোলকাতায় পদার্পণ করলে—তখন সে আয়ত্তাতীত। বিলেত থেকেই একটা বড় চাকরি নিয়ে সে এসেছে। খোঁজ করে জানল যে, পিসেমশায় তার মেয়েটিকে পাত্রস্থ করে নিজে স্বর্গারোহণ করেছেন। অরক্ষিত কিস্‌মিস্‌টিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে পিপীলিকাভুক্ত হয়েছে।" ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন।

"তারপর।"

"এত কাণ্ড করলে তো? ভেতরের মানুষ কিন্তু চাপা পড়ল না। সমস্ত ভণ্ডামির আবরণ ভেদ করে, সমস্ত ঐশ্বর্যের বন্ধনমুক্ত হয়ে, চাকরির সমস্ত মোহ ত্যাগ করে তাকে বেরিয়ে আসতেই হল দেশের ডাকে—"

"কি রকম? কি চাকরি করতেন তিনি?"

ভদ্রলোক স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নামটা কি?—"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনি আমাকেই নীলমাধব ভেবেছেন নিশ্চয়। আমার নাম ননী দাস—খুব ডিস্যাপয়েন্টেড হলেন—নয়? আমি সামান্য ব্যক্তি—"

ননীবাবুর ট্রেন আসিল—তিনি চলিয়া গেলেন। আমি আমার ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ কানে আসিল দূরে একটি বেঞ্চে বসিয়া একটি যুবক আর একজনকে বলিতেছে—"নীলমাধববাবু বলে একটি অদ্ভুত লোক আজ এসেছিলেন, চলে গেলেন। কংগ্রেস-ওয়ার্কার—" আমি সবিস্ময়ে আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"উনি তো ননী দাস।"

যুবক হাসিয়া বলিল—"ও, আপনাকে উনি ননী দাসের গল্পটা বলেছেন বোধ হয়। আমরাও প্রথমে ওঁকে ভেবেছিলাম ননী দাস। কিন্তু ওঁকে জিগ্যেস করতে উনি বললেন যে, ওঁর নাম নীলমাধব।"

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। পরে জানিয়াছি—উঁহার আসল নাম—যাক নামটা আর করিব না, বিখ্যাত লোককে খেলো করিয়া আমার গৌরব বাড়িবে না।

নাথুনির মা

Fixity of purpose-এর বাংলা কি ?

উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা।

যাই হোক, ইহার সুন্দর একটি উদাহরণ সেদিন দেখিয়াছিলাম। গল্পটি বলিবার পূর্বে "লক্ জ" কাহাকে বলে তাহাও বোঝানো দরকার। "লক্ জ" (Lock Jaw) তাহাকে বলে যাহা হইলে ব্যায়ত আনন আর বন্ধ হয় না, ব্যায়তই থাকে। হাই তুলিতে গিয়া অনেক সময় এই বিপদ ঘটে। মুখ কিছুতেই বোজে না, হাঁ করিয়াই থাকিতে হয় যতক্ষণ না কোনো ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসাইয়া দেন। ইহার ঠিক ডাক্তারি নাম ডিস্‌লোকেশন্ অব্ ম্যাণ্ডিব্‌ল্ (dislocation of mandible),—একবার হইয়া পড়িলে সঙীন পরিস্থিতি।

একটি রোগীকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিতে হইয়াছিল। সকালে চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতেছিল না। গৃহিণীর বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলাম।

'কড়কড়' শব্দে বাজ পড়িল না দুয়ারে কড়া নড়িল!

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একটি আধ-ঘোমটা-দেওয়া কম-বয়সী মেয়ে একটি বুড়ীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিনিতে পারিলাম—নাথুনির স্ত্রী ও মা। ইহাদের বাড়িতে ইতিপূর্বে চিকিৎসা করিয়াছি। নাথুনি স্থানীয় ময়দার কলে চাকরি করে।

কি হল ?

বুড়ী নীরব।

নাথুনির বউ বলিল—মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে—বুজছে না। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

তাই নাকি—দেখি—

দেখিলাম ঠিকই তাই—বুড়ীর 'জ' স্থানচ্যুত হইয়াছে।

নাথুনি কোথায় ?

নাইট ডিউটি থেকে ফেরে নি এখনও।

এ রকম হল কি করে ? হাই তুলতে গিয়ে ?

বধূটি উত্তর দিল (বুড়ীর পক্ষে কথা বলা অসম্ভব)—না, হাই তুলতে গিয়ে নয়।

তবে ?

এমনি—

এমনি কি করে হবে, কিসের জন্য হাঁ করেছিল ?

বধূটি তখন ঈষৎ অবনত মস্তকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সসঙ্কোচে বলিল—মা আমাকে গাল দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ গাল দেবার পর যেই পোড়ারমুখী বলতে গেছেন—অমনি পোড়ার···পর্যন্ত বলেই—

মুখে আঁচল দিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে হাস্য গোপন করিল। বুড়ীর চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ হয়েছে ?

আধ ঘণ্টা হবে—

আচ্ছা বস তোমরা—এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি আমি।

ভাবিলাম মুখরা বুড়ীটা আর একটু শাস্তি ভোগ করুক, আমি ততক্ষণ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া লই।

রোগী দেখিবার ঘরটায় তাহাদের বসাইয়া আমি ভিতরে চলিয়া গেলাম।

ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

আসিয়া বিধিমতো দুই হাতের দুইটা বুড়া আঙুল বুড়ীর মুখ-গহ্বরে পুরিয়া নীচের চোয়ালের হাড়টায় বেশ জোরে চাপ দিয়া টান দিলাম। খুট করিয়া হাড় যথাস্থানে বসিয়া গেল।

মুখ হইতে বুড়ো আঙুল দুটি বাহির করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী বলিল—মুখী!

গদ্য কবিতা

প্রকাণ্ড বাড়ি রাস্তার ধারে। গিজগিজ করছে লোকজন। আলো, বাজনা, কলরব, বিয়েবাড়ি। রাস্তার ধারের ঘরটিতে বসে আছেন নিমন্ত্রিতেরা, নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের। ঘরের বাইরে তাঁদের জুতোর সারি, তা-ও নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের। শানাই বাজছে। "তপসে মাছ—চাই তপসে মাছ—" হেঁকে গেল ফেরিওয়ালা। কেষ্টবাবু মুখবিকৃতি-সহকারে দেশলায়ের কাঠি চালালেন কর্ণকুহরে।

"পড় ময়না, পড়, রাধাকৃষ্ণ"

ফুটপাতের একধারে বসে পাখি পড়াচ্ছে কে একজন।

বিশাল খাঁচাটা তার বেশ পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা, বাইরের গোলমালে ময়নার তপোভঙ্গ হবার সুযোগ নেই কোনো। নিশ্ছিদ্র আবরণ।

উলুধ্বনি উঠল অন্তঃপুর থেকে। শাঁক বাজল।

ঘরের ভিতর মৈত্রমশাই বললেন, "বেজায় গরম পড়েছে হে, উঃ—" মুকুজ্জে-মশাই হাসলেন, কাশলেন বোসমশাই। শুরু থেকেই যেমন করছিল কোণের দিকের অল্পবয়স্ক ছোকরাগুলি, ফুসফুস গুজগুজ করে হাসাহাসি করতে লাগল তেমনিভাবেই।

"ময়না, ময়না—পড় বাবা—"

ঘোলের শরবত নিয়ে প্রবেশ করলেন একজন। টিনের ট্রের উপর সারিবদ্ধ কাঁচের গ্লাসে গোলাপী রঙের পানীয়।

"আমাকে একটুকরো বরফ দিতে পারেন"—অনুরোধ করলেন মৈত্রমশাই। বরফ দেওয়া হল। তিনি হেঁট হয়ে সেটা ঘষতে লাগলেন ঘাড়ের ঘামাচিতে।

"বেলফুল চাই, বেলফুল"—একটা কাঠিতে বেলফুলের মালা ঝুলিয়ে, জানলার কাছে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে গেল একটা লোক। বেরিয়ে এলেন ক্রুদ্ধ কর্তা একটা চাকরকে গাল দিতে দিতে। চটা মেজাজের লোক, গলা ভেঙেছে। এসেই আবার ঢুকে গেলেন।

"পড় ময়না, রাধাকৃষ্ণ, রাধা-আ-কৃষণ"

অক্লান্তভাবে পড়িয়ে চলেছে লোকটি।

"বৃষ্টির নাম নেই, ছি ছি—", মৈত্রমশাই বললেন। "আজকের দিনটা না হয় যেন, কাজকর্মের বাড়ি।" টিপ্পনি কেটে হাসলেন মুকুজ্জেমশাই। মুখের সামনে হাতটা মুঠো করে বোসমশাই কাশলেন। দৃষ্টিপাত করলেন একবার সন্তর্পণে ঘুমন্ত নাতিটির প্রতি। ভারি বায়নাদার ছেলে, ঘুমিয়ে রেহাই দিয়েছে তাঁকে। "চোর, চোর, চোর—", সচকিত হয়ে উঠল সবাই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা লোক। পিছু-পিছু ছুটল জন কয়েক। আশান্বিত হল সবাই! ছোকরার দল বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল সোৎসাহে। একটু পরেই কিন্তু তাদের ফিরতে হল ঘরের ভেতর হতাশ্বাসে। চোর পালিয়েছে। অনুসরণকারীরা ফিরে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

"ময়না, ময়না, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ—"

আবেগভরে পড়াচ্ছে লোকটি।

ভেতর থেকে খাবার ডাক এল। প্রায়-উন্মাদ কর্তা বেরিয়ে এসে করজোড়ে ভগ্ন কণ্ঠে আহ্বান করলেন সকলকে। সদলবলে উঠলেন সবাই, বায়নাদার নাতিটিও উঠল। তেতালার ছাদে জায়গা হয়েছে। শালপাতা, মাটির খুরি, মাটির গেলাস যদিও আহার্য কিন্তু উঁচু দরের। চর্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়। ছ্যাচড়াটি তো নিখুঁত। ভোজনপটুতা দেখালেন অনেকেই। কোমরে-গামছা-বাঁধা ঘর্মাক্ত-কলেবর পরিবেশকের দল সুযোগ পেলেন নিজ নিজ মেরুদণ্ডের শক্তি পরীক্ষা করবার।... বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটল। আরও কিছুক্ষণ কাটল মুখপ্রক্ষালনপর্ব। অবশেষে বাঁ হাতে পান এবং ডান হাতে খড়কে নিয়ে বাইরে এলেন সবাই। এসেই একটা হর্ষ-বিষাদ। মুকুজ্জে, মৈত্র এবং বোসমশায়ের জুতো নেই।

"রাধাকৃষ্ণ, পড় ময়না—"

পক্ষী-শিক্ষক উঠতে যাচ্ছিল এমন সময়ে সবাই গিয়ে প্রশ্ন করলে তাকেই। ঘিরে দাঁড়াল।

"ওহে, এঁদের জুতো কোথা গেল?"

"জুতো! কার জুতো?"

বিস্মিত হল সে।

"এঁদের—"

"সে আমি কি জানি মোশাই—"

"এদিকে কাউকে আসতে দেখেছ?"

"আমি কিছু দেখি নি মোশাই, আমি একমনে আমার পাখি পড়াচ্ছি—"

নিরস্ত হলেন সবাই।

চুমকুড়ি দিয়ে সে আবার শুরু করল—"পড়, পড় বেটা রাধাকৃষ্ণ, রা-ধ-আ-কৃষণ"

মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে সবাই ভাবলে সেই পলাতক চোরটাই বুঝি তাহলে আবার—! মুকুজ্জে রসিকতা করলেন, "ব্যাটার রস-বোধ আছে হে, সেরা তিনটি জোড়া বেছে নিয়েছে! আশ্চর্য ব্যাপার", মৈত্র ঘাড় চুলকে স্থির করলেন, 'এই তুচ্ছ ব্যাপারটা বাড়ির কর্তাকে না বলাটাই সমীচীন হবে বোধ হয়', বোস-মশাই ভাবছিলেন, 'এত রাত্রে রিকৃশা মিলবে কিনা।'

"ময়না, ময়না, পড় বেটা—"

"দাদু, আমি ময়না দেখব—"

নাকিস্বরে আবদার শুরু করলে নাতিটি। নাতির দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে মুখের সামনে হাত মুঠো করে কাশলেন একটু বোসমশাই।

"দাদু, আমি ময়না দেখব—"

"রাধাকৃষ্ণ, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ—"

ওর সম্বন্ধেও আলোচনা হল একটু। কেষ্টবাবু বললেন সেদিন গ্রে স্ট্রীটে একটা বাড়ির সামনে তিনি একেই দেখেছিলেন, ঠিক এমনই ভাবে বসে পাখি পড়াচ্ছিল।

যতীনবাবুও দেখেছিলেন বললেন সুকিয়া স্ট্রীটে।

"দাদু, আমি ময়না দেখব—"

নগ্ন-পদ বিপন্ন বোসমশাই কিংকর্তব্য ভাবছিলেন।

"ও দাদু, ময়না দেখব আমি—"

এমন সময় রাগী কর্তাটি বেরিয়ে এলেন।

"ও দাদু, ময়না দেখব আমি—"

কান্না শুরু করলে।

"কি চাই খোকা তোমার?"

"ময়না দেখব"

"কই ময়না"

"ওই যে"

এগিয়ে গেলেন কর্তা খাঁচার কাছে।

"এতে ময়না আছে?"

"হাঁ কর্তা"—পাখিওলা বলল।

"খোকাকে দেখাও একবার—"

"পাখি আমি কাউকে দেখাই না।"

"একবার দেখাতে ক্ষতি কি?"

"না—"

"এর মানে কি—"

"আমার খুশি—"

"খুশি! তার মানে?"—উদ্দীপ্ত হলেন কর্তা।

"আমি দেখাব না—"

সরে পড়বার উপক্রম করলে লোকটি। রোক চড়ে উঠল কর্তার।

"দেখাতেই হবে তোমাকে।"

জোর করে খুলে ফেললেন খাঁচার আবরণ। দেখা গেল শুধু মৈত্র, মুকুজ্জে এবং বোস মশায়েরই নয়, প্রকাণ্ড খাঁচাটি ভালো ভালো জুতোয় পরিপূর্ণ। ময়না নেই।

কাকের কাণ্ড

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঘরের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া বলিলেন—হু-স্—

কাকটা উড়িয়া গিয়া রান্নাঘরের ছাতে বসিল। জগত্তারিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কয়দিন হইতে কোমরে এমন একটা ব্যথা হইয়াছে! কোমরের অপরাধ নাই, বয়সও তো পঁয়ষট্টি পার হইতে চলিল। ঘরে ঢুকিয়া মুখ বিকৃতি-সহকারে তিনি উপবেশন করিলেন এবং কাঁথা সেলায়ে মন দিলেন। লতিকার ছেলে হইয়াছে তাহাকে পাঠাইতে হইবে।

কা—কা—কা—কা—

অমঙ্গল আশঙ্কায় জগত্তারিণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। হাবু, গবু, দেবু, পুনি চার ছেলেই বিদেশে, কোলের ছেলে টিপু যদিও বাড়িতে আছে কিন্তু তাহারও শরীরটা ভাল নাই, এম-এ পরীক্ষার খাটুনিতে ছেলের শরীরটা রোগা হইয়া গিয়াছে। সে ওপরে তেতালার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ছোট নাতিটুকু পাটনা গিয়াছে ফুটবল ম্যাচ খেলিতে—যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে—কখন যে কি করিয়া বসে ঠিক নাই। ইভা, নিভা—মেয়ে দুজন শ্বশুরবাড়িতে। তাহাদেরও অনেকদিন চিঠিপত্র আসে নাই। ছোট বউ মুকুজ্জেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। নীচে কেহ নাই। নির্জন দ্বিপ্রহর।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে পড়িল কর্তা যে অসুখে মারা যান সেই অসুখটি হইবার পূর্বে ঠিক এমনি ভাবে কাক ডাকিয়াছিল। কি অলুক্ষুণে ডাক।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আবার কষ্ট করিয়া উঠিলেন।

হু—উ—স্

কাক উড়িয়া কদম গাছের ডালটায় বসিল।

কা—কা—কা—কা—

হুস্—হুস্—

কাক উড়িল না, কিন্তু নীরব হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া জগত্তারিণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জগত্তারিণী স্বগতোক্তি করিলেন—নবান্নের দিন যখন পেসাদ খেতে দেওয়া হয় সেদিন পাত্তা থাকে না কারো—এখন এসেছেন জ্বালাতে।

জগত্তারিণী ঘরের মধ্যে গেলেন, মুখবিকৃতি সহকারে পুনরায় বসিলেন এবং চশমাটি ঠিক করিয়া লইয়া সেলায়ে মন দিলেন।

কা—কা—কা—কা

জ্বালিয়ে খেলে তো মুখপোড়া!

কা—কা—কা—কা—

আবার উঠিতে হইল।

হুস্—হুস্—যা—যা—

কাক বলিতে লাগিল—কক্—কক্—কক্—

ভারি ত্যাঁদড় তো মুখপোড়া।

কক্—

দেখবি তবে—

হস্ত উত্তোলন করিয়া জগত্তারিণী একটা কিছু ছুঁড়িয়া মারিবার ভান করিলেন। কাক ভান্ বোঝে। সে এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া বসিল এবং জগত্তারিণীকে রাগাইয়া দিবার জন্যই যেন তাঁহার দিকে গলা বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল—ক্র—ক্র—ক্র!

হুস্—

কাক চুপ করিল এবং মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সামনের ডালটার উপর ঠোঁট শানাইতে লাগিল।

জগত্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, পাজি কোথাকার। ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। পুনরায় অতি কষ্টে বসিয়া প্রসারিত কাঁথাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মিনিট-খানেক বেশ নিবিষ্ট মনেই সেলাই করিতে পারিলেন। কিন্তু আবার—

কাঁক্—কাঁক্—কাঁক্—

অনুনাসিক কণ্ঠে ডাকিতেছে!

জগত্তারিণী ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। ডাকুক। বার বার আর কোমরের ব্যথা লইয়া উঠিতে পারেন না তিনি। ছোট বউ সেই যে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে এখনও পর্যন্ত ফিরিবার নাম নাই। এমন আড্ডাবাজ হইয়াছে আজকালকার মেয়েরা!

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে হইল যেন বলিতেছে—খা-খা-খা—! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

খাটের রেলিঙে ভর দিয়া আবার উঠিতে হইল তাঁহাকে।

জ্বালাতন!

কা—কা—কোয়াক্—

দূর হ—

কা—কা—কা—কা—

দূর দূর—দূর হ—

কা আ—কা আ—কা আ—

তবে রে মুখপোড়া—

জগত্তারিণী কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানে নামিলেন, আরও কষ্ট করিয়া একটি ছোট ঢিল কুড়াইয়া সক্রোধে সেটি কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেলেন। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে উঠোনটা পিছল হইয়াছিল।

একজন সাবডিভিশন্যাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া, একজন মুন্সেফকে অনেকগুলি দরকারি মোকদ্দমার শুনানি মুলতুবি রাখিয়া, একজন হাই স্কুলের হেডমাস্টারকে বহুবিধ কর্তব্য স্থগিত করিয়া এবং একজন ডাক্তারকে অনেকগুলি শক্ত রোগী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। সকলকেই সপরিবারে। নিভা দানাপুর হইতে এবং ইভা কলিকাতা হইতে সংসার ফেলিয়া সপুত্রকন্যা আসিয়া হাজির হইলেন। পৌত্রী লতিকাও তাহার কচি ছেলেটিকে

লইয়া আসিয়া পড়িল। টুকুদের ফুটবল ম্যাচে 'ড্র' হইয়াছিল, টুকুই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ, কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সমস্ত দলটিকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দিয়া সে-ও চলিয়া আসিল।

টিপু চতুর্দিকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিল—Mother seriously ill ; come immediately.

এখন দেখা যাইতেছে তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই, কোমরেই একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র। পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন তাহা দুর্বলতার জন্য। ঠিক আগের দিনই নির্জলা একাদশী ছিল। বহুকাল পরে পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রীদের একত্রিত দেখিয়া জগত্তারিণীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার কোমরের ব্যথা যেন অর্ধেক সারিয়া গেল। তিনি বালিশে ভর দিয়া সকলের বারণ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং স্নেহ-সজল কণ্ঠে বলিলেন—তোদের সবাইকে রেখে এখন ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি আমি।

টিপু বলিল—ভাগ্যে আমি ঠিক সেই সময়ে ওপর থেকে নেবে এসেছিলুম, তা না হ'লে কি কাণ্ডই যে হ'ত!

বড় ছেলে—যিনি এস. ডি. ও—তিনি বলিলেন—তখনই আমি বলেছিলাম উঠোনটাও পাকা হয়ে যাক—কিন্তু তোমরা সবাই আপত্তি করলে—

মেজ ছেলে গবু—যিনি মুন্সেফ—তিনি বলিলেন—আজই হরেন ওভারশিয়ারকে ডাকিয়ে উঠোনটা বাঁধাবার ব্যবস্থা করো—তবে খুব বেশী পালিশ যেন না করে।

সেজ ছেলে দেবু—হেডমাস্টার—বলিলেন—তা ঠিক—

ন ছেলে নিপু—ডাক্তার—তিনি ব্লাড-প্রেশার মাপিবার যন্ত্রটা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—ব্লাড-প্রেশারটা আর একবার মাপা দরকার।

বাহিরের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা কলরব করিতেছিল। সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল লতিকার ছেলের গলা।

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন—ওলো লতি, খুব উঁচুদরের গলা হয়েছে যে তোর ব্যাটার। নিয়ে আয় ওকে আমার কাছে—

সমস্ত ঘটনার মূল সেই কাকটা, পাশের বাড়ির চিলেকোঠার ছাতে বসিয়া নানা ভঙ্গীতে ডাকিতেছিল—ক্ক—কক্—কর্র্—কিন্তু গোলমালে তাহা আর জগত্তারিণীর কানে গেল না।

● প্রথম শতক ●

খেলা

বিড়ালের নাম।

যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন সে নিজের পুচ্ছটিতে থাবা মারিয়া মারিয়া খেলা করিত বলিয়া গৃহিণী তাহার নাম রাখিলেন খেলা। এখন কিন্তু খেলা প্রবীণ। তাহার চপলতা যে কোনকালে ছিল তাহা যাঁহারা তাহাকে শিশুকালে না দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। এখন খেলার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। ঘাড়েগর্দানে মোটাসোটা চেহারা, ক্বচিৎ চোখ খোলে। চোখ বুজিয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে তো আছেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্য তপস্বী যেন।

কিন্তু ভয়ানক চোর।

কে কোথায় কখন দুধের ঢাকাটা খুলিয়া রাখিতেছে, বাজার হইতে আনা মাছটা বারান্দা হইতে সঙ্গে সঙ্গে তোলা হইতেছে কিনা, ছেলেমানুষ বউটি কখন অন্যমনস্ক হইতেছে সমস্ত তাহার নখদর্পণে। অথচ কখন চুরি করে ধরা যায় না। যখনই দেখ, হয় তুলসীতলার পাশে, না হয় গৃহিণীর পূজার ঘরের কোণে চোখ বুজিয়া ধ্যানগম্ভীর মূর্তি বসিয়া আছে। যদি গালাগালি দাও, আস্তে আস্তে উঠিয়া নির্জনস্থানে গিয়া বসিবে। বাড়ির কে কী চরিত্রের লোক তাহা তাহার অবিদিত নাই।

ছোট ছেলেরা যখন খাইতে বসে তখন খেলার আর-এক মূর্তি। তখন চোর নয় ডাকাত। সোজা পাত হইতে মাছটি তুলিয়া লইয়া সামনেই বসিয়া খায়। মারিলেও নড়ে না। কেবল চোখ মুখ কুঁচকাইয়া ঘাড়টি পিছন দিকে ঈষৎ সরাইয়া চোখ বুজিয়া থাকে, দেহ সরায় না। মার বন্ধ হইলে পুনরায় খায়। ছোট ছেলেরা কত জোরেই বা মারিতে পারে। চেঁচামেচি করিলে গৃহিণী আসিয়া পড়েন এবং খেলাকে ছোট্ট একটা চাপড় মারিয়া বলেন—"পোড়ারমুখো মাছটা নিলে বুঝি পাত থেকে, কাঁদিস না, এনে দিচ্ছি আর একখানা—" ক্ষতিগ্রস্ত বালকটিকে আর-এক টুকরা মাছ আনিয়া শান্ত করেন এবং যতক্ষণ না তাহাদের খাওয়া শেষ হয় সম্মুখে বসিয়া থাকেন। খেলা অপহৃত মৎস্যটি নীরবে ভক্ষণ করিয়া একটু দূরে গুটিসুটি হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। আহত আত্মসম্মানের মূর্ত ছবিটি যেন। জানে

গৃহিণী থাকিলে স্থবিধা হইবে না। উঁহাকে চটাইয়াও লাভ নাই, উঁহারই কৃপা আছে বলিয়া তাহার সাতখুন মাপ।

গৃহিণী তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলেন, "খেয়ে খেয়ে মুখপোড়ার গতর হয়েছে দেখ না—" খেলার মুদিত চক্ষু মিটিমিটি করিতে থাকে।

"ধুম্‌সো কোথাকার—"

খেলা উত্তর দেয়, ম্যা অ্যা অ্যা অ্যা ও—

খুব আস্তে আস্তে; এত আস্তে যে শোনা যায় না প্রায়। আন্দাজ করিয়া লইতে হয়।

বাড়িতে প্রচুর ইঁদুর। কিন্তু খেলার সেদিকে ঝোঁক নাই। থাকিবেই বা কেন। বাড়িতে অনায়াসলভ্য এত পুষ্টিকর খাদ্য থাকিতে সে আয়াস করিতে যাইবে কোন্ দুঃখে। মাঝে মাঝে তাহাকে অবশ্য গর্তের কাছে বসিয়া থাকিতে দেখা যায় কিন্তু তাহা ঠিক একাগ্র উন্মুখ ওৎ পাতিয়া বসা নয়। তাহা অনেকটা যেন নধরকান্তি জমিদারবাবুর শখ করিয়া মাছ ধরতে বসার মতো। বাড়ির বড় ছেলে নৃপেন কিছুদিন হইল ডাক্তার হইয়াছে। তাহার ধারণা পরীক্ষা করিলে খেলার ইউরিনে স্থগার পাওয়া যাইবে।

খেলার অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছে বাড়ির বধূটি। নৃপেনের বউ। অল্প বয়স, হুঁশ কম, সব সময়ে দুধে ঢাকা দিতে মনে থাকে না, রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিতে ভুলিয়া যায়, মাছের অম্বলটা সময়মতো শিকায় তুলিয়া রাখা হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ীর বকুনি খাইতে খাইতে বেচারী হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। অথচ খেলাকে কিছু বলিবার উপায় নাই, গৃহিণীর প্রিয় বিড়াল। তাঁহার ধারণা গৃহস্থকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান কাক, বিড়াল সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা গৃহস্থের হিতৈষী। তবু একদিন বধূটি বিরক্ত হইয়া খেলাকে লক্ষ্য করিয়া একটা চেলাকাঠ ছুঁড়িয়াছিল। চেলাকাঠ খেলাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, লাভের মধ্যে কুঁজোটা চুরমার হইয়া গেল।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক হইল একাদশীর দিন। শ্বশুর সেদিন দিবসে লুচি এবং রাত্রে ফলাহার করেন। আম সাজাইয়া শাশুড়ী অপেক্ষা করিতেছেন।

"বউমা ক্ষীরটা দিয়ে যাও।"

ক্ষীর আনিতে গিয়া বউমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বাটিটি কেহ যেন ধুইয়া পুঁছিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে নৃপেনেরও চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইল। "মীটসেফ! মীটসেফ কোথা পাব হঠাৎ?"

"কিনে আন একটা।"

"সে যে প্রায় দশ-বারো টাকার ধাক্কা, বেশীও হতে পারে। তা ছাড়া—"

"তা হোক, তবু কিনে আন তুমি, খেলা আমাকে পাগল করবার যোগাড় করেছে। সকলের বকুনি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেলাম আমি—" বধূর আবদারমাখা কণ্ঠস্বর ও বিপন্ন মুখচ্ছবি নৃপেনকে বিব্রত করিল। প্রথমত হাতে টাকা নাই—এই তো সবে প্র্যাকটিস শুরু করিয়াছে, দ্বিতীয়ত ধারেও যদি সে মীটসেফ কিনিয়া আনে বাবা কি বলিবেন। অর্থাভাবে কত প্রয়োজনীয় কর্তব্য অকৃত রহিয়াছে—হঠাৎ একটা মীটসেফ!

নৃপেন মাথা চুলকাইতে লাগিল।

পরদিন কিন্তু দুইটি কুলিবাহিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড মীটসেফ আসিয়া পড়িল। কুলির হাতে পিতার নামে নৃপেনের একটি চিঠিও। নৃপেন ডিস্‌পেন্সারি হইতে লিখিতেছে—

"একটি মীটসেফ পাঠাইতেছি। ইহা একজন রোগী আমাকে উপহার দিয়াছে—"

খেলা মীটসেফটির দিকে একবার চাহিল, বধূটির দিকে একবার চাহিল, তাহার পর সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া হাই তুলিল এবং ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কয়েকদিন কাটিয়াছে।

পুনরায় একাদশী রজনী সমুপস্থিত। কর্তা ফলাহার করিতে বসিয়াছেন। গৃহিণী আমের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

"বউমা ক্ষীরটা দিয়ে যাও।"

বউমা মীটসেফ খুলিয়া অবাক। মীটসেফের কপাটটা ভাল করিয়া খুলিতেই খেলা গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল—ক্ষীরের বাটি খালি।

মীটসেফের ছিটকিনিটা লাগাইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

কোনটা গল্প

শুনিয়া রামলোচন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ইহাই এই আখ্যানটির শেষ ঘটনা। ইহার পূর্ববর্তী যে সকল ঘটনাপরম্পরা এই শেষ ঘটনাটিকে সম্ভবপর করিয়াছে তাহার ইতিহাস রামলোচনের জীবনব্যাপী ইতিহাস। তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ক্লান্তিজনক তো বটেই, বর্তমান আখ্যায়িকার পক্ষে অবান্তরও। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলিব।

রামলোচন মিত্র আজ যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য যে, এককালে তাঁহার যৌবন ছিল। শুধু ছিল নয়, বেশ প্রবলভাবেই ছিল। যৌবনকালে নানাবিধ শৌখিন কল্পনা তাঁহার মস্তকে পুষ্পিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। সঙ্গীত, চিত্রকলা, কবিতা, ভোজনবিলাস, পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিসটিকেই তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তদনুযায়ী চলিতেন। যাঁহারা রামলোচনাবাবুকে চেনেন তাঁহারা হয়তো আমার কথা শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছেন। মাথায় কোঁকড়ানো বাবরি-চুল-সমন্বিত ছিমছাম যে যুবকটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে বন্ধুগণের সহিত ঠুংরি গান, র‍্যাফেলের চিত্র, কাশ্মীরী পোলাও অথবা মসলিনের সূক্ষ্মতার আলোচনায় মশগুল থাকিতেন, সেই যুবকটিই যে বর্তমানের টাকমাথা, ন-হাতি-কাপড়-পরা শীর্ণকান্তি, জরাজীর্ণ রামলোচনবাবুতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা সত্যই শক্ত। যাঁহারা হাসিতেছেন তাঁহাদিগকে আমি দোষ দিব না। আমি শুধু তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিব যে, বর্তমানের কুদর্শন, কটুভাষী রামলোচন সত্যই একদা সুদর্শন ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। বর্তমানের পেচক-প্রকৃতি ব্যক্তিটি সত্যই এককালে বসন্তকালের কোকিলের সঙ্গে উপমিত হইতে পারিতেন।

দুই

সেকালের যুবক রামলোচন মিত্র প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন যে, তিনি এমন একটি বালিকাকে বিবাহ করিবেন—যে বালিকা তাঁহার শিল্পীমনকে তৃপ্ত করিতে পারে।

সংক্ষেপে, মেয়েটি রাঁধিতে পারিবে, ছবি আঁকিতে পারিবে এবং সুন্দরী হইবে। নাচটা সেকালে প্রচলিত ছিল না। থাকিলে রামলোচন পত্নীর গুণাবলীর মধ্যে নৃত্যকুলতাও নিঃসন্দেহে কামনা করিতেন। একথাও অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, করিলে তাঁহার কামনা নিষ্ফল হইত। কারণ ভাবী পত্নীর মধ্যে তিনি যাহা যাহা কামনা করিতেছিলেন তাহাই জোটানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। একাধারে সঙ্গীতজ্ঞা, চিত্রবিদ্যা-পারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশী ছিল না। থাকিলেও হয়তো রামলোচন তাঁহাদের নাগাল পাইতেছিলেন না, কিংবা তাঁহারা রামলোচনকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। মোট কথা, আকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। কিছুদিন কাটিবার পর নিরুপায় রামলোচন বাধ্য হইয়া আদর্শ খর্ব করিলেন। তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, ভাল রান্না করিতে পারে এরূপ একটি সুশ্রী মেয়ে মিলিলেই তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। ছবি আঁকিতে না হয় না-ই জানিল! পরে শিখাইয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু হায়, দুঃখের বিষয় হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা ব্যক্ত করিতেই হইবে যে, এরূপ কন্যাও সুলভ হইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে ক্ষেমঙ্করীর সন্ধান পাওয়া গেল। শোনা গেল, বালিকাটি হারমোনিয়াম-সহযোগে থিয়েটার-সঙ্গীত গাহিতে পারে এবং রন্ধন ব্যাপারেও নাকি সুনিপুণা। ক্ষেমঙ্করীর আত্মীয়স্বজন, চেনাশুনা সকলেই সমস্বরে ইহা বলিতে লাগিলেন। রামলোচনও একদিন গিয়া বালিকাটির গান শুনিয়া এবং রান্না খাইয়া আসিয়া তাহা সমর্থন করিলেন। মেয়েটি কিন্তু সুশ্রী নহে। রামলোচন পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে বিবাহ করা চলে না। কিন্তু তাহা যখন একেবারেই অসম্ভব তখন ইহাকেই কণ্ঠলগ্ন করত ঝুলিয়া পড়া উচিত। পড়িলেনও।

তিন

বিবাহের পরেই ঠিক কয়েক বৎসর রামলোচন ও তৎপত্নী ক্ষেমঙ্করী কিভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন তাহা আমার সঠিক জানা নাই। অনেকদিন পরে যখন রামলোচনের খবর লইবার সুযোগ পাইলাম তখন দেখিলাম তাঁহাদের জীবন নিষ্ফল হয় নাই। ছয়টি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা রামলোচনের গৃহ অলঙ্কৃত এবং ক্ষেমঙ্করীর

কোমর বাতগ্রস্ত করিয়াছে। রামলোচন একদিন সক্ষোভে বলিলেন যে, তাঁহার যৌবনের বাতিকগুলি বাতাহত! বিবাহের পরই রামলোচন লক্ষ্য করিলেন যে, ক্ষেমঙ্করীর দেহ-গ্রন্থিগুলি কেমন যেন অমজবুত ধরনের। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা পরিশ্রম করিলে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়—শয্যাগত হইয়া পড়েন। ইহার জন্য প্রথম প্রথম তিনি অদৃষ্টকেই দায়ী করিতেন। কিন্তু ক্রমাগত সন্তান প্রসব করিয়া ক্ষেমঙ্করী যখন জখম হইয়া পড়িলেন তখন কারণ আর অদৃষ্ট রহিল না—দৃষ্ট হইয়া পড়িল। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি নিজেকেই ইহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং ক্ষেমঙ্করীর সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী-সন্নিধানে যতক্ষণ তিনি থাকিতেন, চলিত বাংলায় বলিতে গেলে, গোরু-চোরের ন্যায় সশঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। এতাদৃশ বিপর্যয়ের মধ্যে ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গীতকলার সম্যক পরিচয় পাইবার সুযোগ তো রামলোচনের ঘটিলই না—উপরন্তু রামলোচন পাচক-সমস্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। বস্তুত ইহাই এমন তাঁহার জীবনের প্রধানতম সমস্যা। ক্ষেমঙ্করী পঙ্গু হইলেও রন্ধন-শিল্পী। সুতরাং যা-তা ঠাকুর তাঁহার পছন্দ হয় না। রামলোচন অনেক কষ্টে একটি ঠাকুর যোগাড় করিয়া আনেন; দুই-চারিদিনেই তাহার নানা দোষ ক্ষেমঙ্করীর নিকট প্রকট হইয়া পড়ে। রামলোচনকেও সে সকল দোষের অমার্জনীয়তা স্বীকার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে হয় এবং নূতন পাচকের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। যৌবনকালে পত্নী-অনুসন্ধান-কালে যে সত্য তিনি আভাসে অনুভব করিয়াছিলেন, সারাজীবন ধরিয়া পাচক অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহা সম্পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন—এদেশে নিখুঁত কিছু পাওয়া অসম্ভব।

চার

নূতনতম যে পাচকটি সেদিন আসিয়াছিল সেটি মিথিলার অধিবাসী। পরিধানে পীতাম্বর, ললাটে সচন্দন সিন্দুর, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, গৌরবর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাশ নয়ন! রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কিন্তু চক্ষু জুড়াইবার জন্য কেহ পাচক নিযুক্ত করে না। যেজন্য করে সে বিষয়েও এই কমনীয় কান্তি মৈথিলটির তুলনা মেলা ভার। সেদিন ক্ষুধার্ত রামলোচন খাইতে বসিয়া দেখিলেন, ভাতগুলি পিণ্ডের মতো—তরকারিগুলি অখাদ্য। একটি আগুনে পুড়িয়াছে, আর একটি নুনে

পুড়িয়াছে এবং তৃতীয়টি কাঁচা আছে। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় রামলোচন দুই-চারি গ্রাস আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। মৈথিলকে কিছু বলিলেন না। নানারূপ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া রামলোচন ইহাই সার বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মসংযম হারাইলে তিনি অকূল পাথারে পড়িবেন। খুব সংযতভাবেই তিনি উঠিয়া গেলেন এবং ক্ষেমঙ্করীর নিকট গিয়া খুব সংযতকণ্ঠেই বলিলেন—এ বামুনটা তেমন সুবিধার নয়, বুঝলে? কিছুই জানে না রাঁধতে। সঙ্গীতচর্চা করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভব ক্ষেমঙ্করী বিনা ঝঙ্কারে কিছু বলিতেন না। তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "রোজ রোজ বামুন পাবেই বা কোথা? ওকেই কোন রকমে চালিয়ে নাও। আর যাই হোক, নোংরা নয়। এর আগে যেটা এসেছিল সেটা ইল্লতের ধাড়ি। এটা তবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে!" "ও, তাই নাকি? তবে থাক", ত্রস্ত রামলোচন বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘোর দুশ্চিন্তা হইল। এই মৈথিল পাচকের হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পাঁচ

নিদ্রাভঙ্গ হইতেই রামলোচন পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্ণে অতি মধুর একটি সুর ভাসিয়া আসিল। অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে গুনগুন করিয়া কে যেন ভৈরবী আলাপ করিতেছে। সুন্দর তো! রামলোচনবাবুর জরাজীর্ণ বক্ষের মধ্যে যৌবনের সঙ্গীতপিপাসু মনেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল এবং রামলোচনকে শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। রামলোচন উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, নব-নিযুক্ত মৈথিল ঠাকুরটিই ওদিকের দাওয়ায় বসিয়া তন্ময়চিত্তে ভৈরবী আলাপ করিতেছে। রামলোচনবাবু হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ও অবিলম্বে তাহাকে ডাকিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন পাচক সঙ্গীতানুরাগী তো বটেই—যত্ন করিয়া শিক্ষাও করিয়াছে। রামলোচন বলিলেন—বেশ, বেশ—তুমি থাকো আমার কাছে। ভাবিলেন রান্না যতই খারাপ করুক, গান শুনিয়া তৃপ্তি হইবে। তিনি ব্রাহ্মণকে উৎসাহিত করিলেন।

ছয়

পরদিন ক্ষেমঙ্করী স-ঝঙ্কারে বলিলেন—ও ঠাকুরকে আজই বিদেয় কর। ওর দ্বারা চলবে না।

থতমত খাইয়া রামলোচন বলিলেন—কেন?

—রাঁধতে তো জানেই না—রান্নাঘরে বসে বসে পোড়ারমুখো রাগিণী ভাঁজছে। দূর কর ওকে—আজই তাড়াও!

রামলোচন কোনোদিনই ক্ষেমঙ্করীর বিরুদ্ধাচরণ করেন না। আজও করিলেন না।

কেবল তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সাত

গল্প পাঠ শেষ করিয়া গল্পলেখক সস্মিত মুখে স্ত্রীর পানে চাহিলেন। স্ত্রীর চক্ষু দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল—বাবা, বাবা—তবু যদি তোমাকে একটি দিনের জন্যও ঠাকুরের রান্না খেতে হত। মাংসের কোর্মাটা ভাল হয় নি বুঝি আজ!

স্বামী হাসিয়া বলিলেন—মানুষ তাই কল্পনা করে যা তার নেই! উলটো অবস্থাটা ভেবে দেখতে বেশ লাগে! তুমি বেহাগের নতুন যে গতটা শিখেছ বাজাও না—শুনি।

—আজ থাক—রাত হয়ে গেছে। এই বলিয়া হঠাৎ সে বাতিটা নিভাইয়া দিল।

সংক্ষেপে উপন্যাস

সেদিন মাঘের রাত্রি ছিল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে—অসম্ভব শীত। সঞ্জয় অন্যমনস্ক হইয়াই গলিটাতে ঢুকিয়াছিল। প্রায় জনশূন্য গলি—রাত্রি অনেক হইয়াছে। হনহন করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সঞ্জয়ের সহসা চোখে পড়িল একটা খোলার ঘরের সম্মুখে রঙীন কাপড়পরা একটা মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ভীরু উৎসুক দৃষ্টি। সঞ্জয় দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুই

এক বৎসর পরে।

সঞ্জয়ের অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল। ছি—ছি—ছি—নিজেকে সে কোথায় নামাইয়াছে। তাহাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিল! না হয় সে মদ খাইয়া গিয়াছিল। তাহাতে হইয়াছে কি! মদ খাইয়া হল্লা করিবার জন্যই তো ওখানে যাওয়া। মানস-নেত্রে ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। শ্যামকান্তি তন্বী যুবতী—নূপুরে দুলে ওড়নায়, পেশোয়াজে চুমকিতে জরিতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সম্রাজ্ঞীর মতো লীলায়িত ভঙ্গীতে কমনীয় বাহুটি তুলিয়া দ্বারদেশ দেখাইয়া আদেশ করিতেছে—অমন মাতলামি করেন তো বেরিয়ে যান এখান থেকে। স্বর্ণকঙ্কণের ঝনৎকার আবার যেন সে শুনিতে পাইল—লোহিত-রেশম-গুচ্ছ-বিলম্বিত রাজুবন্ধের দোলকটি আবার যেন চোখের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল।

পরদিন অতিশয় সংযত কঠিন মূর্তি লইয়া সঞ্জয় গেল। নির্জন দ্বিপ্রহর। ঘরে আর কেহ ছিল না। সঞ্জয় দেখিল সাম্রাজ্ঞীরও রূপ বদলাইয়াছে। তবু কিন্তু অপরূপ। অতি সাধারণ একখানি নীলাম্বরী, ছোট একটি কাঁচপোকার টিপ, তাম্বুলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুটিতে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি, দীর্ঘ-আঁখিপল্লবে সহৃদয় স্নেহচ্ছায়া। সঞ্জয়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"আসুন, আসুন, ভাবলাম বুঝি রাগ করে আসবেনই না। বসুন।" সঞ্জয় নীরবে আসন পরিগ্রহ করিল। কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। সঞ্জয় বসিতেই

সে হাসিমুখে উঠিয়া গিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া সম্মুখের তেপায়ার উপর রাখিল এবং বলিল—নিন, খান।

সঞ্জয়ের অধর দুইটি নড়িয়া উঠিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সে হাসিয়া অনুযোগভরে বলিল—ছি, ওরকম মাতলামি করতে আছে? মদ খেলে ভদ্দরলোকের মতো খেতে হয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিজেই সে মদ ঢালিতে লাগিল।

বাসন্তী রঙের স্বচ্ছ সফেন সুরা।

নিন—

সঞ্জয়ের রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল।

সে হাত বাড়াইয়া গ্লাসটা লইল এবং পিকদানিতে সেটা উপুড় করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

পিছন ফিরিয়া চাহিল না।

তিন

কয়েকদিন পরে একখানি পত্র।

তাহারই পত্র।

রাগ কোরো না, ফিরে এস।

সঞ্জয় মুখ টিপিয়া একটা তিক্ত হাসি হাসিল। ঠিক করিল যাইবে না। ও-পাপকুণ্ড হইতে সরিয়া থাকাই ভাল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না। গেল।

গিয়া শুনিল এইমাত্র সে বাহির হইয়া গিয়াছে। জনৈক বড়লোকের বাগান-বাড়িতে জলসা আছে।

চার

পরদিন গেল।

সেদিনও দেখা পাইল না।

তাহার পরদিনও সে যাইত, কিন্তু একটা টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ি চলিয়া যাইতে ইল। বাবা মারা গিয়াছেন!

দুই মাসের পূর্বে ফিরিতে পারিল না। ফিরিয়া আসিয়াই কিন্তু আবার গেল। গিয়া শুনিল সে অন্য ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না।

পাঁচ

সহসা একদিন ঠিকানা মিলিল।

প্রকাণ্ড বাড়ি!

প্রকাণ্ড গেট!

সঞ্জয় ঢুকিতে পারিল না।

দারোয়ান বলিল—হুকুম নেহি হ্যায়—

ছয়

দুই বৎসর পরে।

ত্রিশ টাকা বেতনের দীন কেরানী সঞ্জয় আপিস হইতে বাহির হইয়া সহসা একদিন দেখিল—দেওয়ালে দেওয়ালে, কাগজে তাহার ছবি।

সিনেমা হাউসের সম্মুখে অসম্ভব ভিড়।

লোকে লোকারণ্য!

সঞ্জয় অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু টিকিট পাইল না। তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

অতি আধুনিক

বিসর্পিত রেখায় নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নদীর পরপার ঘনবন-সমাচ্ছন্ন, এপারে রুক্ষ পর্বতমালা। একটি গুহামুখ দেখা যাইতেছে। পরপারবর্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টি-দুর্ভেদ্য। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একটি বিরাট পাইথন একটি বিরাট বৃক্ষশাখা হইতে স্থিরভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে শিকারের প্রত্যাশায়। অরণ্যের ওপার হইতে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। তীক্ষ্ণনখচঞ্চু মাছরাঙা একটা জলের উপর ছোঁ মারিয়া মারিয়া উড়িতেছে।

নদীতীরবর্তী প্রান্তরে অরুণ, অশোক, বীরেন, চঞ্চল, নিমাই, নগেন, নটবর, কার্তিক একটি অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে উবু হইয়া বসিয়া আছে। সকলেই উলঙ্গ, সকলেই কর্কশ-রোম, সকলেই শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত, সকলেরই শিরে অযত্নবিন্যস্ত কেশভার, কাহারও কপিশ, কাহারও পিঙ্গল, কাহারও কৃষ্ণবর্ণ। অদূরে ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতেছে। নরেশও অগ্নিকুণ্ডের নিকট নাই, সেও নদীর ধারে ধারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে।

নিপু, কানু, চম্পা, টুকু, বুদি প্রভৃতি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা ইতস্তত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কানুর হস্তে একখণ্ড ভাঙা মৌচাক, তাহা হইতে মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার ভিতরে কীটাকৃতি মৌমাছি-শাবকেরা কিলবিল করিতেছে। কানু নির্বিকারচিত্তে সবসুদ্ধ কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতেছে, চম্পা লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আছে। বুদির হাতে একটা জীবন্ত শামুক, সে সেটাকে একটা পাথরে ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙিতেছে, আহত শামুকটার লালা-পিচ্ছিল সর্বাঙ্গ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রতিবাদ করিতেছে। তাহার কিন্তু নিস্তার নাই। বুদির মুষ্টি কঠোর, দন্ত তীক্ষ্ণ। নিপু একটা পলাতক কীটের গর্ত-সমীপে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। রুগ্ন টুকু নাকিসুরে কাঁদিতেছে।

আরও কিছু দূরে রেবা, নিভা, মায়া, বেলা, শেফালী, মালবিকা, ক্ষমা, স্নেহলতা, মাধবী প্রভৃতি নানা বয়সের নারীগণ নানা কার্যে ব্যাপৃত। মালবিকা রেবার নিকট মাথা পাতিয়া আছে, রেবা উকুন বাছিতেছে। ক্ষমা কণ্ঠলগ্না শাবকটিকে

স্তন্যপান করাইতেছে। মায়া আহারে ব্যস্ত, তাহার হাতে কন্দজাতীয় কি যেন একটা আহার্য। নিভা কিছু করিতেছে না, সে অদূরে অবস্থিত পুরুষ-মণ্ডলীর দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার ভ্রূ, অধরোষ্ঠ, স্তনযুগল মাঝে মাঝে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। বেলা, শেফালী, স্নেহলতা, মাধবী কতকগুলি কাঁচা চামড়া হইতে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মাংস কুরিয়া কুরিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ইহারাও সকলে উলঙ্গ। ইহাদের নিকটও একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে।

আর একটু দূরে বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আর-একটি ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ডকে ঘষিয়া ঘষিয়া তীক্ষ্ণতর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বৈদ্যনাথও উলঙ্গ।

নিকটে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দিকে দুর্গন্ধ।

চারিদিকে চামড়া।

অনতিদূরে একটা মৃত ভল্লুক পচিতেছে।

একটি অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ইন্দুরও পুড়িতেছে।

দুই

বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ প্রস্তর ঘষিতেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। চাহনি লালসাময়। মায়া বৈদ্যনাথেরই কন্যা বটে, কিন্তু নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা। তাহার অনাবৃত শরীরে যৌবন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ভ্রাতা নটবরও মাঝে মাঝে ভগ্নী মায়াকে দেখিতেছে। তাহারও দৃষ্টিতে ক্ষুধা।

রুগ্ন টুকু একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথের মুখমণ্ডল সহসা কঠিন হইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে আবার পাথর ঘষিতে লাগিল।

অরুণ সহসা মুখ তুলিয়া নিভার দিকে চাহিল।

নিভা হাসিল। শ্বা-দন্তগুলি চকমক করিয়া উঠিল।

নটবরের চোখে নিষ্করুণ দৃষ্টি।

নদীতীরে সঞ্চয়মাণ অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক পুত্র নরেশ চর্মোপরি অবনমিতা জননী শেফালীর নগ্ন দেহটার পানে চাহিয়া ঈষৎ বিচলিত হইল। শেফালী প্রৌঢ়া। বৃদ্ধা

স্নেহলতার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সে আপন মনে কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহার চামড়াটা প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিল। পলিতকেশিনী স্নেহলতা।

চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বৃহৎ শকুনি মৃত ভল্লুকটার নিকটে উপবেশন করিয়াই উড়িয়া গেল। নগেন তাহাকে তাড়াইয়া ভালুকটাকে টানিয়া নিকটে আনিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ, অশোক, কার্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল। ওপারে ঘন বনান্তরাল হইতে দ্বি-খড়্গসমন্বিত রোমশ একটা গণ্ডার ভীষণদর্শন মুণ্ডটা বাহির করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।

সকলেই চীৎকার করিতে করিতে এক-এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া ধাবমান হইল।

তিন

খানিকক্ষণ পরে।

গণ্ডার অন্তর্হিত হইয়াছে। উত্তেজনা-অবসানে সকলেই পুনরায় স্ব স্ব স্থানে বসিয়াছে। বৈদ্যনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘর্ষিত প্রস্তরের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতেছে। না, এখনও ঠিক মনোমতো হয় নাই। আবার সে ঘষিতে শুরু করিল। একটা ভোঁতা স্থান কিছুতেই তীক্ষ্ণ হইতেছে না। মুখ ঘষিতে ঘষিতে সে তুলিয়া আর একবার মায়ার দিকে চাহিল। কন্দচর্বণনিরতা মায়াও চাহিল। নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা মায়া, মুখে মৃদু হাসি।

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্বাসের গতিবেগ বাড়িয়া গিয়াছে। না, আর নয়। অনেকদিন সহ্য করিয়াছে সে। ওই বৃদ্ধটার আধিপত্য আর সহ্য করা যায় না। তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা কষ্ট ক্ষোভ তর্জন করিয়া উঠিল। তর্জন-শব্দে মায়া ফিরিয়া চাহিল, দন্তবিকাশ করিয়া অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করিল। তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া নটবর তাহাকে ধরিল। দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিল। মায়া ফোঁস করিয়া উঠিল—ছদ্ম কোপে। অর্ধভুক্ত কন্দটা মাটিতে পড়িয়া গেল। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয় মায়া কন্দটা আবার তুলিয়া লইল। তাহার ভ্রূভঙ্গি, তাহার আহ্বানময় প্রত্যাখ্যান অপরূপ! নটবর পাগল হইয়া উঠিল। নটবর—সহসা কঠিন প্রস্তরাঘাতে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘূর্ণিত-লোচন,

হিংস্র-দংষ্ট্রা। নটবর ছুটিয়া গিয়া বৈদ্যনাথকে আক্রমণ করিল। পিতা-পুত্রে ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বৈদ্যনাথ যুবক নটবরকে বিধ্বস্ত করিতে পারিল না। নটবরের দেহে অসুরের শক্তি। সে বৈদ্যনাথকে ভূশায়ী করিয়া মায়াকে তাড়া করিল। মায়া ছুটিল, নটবরও ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে উভয়ে পর্বত-গুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কেহ বিশেষ বিচলিত হইল না।

প্রৌঢ়া জননী শেফালীর নগ্নমূর্তি যুবক পুত্র নরেশকে বিচলিত করিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকতর উত্তেজনাজনক আর একটা ঘটনা ঘটিল। স্বচ্ছ নদীজলে একটা মৎস্য দেখিতে পাইয়া নরেশ জলে নামিয়া পড়িল, ডুব সাঁতার কাটিয়া মাছটাকে ধরিতে হইবে। প্রকাণ্ড মাছ।

ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কতকগুলি কচ্ছপের ডিম আবিষ্কার করিয়াছিল, সেগুলি আহরণ করিয়া অগ্নিকুণ্ড-সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল এবং মনোনিবেশ সহকারে সেগুলি আহার করিতে লাগিল। অশোক কয়েকটি কাড়িয়া লইল। একটু কলহ হইল। ধীরেন অগ্নিকুণ্ডে দহমান মূষিকগুলিকে আর একবার উলটাইয়া দিল।

অরুণ ও নিভার আর একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। স্নেহলতা একটি চামড়া শেষ করিয়া আর একটি শুরু করিল।

সকলেই স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত রহিল। বিধ্বস্ত বৈদ্যনাথ অথবা গুহান্তরালে অন্তর্হিত মায়া-নটবরকে লইয়া কেহই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। রুগ্ন টুকুর একটানা কান্নাতেও এতটুকু ছেদ পড়িল না।

চার

একটু পরে বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া নটবর এখনও নিরুদ্দিষ্ট।

চতুর্দিকে কোনো শব্দ নাই।

কেবল টুকুটা কাঁদিতেছে। একটানা কান্না।

বৈদ্যনাথের দেহের সমস্ত পেশী আবার শক্ত হইয়া উঠিল। সে সহসা ছুটিয়া

গিয়া টুকুকে তুলিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া কঠিন পাথরটার উপর সজোরে আছাড় মারিল। টুকুর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, রক্তাক্ত মস্তিষ্কটা ছ্যাতরাইয়া পাথরটার চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। মৃতদেহটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বৈদ্যনাথ হাঁপাইতে লাগিল। ইহাতেও বিশেষ কেহ বিচলিত হইল না।

টুকুর মা থাকিলে হয়তো হইত। কিছুদিন পূর্বে সে মারা গিয়াছে।

নিমাই উঠিয়া গিয়া টুকুর মৃতদেহটা আনিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডে গুঁজিয়া দিল। এতখানি মাংস নষ্ট করিয়া কি হইবে!

অরুণ উঠিয়া নিভার কাছে গেল।

সিক্তদেহ নরেশ নদী হইতে উঠিল। মাছ ধরিয়াছে, প্রকাণ্ড মাছ। তীরে উঠিয়াই সে মাছটাকে এক আছাড় দিল, তাহার পর তুলিয়া তাহার টুঁটিটা কামড়াইয়া ধরিল। মাছটা তবু ছটফট করিতেছে। নরেশ মাছটা খাইতে খাইতে একবার শেফালীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার কাছে গিয়া বসিল। একেবারে গা ঘেঁষিয়া বসিল।

নদীর পরপারবর্তী অরণ্যে কলরব উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল।

শেফালী নরেশের দিকে চাহিয়া হাসিল।

বাড়াবাড়ি ঠেকিতেছে?

ঠেকিবারই কথা। নামগুলা মুছিয়া দিয়া সময়টাকে আর একটু পিছাইয়া দিন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। নদী-পরপারবর্তী বনে যে কলরব-কোলাহল উঠিতেছে, তাহা আর কিছু নয়, আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা বন্য ম্যামথ শিকার করিতেছে।

কাল-চক্র ঘুরিতেছে।

ক খ গ

[জ্যামিতিক গল্প]

ক ও খ অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

শুধু তাহাই নহে, উভয়েরই জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার। ধার করে, ধার করিয়া ধার শোধ করে, আবার ধার করে। জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার হইলেও ইহাদের সান্ধ্যগতিপথ সরলরেখাকৃতি। সন্ধ্যার সময় উভয়েই সোজা এক স্থানে গমন করে এবং সমস্ত রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিয়া সকালে আবার ফিরিয়া আসে। রাত্রেই যেদিন ফিরিতে হয়, সেদিন অবশ্য গতিপথটা সরল থাকে না, একটু আঁকা-বাঁকা হইয়া যায়।

ধার বাড়ে।

জীবন অর্থহীন হইয়া পড়িতে চায়। আবার নূতন অর্থ মেলে।

ক বস্তুতান্ত্রিক।

খ ভাবতান্ত্রিক।

খ পরিচিত মহলে কখনও বক্তৃতা দিয়া, কখনও কাঁদিয়া-কাটিয়া, কখনও অভিনয় করিয়া কাজ হাসিল করে। সোজা চাহিয়া না পাইলে ক পকেট মারে। বস্তুতান্ত্রিক ক।

দুই

গ।

ষোড়শী গ। ক-এর কন্যা। মাতৃহীনা একমাত্র কন্যা। তবু অনূঢ়া। তাহার অন্তরের কামনা সর্বাঙ্গে প্রকট।

বস্তুতান্ত্রিক-ক দেখে; বোঝে কিন্তু কিছু করিতে পারে না। এত লম্বা পকেট বঙ্গদেশে কাহারও নাই, যাহা মারিয়া পণের টাকা সংগ্রহ করা যায়।

ক ও গ, দুইজনেরই নিশ্বাস পড়ে।

খ আসে।

ক খ গ, ত্রিভুজ নয়,—পিতা, পিতৃবন্ধু ও কন্যা।

ক খ বাহির হইয়া পড়ে, সোজা সরলরেখায় সেই স্থানে যায়, যেখানে গেলে চতুর্ভুজ হওয়া সম্ভব।

তিন

ভাবতান্ত্রিক গ।

মনে ভাব জাগে, ভাষা মেলে না।

কবিতা লিখিতে চায়, মিল জোটে না।

গোলাপের সহিত জোলাপ ছাড়া অন্য মিল আসে না।

না—না—না। সমস্ত জীবনটাই না।

তবু—আকাশে রামধনু উঠে—সাতটা নয়, সাতশো রঙ!

খ-এর অন্তর খলখল করে।

দিন কাটে।

চার

দুই মাস কাটিয়া গেল।

সানাই বাজিতেছে। করুণ পূরবী সন্ধ্যার আকাশে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। পাড়ায় মিত্রদের মেয়ের বিবাহ।

নিজের বাসায় ক বসিয়া আছে—বস্তুতান্ত্রিক ক—খ-এর অপেক্ষায়। পূরবী তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, বিলম্ব তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। খ এত দেরি করিতেছে কেন, দেরি হইলে আবার—

আধ ঘণ্টা কাটিল, এক ঘণ্টা কাটিল।

"শালা—"

ক্ষুব্ধ ক উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ একাই যাইবে সে।

পূরবী বাজিতেছে।

গ-এর বুক ভাঙিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল।

খুব বিরক্ত হইয়া ফিরিল, বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সেখানে দ্বার বন্ধ। আসিয়া আরও বিরক্ত হইল। বিস্মিতও হইল। এখানেও ঘরে খিল কেন!

ধাক্কা দিল।

একবার, দুইবার, তিনবার।

লজ্জিতা গ খিল খুলিয়া দিল।

বিছানায় খ বসিয়া আছে।

ক ও খ নির্নিমেষে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া রহিল। মুহূর্তকাল মাত্র। তারপর সাহসা ক বাহিরে গেল।

যাইবার সময় শিকল তুলিয়া তালা দিয়া গেল। ভীতা গ খ-কে বলিল, তুমি জানালা দিয়ে পালাও।

লোহার গরাদে আছে যে!

আরও ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল—বস্তুতান্ত্রিক ক।

সঙ্গে পুরুত।

কর শালা, বিয়ে কর।

খ রাজী হইয়া গেল।

সানাই তখন ইমন ধরিয়াছে।

তপন

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তিটি নিঃশব্দ-নিপুণতা সহকারে বাতায়নপথে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ দেহ, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, ঘনকৃষ্ণ চাপ-দাড়ি। চপলা নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল। লোকটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চপলা আমি এসেছি।

চপলা চীৎকার করিতে গিয়া থামিয়া গেল। সে হঠাৎ তপনকে চিনিতে পারিল।

তপন! তুমি! এতদিন পরে!

হ্যাঁ, দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টা আজ সফল হয়েছে, আজই জেল থেকে পালিয়েছি। আর দেরি কোরো না, চল শীগ্‌গির।

কোথায়?

প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। প্রথম চাটগাঁ, তারপর রেঙ্গুন, তারপর পাহাড় পেরিয়ে—

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

তপন হাসিল।

তোমার সিঁদুরটা দেখতে পেয়েছি। জেলে বসেই খবর পেয়েছিলাম। তুমি বীরের গলায় মালা দেবে বলেছিলে না? অবশ্য তোমার স্বামীও কম বীর নন; রায়সাহেব হওয়া সোজা কথা নয়।

তুমি অমন করে ঠাট্টা কোরো না। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

তপন সস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল। ইহারই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, ইহারই চক্ষে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশের কাজে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। চপলার বয়স সহসা যেন দশ বছর কমিয়া গেল! অতীত-যৌবনের অবলুপ্ত উন্মাদনা আবার অকস্মাৎ যেন তাহার দেহে মনে ফিরিয়া আসিল।

আমি যদি যাই, আমাকে নিয়ে যাবে?

সেইজন্তেই তো এসেছি। কিন্তু রায়সাহেবটি?

ওঁর অবশ্য কষ্ট হবে খুব। আর তা ছাড়া—

সহসা চপলা থামিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, সব উনি জানেন।

কি করে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চপলা বলিল, তুমি জেল থেকে পালিয়েছ, আমিও যদি পালাই, উনি সব বুঝতে পারবেন, আর তাহলে হয়তো।

চপলা কথাটা শেষ করিল না।

তপন বলিল, তাহলে হয়তো ওঁর চেষ্টায় অবিলম্বে ধরা পড়ে যাব আমরা। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে, সে বিষয়ে নিষ্কণ্টক এখনই হতে পারি। পকেট হইতে রিভল্‌ভারটা টানিয়া সে দেখাইল। তোমার স্বামী ক্লাব থেকে কোন্ পথে ফিরবেন তা জানি।

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

বল, রাজী আছ?

চপলা নির্নিমেষে তপনের মুখের পানে চাহিয়া ছিল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছি।

এতদিন যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস করলে, তাকে এত সহজে ছেড়ে যাবে? যেতে পারবে?

চপলা তাহার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তপন এ কি বলিতেছে? সে কি জানে, তাহার জন্য কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে? সে কি বুঝিতে পারিবে, কিসের তাড়নায়, কিসের জ্বালায় সমাজের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে সে বিবাহ করিয়াছে? নারীর ব্যথা, নারীর দুর্বলতা, নারীর সমস্যা, নারীহৃদয়ের দুর্বোধ্য জটিলতার কতটুকু জানে সে? কতটুকু বোঝে? বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তপন পর হইয়া যাইবে? তপনই তো তাহার আরাধ্য দেবতা, সে স্বয়ং আসিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবে?

তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল, যেতে পারবে?

পারব।

চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

"রায়সাহেবকে শেষ করে আসছি তাহলে—"

তপন চলিয়া গেল।

একঘণ্টা পরে দ্বারপথে শব্দ হইল।

তড়িৎ স্পৃষ্টবৎ চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার ঠেলিয়া রায়সাহেব প্রবেশ করিলেন, তপন নয়।

তপন আর ফিরিল না।